স্বামী বিবেকানন্দ

স্মারক গ্রন্থ

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদনা :

স্বামী সদাত্মানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
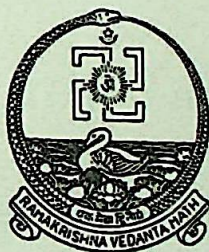
—বিশ্ববাণী বিভাগ—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা
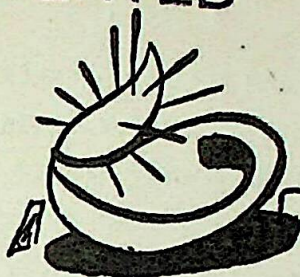
॥ সম্পাদকীয় মন্তব্য ॥

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জন্মস্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে "বিবেকানন্দ-স্মারকগ্রন্থ" প্রকাশিত হোল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের বিশ্ববাণীবিভাগের পক্ষ থেকে। সমগ্র বিশ্বে আজ উদ্‌যাপিত হচ্ছে স্বামিজীর শতবর্ষ-উৎসব এবং সেই মহা-মানবের পবিত্র জীবন, বাণী, আদর্শ ও চিন্তাধারার অনুশীলন কোরে গরিমাদীপ্ত আজ বিশ্বের নরনারী!

"বিবেকানন্দ-স্মারক-গ্রন্থ'' বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভার সামান্য পরিচয়দানের নিয়েছে ব্রত এবং এই সামান্য বিন্দুর উজ্জ্বল মুকুরে প্রতিফলিত হোক বিবেকানন্দ-সিন্ধুর অলৌকিক জীবনমহিমা ও জীবনাদর্শ। প্রণাম করি আমরা সেই মহাশক্তিমান যুগমানবকে এবং অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই সেই প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান চিরমুক্ত মহাপুরুষকে!

পূর্বেই বলেছি, সামান্য এই স্মারক-গ্রন্থ স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভার দেবে কথঞ্চিৎ পরিচয় এবং প্রার্থনা করি, সেই পরিচয়দানের দীপালোকেই সমুজ্জ্বল করুক বিশ্বের সমষ্টিসমাজ ও ব্যষ্টিজীবনকে!

আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই এই বিবেকানন্দ-স্মারক-গ্রন্থের প্রবন্ধ ও কবিতা-পরিবেশকদের উদ্দেশ্যে। তাঁদের চিন্তাসমৃদ্ধ সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, রসলালিত্য ও রচনামাধুর্যের অবদান সমগ্র বিবেকানন্দ-জীবনচিন্তা ও জীবনাদর্শ-আলেখ্যকে করুক মহিমময় ও উজ্জ্বল!

বিচিত্র-কুসুমসম্ভারে রচিত হয়েছে এই স্মারক অর্ঘ্যপাত্র সেই মহান্ আদর্শ-প্রতিমার অর্চনার জন্য এবং এই অর্চনা আনুক প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রসুপ্ত শক্তির জাগরণ ও করুক পূর্ণতার রূপায়ণ। মানবজীবনের প্রতিটি বিকাশক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-জীবনচিন্তা ও তাঁর অপার্থিব আদর্শ আনুক নূতন উদ্দীপনা ও নবজাগৃতির আলোড়ন এবং এই আকাঙ্ক্ষা ও আশার আশ্বাস ও আনন্দ নিয়েই এই স্মারক-গ্রন্থের জয়যাত্রা হোক সচল ও সার্থক!

আমরা ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্যকে এই বিবেকানন্দ-স্মারক-গ্রন্থের সৌষ্ঠব কলেবর ও সুশোভন প্রকাশকে সার্থক করার জন্য। ত্যাগব্রতীদের পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম স্বাভাবিক হলেও তাদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠার উজ্জ্বল নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মোটেই অসমীচীন নয়।

পুনরায় ধন্যবাদ জানাই বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব-সমিতির এবং মহেন্দ্র-পাবলিশিং কমিটির মাননীয় সম্পাদক মহাশয়দের স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি ব্লক দিয়ে সাহায্য করার জন্য। তাঁদের একান্ত সহানুভূতি ও সহায়তা আমাদের এই প্রকাশসৌন্দর্যের পথকে সুগম ও সার্থক করেছে। তেমনি আবার ধন্যবাদ জানাই সাধনা-ঔষধালয়ের সত্বাধিকারী মাননীয় ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে স্বামিজীর একটি ত্রিবর্ণ চিত্রের মুদ্রণ-ভার গ্রহণ করার জন্য।

এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের পথকে বিশেষভাবে সচল করেছেন 'কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কালী প্রেস, বেঙ্গল অটোটাইপ প্রাইভেট কোং, ডি. এইচ. কেশ এণ্ড কোং এবং চয়নিকা প্রেস প্রভৃতির মাননীয় সত্বাধিকারী ও কর্মীবৃন্দ। তাঁদের উদ্দেশ্যেও জানাই আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই সহানুভূতিশীল মাননীয় বিজ্ঞাপনদাতাদের, কেননা তাঁদের একান্ত সহায়তা না পেলে এত সুলভ মূল্যে স্মারকগ্রন্থকে সর্বসাধারণের দরবারে উপস্থিত করা কোন রকমেই সম্ভবপর হত না। এইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থের সুশোভন বাঁধাইয়ের জন্য খলিলুর রহমান এ্যাণ্ড কোং এবং নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

সদাত্মানন্দ
প্রজ্ঞানানন্দ

॥ সূচীপত্র ॥

॥ প্রথম পর্ব ॥

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

॥ বিজ্ঞাপনদাতাদের নামসূচী ॥

॥ প্রথম পর্ব ॥

॥ ভ্রম-সংশোধন

১। সূচীপত্র : প্রথম পর্ব, অষ্টম অবদান : প্রবন্ধকারের নাম—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। সূচীপত্র : দ্বিতীয় পর্ব, ষষ্ঠ অবদান : প্রবন্ধকারের নাম—অজিত ঘোষ

৩। প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ১৬২ (প্রবন্ধ—বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্ররহস্য) :

লাইন ২৪, হইবে—বিবৃত, সম্বৃত। লাইন ২৫, হইবে—বিবার, সম্বার।

May (that we studied) that purify us
May it become food in us
May it join us with strength
May our study make us glorious
May we not be jealous of each other

Vivekananda
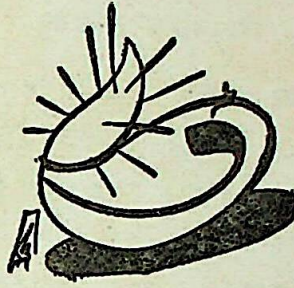
॥ প্রথম অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

এই অভিনন্দনপত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম যে, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অমর, আমাদের মধ্যেই জীবিত আছেন। এখানেই তিনি আপনাদের সকলের এবং আমার মধ্যে উপস্থিত আছেন। যে পার্থিব দেহে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি এক্ষণে আর তাহাতে আবদ্ধ নহেন—অধ্যাত্ম-সত্তায় অদৃশ্যভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন এবং স্থূলদেহে বিদ্যমান থাকা অপেক্ষাও বর্তমানে সহস্র গুণে অধিকতর রূপে তিনি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন অসাধারণ পুরুষ ও দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন। এই জড়বাদের যুগেও তিনি দিব্যজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। আমেরিকার ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক দেশেও তিনি আধ্যাত্মিক-প্লাবন আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত বিদগ্ধমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি যে মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা, কিন্তু তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাণীই ছিল দিব্যশক্তিপূর্ণ যাহা শ্রবণমাত্রেই সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

তাঁহার বক্তব্য ছিল যে, হিন্দুধর্ম একটি বিশ্বজনীনধর্ম এবং ইহা শিক্ষা দান করে আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, কেহই পাপী বা অধার্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। ইহা তাহাদের নিকট দৈববাণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং তাহারা এক অভিনব দৃষ্টিলাভ করিয়াছিল।

এই মহান নেতা স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন উক্ত আন্দোলনের পুরোধা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচারক, যিনি মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র আমেরিকায় সত্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

আমাদের মহান্ গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, অচিরেই তাহা জাতীয় আন্দোলনরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং সমগ্র জাতিই আজ ইহার প্রতি আস্থাশীল। ব্যক্তিগতভাবে কোন কারণে যদি কেহ ইহার প্রতি উদাসীন হন অথবা এই কর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন তবে সময় আগতপ্রায় যখন তাঁহারা মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই মহৎ কর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত কর্ম হইল আন্তর্জাতিক। আমরা এক্ষণে ইহা অনুভব করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আগামীকল্য বা তৎপরবর্তীকালেই ইহা অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের বোধগম্য হইবে। সমগ্র হিন্দুজাতি এবং ইহার বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই একমত যে স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের একজন দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী।

তাঁহার আদর্শ পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নহে, বিশ্বজনীন ধর্ম ও বেদান্তদর্শনের মূল ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার আদর্শ প্রাচীন ঋষি ও দ্রষ্টা পুরুষগণ-কর্তৃক আবিষ্কৃত বৈদিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সকল সম্প্রদায়েরই সমবেতভাবে এই মহান্ আন্দোলন যাহা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিতে চলিয়াছে তাহাতে সাহায্য করা উচিৎ।

সমগ্র জগৎ এক্ষণে বুঝিতে সুরু করিয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ কি অদ্ভুত কর্মই না সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যে কেহই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন তিনিই মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হইবেন এবং তাঁহার জন্মভূমির প্রকৃত সেবা করিতে তিনি সক্ষম হইবেন, কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিই তাঁহার মাধ্যমে কার্যকরী হইয়াছিল।*

---

* *The Lectures and Addresses in India*-গ্রন্থ থেকে অনূদিত।
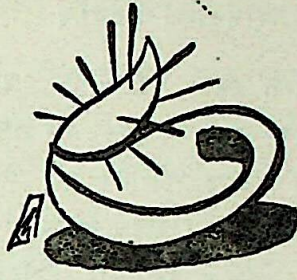
॥ দ্বিতীয় অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে (১৯৬৩) তাঁহার সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দও বিশেষভাবে স্মরণীয় (জন্ম—২রা অক্টোবর ১৮৬৬ এবং মৃত্যু—৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ অঃ)। কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ-দেবের মহাপ্রয়াণের পর (১৮৮৬) স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ উভয়কেই তাঁহার শবাধারের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দেখি। বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও নগ্ন পদে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন ১৮৮৮—১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। স্বামী বিবেকা-নন্দের চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিজয়বার্তা ঘোষিত হইবার পর—য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত প্রচারের সাহায্যকল্পে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ স্বামিজী-কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ অকালে নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার অপেক্ষা ৩৭ বৎসর অধিককাল জীবিত ছিলেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহাবসান ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে (১৯৩৬—৩৭) তিনি সভাপতিত্ব করার নিমিত্ত আহূত হইয়াছিলেন। অপর একটি দিবসে সভাপতি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের একজন যোগী, বৈদান্তিক, দার্শনিক ও ধর্মনেতা হিসাবে স্বামী অভেদানন্দের জীবনপঞ্জী আজও রচিত হয় নাই। তাঁহার সুবৃহৎ ও বিস্তৃত জীবনপঞ্জী রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এজন্য দুঃখিত। তবে তাঁহার মার্কিন শিষ্যা ভগিনী শিবানী (Mary Lepage) তাঁহার আমেরিকার জীবন ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে "আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ" নামে যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থখানিতে চিন্তাশীলতার অবদান রহিয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর দুইখানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র রহিয়াছে, সেই সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা সফরের কাহিনীও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বহু

নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া মিস্ মেরী লুইস্ বার্ক স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে "আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ" নামে যে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন 'উদ্বোধন' কার্যালয় হইতে সেই গ্রন্থ হইতে শতাধিক পত্র সংযোজিত হইয়া "স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী" নামে একটি পরিবর্ধিত সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাবোধি পত্রিকায় যেরূপ ভারতে সিংহলীয় বৌদ্ধধর্মের (১৮৬৪—১৯৩৩) অভ্যুত্থান সম্বন্ধে দেবমিত্র ধর্মপালের দিনপঞ্জীসমূহ পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ স্বামী অভেদানন্দেরও জীবনপঞ্জী ও পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮—১৮৮৪) শিষ্য শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত ধর্মপালও চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন (১৮৯৩ সেপ্টেম্বর)। ভগিনী শিবানী প্রণীত স্বামী অভেদানন্দ-জীবনীর ভূমিকা লেখক ডঃ বসুকুমার বাগচীর সহিত আমি আমেরিকায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ডঃ বাগচী স্বামী অভেদানন্দজীর অপ্রকাশিত দিনপঞ্জী ও অমূল্য পত্রাবলীর বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র স্বামী অভেদানন্দের গুরুভ্রাতাই ছিলেন না, অধিকন্তু তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বেদান্ত প্রচারের সহযোগী ছিলেন। সুতরাং বিবেকানন্দ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা "কালী বেদান্তী"-কে তাঁহার বেদান্ত প্রচারের সহায়করূপে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং লণ্ডনের ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াই (১৮৯৬) তিনি গভীর উৎসাহভরে এই প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it"। একই সময়ে স্বামী সারদানন্দকেও তাঁহার পাশ্চাত্ত্যের আরব্ধ কার্যাবলীর সাহায্যের নিমিত্ত স্বামিজী আহ্বান করিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ-রচিত পুস্তকাবলীর সংখ্যা কুড়িখানিরও অধিক, কিন্তু বিস্তৃত প্রচারকল্পে বাংলা ভাষায় কয়েকখানি মাত্র অনূদিত হইয়াছে। সে যুগে ভারতীয় সাধু অর্থে অনেকেই যোগী অথবা যাদুকর মনে করিত। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজীতে "রাজযোগ" পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুরাগী জনৈক রুশ বন্ধু সেই পুস্তকখানি টলষ্টয়কে উপহার দেন (১৮২৭—১৯১০)। টলষ্টয় 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া স্বামিজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন—রোমা রোঁলাকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ (১৯২৯—৩০) ও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় জীবনী রচনাকার্যে সাহায্যকালে লেখক তাহা তাঁহার লাইব্রেরীতে দেখিয়া আসিয়াছেন। 'রাজযোগ'-গ্রন্থ প্রণয়নের পর স্বামী

বিবেকানন্দ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, যাহা স্বামী অভেদানন্দের চিন্তাধারা ও রচনাবলীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বামিজী সম্বন্ধে ধারাবাহিক গবেষণা ও প্রকাশনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এই উপলক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দজীকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।
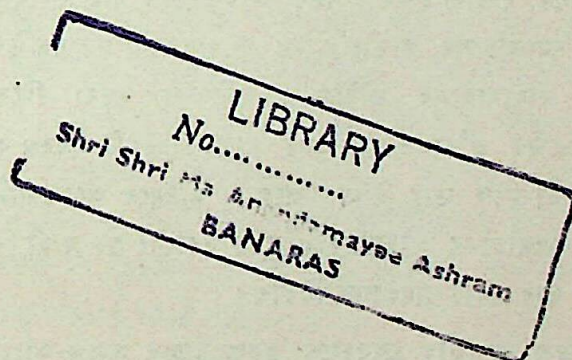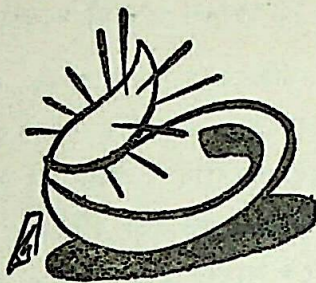
॥ তৃতীয় অবদান ॥

॥ রামমোহন ও বিবেকানন্দ ॥

নতুন চিন্তার আলোকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক দিয়ে রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রকৃতিগত ব্যবধান সত্ত্বেও এই উভয় মহামানবের ভাব ও চিন্তার ঐক্য এবং কর্মপ্রয়াসের বহুমুখিতা যে কোন মানুষের বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অধ্যাত্মবোধ ও সমাজচিন্তা-জগতে দু'জন নেতাই যে মৌলিকতা দেখিয়ে গেছেন তা বর্তমান সমাহৃত জ্ঞানচর্চার (derivative knowledge) যুগে প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আবার লৌকিক ও অধ্যাত্ম-জগৎ সম্পর্কে বহুবিস্তৃত জ্ঞানকে লোক-ব্যবহার ও কর্মের ভেতর তাঁরা যেভাবে রূপ দিয়ে গেছেন তা বর্তমান চিন্তাবিলাসিতার যুগে প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। এ'ছাড়া ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়েও দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্ম ও সমাজচিন্তায় জাতীয় মনের তামসিকতা, গতানুগতিকতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রামমোহনের জীবনে যে সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল শতাব্দীশেষে বিবেকানন্দের জীবনেও সে একই সক্রিয়তা একটি বীর্যবন্ত কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের অভিমুখে অনেকখানি পৌঁছিয়ে দিয়েছে। রাজা রামমোহনের জীবনচিন্তায় যে ইতিহাসের শুরু স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ভাবনায় তার একটি সামঞ্জস্যময় বিকাশ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-আবেষ্টনীর মধ্যে বর্ধিত হয়েও রামমোহন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে যেরূপ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অসামান্য মৌলিক প্রতিভারই পরিচায়ক। বস্তুতপক্ষে সংস্কারের প্রবল প্রেরণায় বাঙ্‌লা দেশে নতুন চিন্তা ও কর্মের জগতে একটি নবযুগের সূত্রপাত করেন তিনি। তুলনামূলক ধর্মালোচনা, সনাতন হিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ, যুক্তিবাদী পাশ্চাত্ত্য দর্শন এবং পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তি-সংস্পর্শ তাঁর মনে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে

সত্যানুসন্ধিৎসা জাগ্রত করেছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু তাঁর এ' সত্যানুসন্ধিৎসা বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীর শুষ্ক জ্ঞানসঞ্চয় মাত্র নয়, যে বস্তুকে তিনি সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন সাহস, শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে সত্যকে প্রয়োগ করবার অনন্যসাধারণ সামর্থ্য ছিল তাঁর। রামমোহনের এ সদাচঞ্চল কর্মনিষ্ঠাই একটি জাতির মনকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে অনেকটা মুক্ত করে নবযুগের তোরণপ্রান্তে এনে উপস্থিত করে। ধর্ম ও সমাজ-জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতি পদে তাঁকে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের প্রতিভায় বল ও বীর্যের সমাবেশ এত বেশী ছিল যে, ভাবচিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে সমস্ত বাধাকেই তিনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় অবশ্য এখানেই শেষ নয়। তাঁর অনন্যসাধারণ মননশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানবতার লাঞ্ছনাকাতর একটি অনুভূতিশীল বিশাল হৃদয়—যে হৃদয়ধর্মের প্রেরণায় তিনি অসহায় নারীর দুরবস্থা ও অনুন্নত মানুষের অবনতির কারণ দূরীভূত করে তাদের দিতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদা।

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার মৌলিকতা স্বীকার করেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রামমোহনের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজচিন্তার সহজ উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তিনি। নৈনিতাল পাহাড়ে অবস্থানের সময় স্বামিজী তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে স্পষ্টই বলেছিলেন অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে রামমোহনের অনুসরণে তিনি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন্ : ১। রামমোহনের বেদান্ত গ্রহণ ও প্রচার, ২। রামমোহনের স্বদেশ-প্রীতি ও তার প্রচার, ৩। রামমোহনের স্বদেশপ্রেম—যা হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমান দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছিল, (দ্রষ্টব্য: Sister Nivedita: *Notes on Some Wanderings*, p. 19)। এ' সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে রামমোহনের যে মননশীলতা, হৃদয়বত্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছিল তা বিচারশীল বিবেকানন্দের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

সমকালীন সংস্কারান্ধ মানুষের মানসমুক্তির অস্ত্র হিসেবে রামমোহন এদেশে বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু বেদান্ত ধর্মকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্তি দেবার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশেও উহার স্থায়ী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয় মনকে অশুভ ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত করা। বেদান্ত প্রচারে বিবেকানন্দের অনুরূপ উদ্দেশ্য তো ছিলই, এ' ছাড়া যে পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজক সম্প্রদায় এ দেশীয় ধর্মকে কুসংস্কারের নামান্তর মনে

ক’রে এ দেশের ওপর খ্রীষ্টধর্ম চাপিয়ে দিতে সক্রিয় হয়েছিল তাদের উদ্ধত মনোভাবের সমুচিত উত্তর দেবার প্রয়াসেই তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্ত-ধর্ম প্রচারের জন্য এত সক্রিয় হয়েছিলেন। রামমোহনের বেদান্ত-ধর্ম প্রচার সংস্কার-প্রয়াস থেকে উদ্ভূত, আর বিবেকানন্দের বেদান্ত-চর্চা ও প্রসার চেষ্টা স্বাজাত্যবোধ ও গভীর মানবতাবোধের সঙ্গে জড়িত। জাতীয় প্রগতির সহায়ক হিসেবে বেদান্ত-চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে রামমোহন ও বিবেকানন্দ প্রায় একমত। কিন্তু জাতীয় জীবনে প্রগতির বাহন হিসেবে বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চা সম্পর্কে বিবেকানন্দ রামমোহন থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। রামমোহন মনে করতেন জাতীয় প্রগতির উপায় হিসেবে বিজ্ঞান-চর্চা বেদান্ত-চর্চার সম্পূরক। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু বিজ্ঞান-প্রভাবিত জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভোগোন্মত্ত রূপ দেখে বিজ্ঞান-চর্চার চাইতেও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন বেশী।

তাই বলে স্বামী বিবেকানন্দ অনুন্নত ভারতবাসীর পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছেন মনে করলে ভূল করা হবে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় মুখ্যত বিবেকানন্দের উদ্যোগে মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে দেখা যায়ঃ Its methods of action are: I. to train men so as to make them competent to teach such knowledge or sciences as are conducive to the material and spiritual welfare of the masses. II. to promote and encourage arts and industries। সে ধরনের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-চর্চার ওপর বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন যা জনসাধারণের ঐহিক ও অধ্যাত্মজীবন বিকাশের অনুকুল। এ’ ছাড়া জনজীবনের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মঠের কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিল্পোদ্যমকে উৎসাহ দিতে। তরল ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিকে বিবেকানন্দ মনে করতেন ডিস্‌পেপসিয়া রোগগ্রস্ত জাতি। কঠিন আঘাত দিয়ে সে জাতিকে আধুনিক জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি অনেক সময় জাতির উদ্দেশ্যে চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতেও ছাড়েন নি। তিনি জাতিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন সে ধরণের কর্মসাধনার পথে—যা তাদের কর্মশক্তিকে জাগ্রত করবে পৌরুষ-বীর্যময় কঠোর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে। এ উদ্দেশ্যে দৈহিক শ্রম, অধ্যাত্ম চর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আর্ত মানুষের সেবা—এক কথায় জাতির সর্বোতোমুখী কর্মপ্রয়াসকে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাঙালীর তরল ভাবালুতা ও আত্মপ্রত্যয়হীন পরানুকরণ প্রবৃত্তিকে বহু বক্তৃতায়, রচনায় ও মৌখিক উপদেশে বারে বারে ধিক্কৃত করেছেন

বিবেকানন্দ। স্ব-যুগের পাশ্চাত্ত্য অনুকরণপ্রিয় জাতিকে আত্মিক অবক্ষয়ের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি গঠন করতে চেয়েছিলেন এমন একদল দেশ-প্রেমিক কর্মী যাদের দেহ হবে লৌহকঠিন, স্নায়ু হবে ইস্পাতের মত শক্ত, মন হবে দুঃসাধ্য কর্মের উপযোগী আর হৃদয় হবে ফুলের মত কোমল। আধ্যাত্ম উপলব্ধি, মনন-শক্তি এবং সহৃদয় মানবপ্রীতির মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি ত্যাগব্রতী সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যে সমাজ-দেশ-কালোত্তীর্ণ উদার মনোভাবের সাহায্যে আধুনিক সভ্যতা-প্রভাবিত যন্ত্রণা-কাতর মানুষকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবোধ ও কর্মপ্রেরণায় ছিল সে সার্বভৌম মানবমাহাত্ম্যের মহান উপলব্ধি—যে উপলব্ধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের উদার হৃদয়কে এক সূত্রে গ্রথিত করে একটি সর্ববন্ধনমুক্ত 'মানুষজাতি' গঠনের সহায়ক।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস বর্ণনায় যাঁরা বিবেকানন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল পৌত্তলিকতাবাদী নব্য হিন্দুধর্মের প্রচারকমাত্র বলে অভিহিত করেন তাঁদের সে-মনোভাব যে কত ভ্রান্ত উক্ত আলোচনার আলোকে স্পষ্টই তা প্রতীয়মান হবে।

রামমোহন ও বিবেকানন্দ বৈদান্তিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন যুগপ্রয়োজনে। এদিক দিয়ে এ দুই মহামানবের কর্মপ্রয়াসের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য আছে। কিন্তু অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে তাঁদের লক্ষ্যের ব্যবধান ছিল পর্বতপ্রমাণ। ধর্মসংস্কারের অন্যতম উপায়হিসেবে রামমোহন চেয়েছিলেন হিন্দুর মূর্তিপূজার সমূল উচ্ছেদ। এর কারণ মূর্তিপূজা রামমোহনের মতে শুধু নিম্নাধিকারীর ধর্মসংস্কারমাত্র নয়—সামাজিক সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও মানবতাবিরোধী কাজের উৎস। মুণ্ডক উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন বলেছেন: "Idol-worship—the source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles, as countenancing criminal intercourse, suicide,—female murder and human sacrifice"। এ' ছাড়া রামমোহন আরও মনে করেছেন মূর্তিপূজক জাতিমাত্রই বোধশক্তিবর্জিত ও যুক্তিহীন। এ কারণেও তাঁর মতে মূর্তিপূজা বর্জনীয়। কেনোপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন বলেছেন: "Idolatrous nations have checked or rather destroyed every mark of reason and darkened any beam of understanding"।

এজন্য সংস্কারকামী রামমোহনের ধারণা হয়েছিল মূর্তিপূজক নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মধ্যে একটি সার্বভৌম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে

২

না পারলে দেশবাসীর মনে ঐক্যচেতনা আসবে না, এবং ঐক্যচেতনা না এলে দেশবাসীর পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার কিংবা সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভ কোন দিনই সম্ভব হবে না। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন মিঃ ডিগবীর নিকট যে চিঠি লেখেন তার ভিতর রামমোহনের এ ধর্মসংস্কারের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামমোহন সে-পত্রে মিঃ ডিগবীকে লেখেন: 'It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort'।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক জীবনে সুযোগ সুবিধা লাভ এবং সামাজিক জীবনে সুখ ও সন্তোষ বিধানের ইচ্ছাই রামমোহনের ধর্মসংস্কারের অন্যতম অভিপ্রায়। সমসাময়িক দেশকালের চরম অধঃপতনের যুগে রামমোহনের মত তীক্ষ্ণধী সমাজসচেতন মানুষের মনে এরূপ ধর্মসংস্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অভিপ্রায় যত সহজই হোক, জাতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কোন ধর্মসংস্কারই সার্বভৌম প্রভাব বিস্তার বা স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। সাময়িক প্রয়োজনের ষ্টিম রোলার মানুষের চিরকালীন ধর্মবুভুক্ষাকে জোর করে পিষে এক করে দিতে পারে না—অন্তত ভারতবর্ষের মত বিচিত্র ধর্মী এ দেশে। ভারতের ইতিহাস ও ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হ'ল জীবনের নানা বৈষম্যের মধ্যে পরম একের উপলব্ধি। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও ভারতবর্ষ যুগে যুগে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে ঐক্যের সন্ধান করেছে এবং তাদের সে-ঐক্যের সন্ধান ব্যর্থ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বহু রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝা ভারতের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবন বারে বারে বিধ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি।

রামমোহন যখন ভারতীয় ধর্মজীবনের সমস্ত বৈষম্যকে দূরীভূত করে রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা লাভের জন্য একটি সার্বভৌম ধর্মের পরিকল্পনা করেন তখন ভারতেতিহাসের এ মর্মগত বৈশিষ্ট্য হয়তো তাঁর সাময়িকতায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিজাত ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত বিবেকানন্দের চোখে অবশেষে ধরা পড়ল ভারতধর্মের এ মর্মগত বৈশিষ্ট্য। এ দিক দিয়ে বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা রামমোহন থেকে বিস্তৃত ও গভীরতর স্বীকার করতেই হয়। জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের ধারায় বিবেকানন্দের ধর্মমত রূপ লাভ করেছিল রামমোহনের অনেক পরে। সুতরাং তাঁর ইতিহাস-চেতনা রামমোহন থেকে যে গভীরতা ও বিস্তৃতিলাভ করবে তাতে আশ্চর্যের বিষয়

কিছুই নেই। সামাজিক আচার আচরণের সংস্কারবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সাময়িক প্রয়োজনের কথা বারে বারে ঘোষণা করলেও ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি সাময়িকতার দ্বারা কখনও আচ্ছন্ন হয়নি।

বহুযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অচল অনড় হিন্দু সমাজকে স্বামী বিবেকানন্দ ধিক্কৃত করেছেন মিশরের 'মমি' বলে। উদাত্ত কণ্ঠে জাতিকে তিনি সে-সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অদ্বৈত ব্রহ্মবোধের ভিত্তিতে সাম্যময় সচল ও সক্রিয় একটি সমাজ গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কুসংস্কার জাতিকে যে জড়ভাবাপন্ন করে তোলে, জাতীয় উজ্জীবনের জন্য জাতিকে সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত করা প্রয়োজন, এইরূপ সংস্কার-চিন্তায় বিবেকানন্দ রামমোহনের সঙ্গে একমত। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে রামমোহনের মত একটি যান্ত্রিক সার্বভৌম ধর্ম-প্রতিষ্ঠার কল্পনা বিবেকানন্দ করেননি। ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এটা বিবেকানন্দের বাস্তব দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। রামমোহনের অন্যতম প্রধান গৌরব হল নব-জাগরণের যুগে তিনি হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তিস্বাধীনতার উপাসক। কিন্তু যুগ-প্রয়োজনে সার্বভৌম একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠা-চিন্তায় তিনি পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি যে অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রীতি খণ্ডিত বলেই মনে হয়। সে-হিসেবে ধর্ম ও সমাজচিন্তায় বিবেকানন্দের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি রামমোহনের থেকে উদার। ভাবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতই বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন—কোন রকম আরোপিত ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নয়—বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের পথে বিচরণ করেও মানুষ এক অখণ্ড সত্যোপলব্ধির রাজ্যে উপনীত হতে পারে। নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দের এ সার্বভৌম ধর্মোপলব্ধি শুধু এ দেশে নয়—জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য দেশেও কিরূপ আলোড়ন তুলেছিল বাঙালীর ইতিহাস-পাঠকমাত্রই তা জানেন। সমগ্র জগতের মধ্যে আধুনিক যুগে হিন্দুধর্ম বোধ হয় সর্বপ্রথমে মর্যাদা লাভ করে বিবেকানন্দের এ' নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা প্রচারের ফলে।

কর্মৈষণার দিক দিয়েও যুগপ্রবর্তক রামমোহনের সঙ্গে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। উভয়েই জীবনব্যাপী কর্মচঞ্চল এবং এ কর্মের উদ্দেশ্য হ'ল লোকহিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির চিত্তে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার ধারা সঞ্চারিত করে দেবার উদ্দেশ্যে রামমোহন সে-যুগের সরকারের সাহায্যে যে শিক্ষার আয়োজন করেন উত্তরকালে সে-শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক নরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন সংশয়বাদী। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্রাহ্মসমাজের সভ্য তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথের মনে ধর্মজিজ্ঞাসায় সংশয়বাদ জাগ্রত

না হলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে সমন্বয়ী ধর্মচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতেন না এবং হিন্দুধর্মের সার সত্যকে দেশকালোত্তীর্ণ একটি স্থায়ী রূপও দিতে পারতেন না। এ ছাড়া দেশহিতের জন্য রামমোহনের কর্মক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত, বিবেকানন্দও তেমনি অদম্য সাহস ও অজেয় বলের সাহায্যে তাঁর কর্মকেন্দ্র প্রসারিত করেন পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জগতের বহু স্থানে। উভয় কর্মনেতার পাশ্চাত্ত্য দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যের মধ্যেও একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতসম্রাটের দূতরূপে বিশেষ অভিপ্রায় নিয়ে রামমোহন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন একথা সত্য হলেও বাস্তবিকপক্ষে রামমোহনের ইংলণ্ডে যাবার লক্ষ্য ছিল ব্যাপকতর। সে-দেশের দার্শনিক চিন্তাধারা, বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার, সাম্যবাদের আদর্শ এবং ঐহিক সমৃদ্ধির কারণসমূহ জানা এবং বৈধ উপায়ে সমকালীন অনুন্নত ভারতবাসীর জন্য রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করাই ছিল রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের প্রধান লক্ষ্য। মুখ্যত বেদান্ত-ধর্ম প্রচার করবার জন্য বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়াছিলেন একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করে দরিদ্র ও লাঞ্ছিত ভারতবাসীর যে ভয়াবহ রূপ তিনি দেখেছিলেন তা তাঁর মানবপ্রেমপূর্ণ বিশাল হৃদয়কে পীড়িত করেছিল। ধনকুবের আমেরিকার সাহায্যে সহায়হীন ভারতবাসীর সে অপরিসীম দৈন্য কিছুটা দূর করা যায় কিনা তার জন্য সচেষ্ট হওয়াও ছিল স্বামিজীর আমেরিকা যাত্রার আর একটি লক্ষ্য। তবে রামমোহনের প্রচেষ্টার সঙ্গে বিবেকানন্দের ভারতহিতচিন্তার পার্থক্য হ'ল—রামমোহনের মত পাশ্চাত্ত্যের দান তিনি বিনা-সর্তে গ্রহণ করতে চাননি। আমেরিকাবাসীর নিকট ভারতের অগণিত দরিদ্রের জন্য তিনি যেমন সাহায্যের প্রত্যাশা করেছেন, প্রতিদানে তিনিও তাদের দিতে চেয়েছিলেন ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তার শাশ্বত সম্পদ। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পরম সাহসের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের বুকে বসে বলতে পেরেছিলেন, বহু যুগের অবিচারে অত্যাচারে এবং ঐহিকতার প্রতি একান্ত উদাসীনতার ফলে ভারতবর্ষ আজ বস্তুসম্পদে দীন—আর বিজ্ঞানশক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্যদেশ আধুনিককালে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বস্তুসমৃদ্ধি লাভের জন্য আত্যন্তিক মনঃসংযোগ করায় পাশ্চাত্ত্যদেশ এ যুগে অধ্যাত্ম সম্পদ হারিয়ে ফতুর হয়ে গেছে। অথচ আপাত-দারিদ্র্যের মধ্যেও পৃথিবীর মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষ এখনও সযত্নে রক্ষা করে চলেছে তার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য দেশকে যদি অতৃপ্ত সম্ভোগবাসনা ও সর্বগ্রাসী লোভের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় তাহলে ভারতবর্ষের অদ্বৈত বেদান্তনির্দেশিত একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনপ্রণালী গ্রহণ করা

ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিবেকানন্দের স্বদেশহিতচিন্তা এখানে এসে একটি সহযোগ-পূর্ণ বিশ্বহিতচিন্তায় পরিণতি লাভ করেছে।

রামমোহন বিবেকানন্দ উভয়েই অদ্বৈতবাদী। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তবাদী হয়েও রামমোহন পাশ্চাত্ত্য জীবনের ঐশ্বর্য দেখে এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে, সে দেশের ভোগের আদর্শকেই দরিদ্র ও বঞ্চিত ভারতবাসীর পক্ষে পরমস্পৃহনীয় বস্তু বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন সে অভীষ্ট লাভের জন্য সচেষ্টও হয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কালের ব্যবধানে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য ভোগাদর্শময় জীবনের মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি সমকালীন ভারতবাসীকে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ-মোহ ত্যাগ করে আত্মিক সম্পদে বলীয়ান হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রামমোহন যেখানে চেয়েছিলেন ভারতবাসী পাশ্চাত্ত্য দর্শনবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর মতই একটি শক্তিমান জাতিতে পরিণত হোক—বিবেকানন্দ সেখানে চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসী ভোগমোক্ষমূলক ভারতীয় জীবনচিন্তায় অবিচল থেকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করুক। বিবেকানন্দ তাঁর ইচ্ছাময়ী মায়ের নিকট সকাতর প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন, তিনি যেন স্বদেশবাসীর সমস্ত দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করে তাদের 'মানুষ' করে তোলেন।

বিবেকানন্দের এ' মনুষ্যত্বলাভের সাধনা রামমোহনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভের চেষ্টার থেকে ব্যাপকতর ও গভীরতর সন্দেহ নেই।

সর্বশেষে আলোচ্য হ'ল লক্ষ্য লাভের জন্য এ' দুই মহাপুরুষের সংগঠনশক্তির পরিচয়। দেশবাসীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা লাভের জন্য হলেও রামমোহন সে-যুগে ধর্মসংস্কারের যে মহনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন কিংবা সর্বপ্রকার বাধাকে অগ্রাহ্য করে ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতবাসীর জন্য যে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন—দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের এ' প্রগতিশীল কর্মপ্রচেষ্টা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশহিতের জন্য রামমোহন যে বৃহৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন তা কখনও একক চেষ্টায় সম্পূর্ণ হতে পারে না—কোনদিন হয়ওনি। দুর্ভাগ্যক্রমে রামমোহন তাঁর দেশহিতব্রতী স্বল্প কর্মজীবনে তাঁর এ প্রগতিশীল কর্মোদ্যমকে একটি সংহত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপকতর রূপ দিতে পারেননি। এ' ছাড়া ইংলণ্ডে যাবার পূর্বে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে এমন কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও ছিলেন না যাঁরা সমবেতভাবে রামোহনের প্রগতিশীল ভাবধারাকে একটি সংহত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় রূপ দিতে পারেন। এ হিসেবে আধুনিক ভারতেতিহাসের ভাবচিন্তা ও কর্মের জগতে রামমোহন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

মহামানব। এতে অবশ্য রামমোহনের মাহাত্ম্য খর্ব হয় না। স্ব-যুগের তমসাচ্ছন্ন দেশবাসীকে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য তিনি যে কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গেছেন তা আমাদের আধুনিক ইতিহাস রচনার ভিত্তি। এদিক দিয়ে অবশ্য বিবেকানন্দ ভাগ্যবান। ব্যাপকতর কর্মের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসঙ্গ নন। তাঁর মানবধর্ম ও কর্মাদর্শকে বাস্তব ক্ষেত্রে বিস্তৃত ও স্থায়ী রূপ দেবার জন্য তিনি এমন একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ত্যাগব্রতী মানুষ পেয়েছিলেন যাঁদের সহায়তায় এ আত্মপ্রত্যয়হীন বীর্যহীন দেশে তিনি অসাধ্য সাধন করে গেছেন। রামমোহনের মত বিবেকানন্দের সহকর্মীর অভাব ছিল না। কিন্তু গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর এ সমস্ত সহকর্মী কোন্ পথ অবলম্বন করে দেশ ও মানবহিতব্রতে নিজেদের কর্মপ্রয়াস নিয়োগ করবেন সে-সম্পর্কে তাঁদের নির্দিষ্ট কোন ধারণা ছিল না। পাশ্চাত্ত্য দেশে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম এ সমবেত শক্তিকে একটি মিশনের মধ্যে সংহত করে তোলেন। শুধু তাই নয়, সকলের সম্মতি নিয়ে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কর্মপন্থার সাহায্যে তাঁর মানবহিতব্রতের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হন। সংঘশক্তির সহায়তা গ্রহণ করায় বিবেকানন্দের মানবপ্রেমের আদর্শ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্তিলাভ করে। কিন্তু সংঘশক্তির ব্যাপ্তিলাভ এক কথা, আর স্থায়িত্বলাভ অন্য কথা। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী-সংঘের এ গঠনমূলক দিকের প্রতিও অনবহিত ছিলেন না। সংঘশক্তির মধ্যে যাতে ভবিষ্যতে কোন শিথিলতা দেখা না দেয় সেজন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কর্মীর জন্য তিনি সৃষ্টি করেন নিয়মব্রতের লৌহশৃঙ্খল। এ' ছাড়া মানবহিতব্রতী মিশনের কর্মীরা রাজনীতিচর্চায় যোগ দিয়ে সেবাব্রতের আদর্শকে যাতে ক্ষুণ্ণ না করেন তার জন্যও সংঘের অনুষ্ঠান-সূচীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন বিবেকানন্দ। সংগঠনশক্তির দিক দিয়ে এ' হল বিবেকানন্দের দূরদৃষ্টির পরিচয়।

আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য এরূপ স্থায়ী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা না করে গেলে আমাদের এ' আত্মবিস্মৃত দেশ রামমোহনের কর্মাদর্শকে যেমন ভুলে গেছে তেমনি বিবেকানন্দের মহৎ কর্মোদ্যমের কথাও ভুলে যেত নিশ্চয়ই!

॥ চতুর্থ অবদান ॥

॥ ভারতে বিবেকানন্দের দান ॥

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী যখন শিকাগো নগরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন তখন হইতেই তিনি প্রতীচ্যে ধর্মপ্রচারক হিন্দু সন্ন্যাসী (Hindu Monk of India)-রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসীরা সঙ্গত কারণেই স্বামিজীর এই নাম দিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে গৈরিক হিন্দু-সন্ন্যাসের চিহ্ন। অতএব গৈরিক বস্ত্র ও উত্তরীয়ধারী স্বামিজী তাঁহাদের কাছে হিন্দু মংক্। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে কিন্তু এই পরিচয় বাহ্য। ধর্মসম্মেলনে স্বামিজী প্রথমে যে বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই তাঁহার ধর্মতত্ত্ব এবং জীবনদর্শনের আদর্শ সত্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণকারী পাশ্চাত্ত্যের নরনারীকে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী যে ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে তাহা প্রতীচ্য কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। যে ধর্ম অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে এই ধর্মগ্রহণের অধিকার দেয় নাই বলিয়া তাহারা জানিত, সেই ধর্মের একজন প্রচারকের মুখে এই সম্বোধন তাহাদিগকে অবশ্যই অভিভূত করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বামিজী সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া এই সম্বোধন করেন নাই। পরমহংসদেবের কৃপাস্পর্শে তিনি বেদান্তধর্মকে যে উদার, মানবধর্মানুসারী দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলেন তাহার ফলেই তিনি জানিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ভাই-বোনের সম্পর্ক।

১৮৯৭-এ স্বামিজী ভারতে ফিরিয়া আসেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণকালে জনসাধারণের সহিত আন্তরিকভাবে মেলামেশা করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য একান্তরূপেই বস্তুবাদী হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্যসম্পদ আহরণ করিয়া ইহজীবনকে সুখকর করিয়া তোলাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য।

তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং কর্মপ্রচেষ্টা ঐ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত। তাই তাহাদের আত্মা উপবাসী, জীবনে অতৃপ্তি। ভারতে ফিরিয়া স্বামিজী দেখিলেন যে, ভারতবাসী ইতিমধ্যে য়ুরোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আত্মাকে অস্বীকার করিবার যে শক্তি বস্তুবাদী ইউরোপ অর্জন করিয়াছে, ভারতবাসী তাহা করিতে পারে নাই। তাই তাহারা নির্বিচারে অন্ধভাবে য়ুরোপীয়দের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে। ভারতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তুতি চলিতেছে। কিন্তু এই স্বদেশীভাব য়ুরোপের পেট্রিয়টিজমের অনুবাদমাত্র। ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নাই ; ইংরাজী শিক্ষার সহিত য়ুরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ফলে ভারতবাসীর মনে ভাবপ্রবণতার একটা উচ্ছ্বাস-মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামিজীর চোখে ইহা একটা প্রবল বিভীষিকারূপে দেখা দিল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিকে সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্ত্যমোহমুক্ত করিতে হইবে।

স্বামিজী বেদান্তধর্মের যে মানবিকতাসম্মত ব্যাখ্যা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন, তাহাকে মূলমন্ত্র করিয়া ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাকে অধ্যাত্ম-সাধনায় পরিণত করিতে চাহিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জাতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন না করিলে সত্যকার জাতীয়তাবোধ জাগে না, আত্মা উদ্বোধিত না হইলে মানুষের চিত্ত সচেতন হয় না। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই য়ুরোপীয় জড়বাদের পরিবর্তে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্বামিজী উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—ভুলিও না ভারত, তোমার নারীজাতির আদর্শ, তোমার উপাস্য দেবতা সর্বত্যাগের আদর্শ, তোমার জীবন সমাজ-সেবায় উৎসর্গীকৃত।

স্বামিজী ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবাসীর স্বদেশ "বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভারতবাসীমাত্রেই মহামায়ার সন্তান। ভারতবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,— 'ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ × × বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ × ×"।

তাই আজ নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবোধকে অধ্যাত্ম-সাধনার পর্যায়ে উন্নীত করিয়া বহুমুখী ও ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার পথ স্বামিজী ভারতকে দেখাইয়াছেন। বিরাট মহামায়ার ছায়াস্বরূপ ভারতের সমাজদেহে নীচ বলিয়া অপমানিত, দরিদ্র বলিয়া পীড়িত, মূর্খ বলিয়া নিন্দিত

সকল ভারতবাসীকে মর্যাদা দান করিয়া তাহাদিগকে উন্নত না করিলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই স্বামিজী সেবাধর্মের আদর্শে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেবাধর্মে দীক্ষিত "একদল আগুনের মতন তেজস্বী ও জোয়ান ছেলে" তৈয়ারী করার জন্য ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল।

স্বামিজী ভারতবাসীকে যে বাণী এবং জীবনাদর্শ দান করিয়াছেন তাহা তাহাদের অন্তরে অবদান হইয়া রহিয়াছে। আজিকার ভারতবাসী স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারে,

ভুলে থাকা সে তো নহে ভোলা।
বিস্মৃতির মর্মে বসি' দিয়েছো যে দোলা।
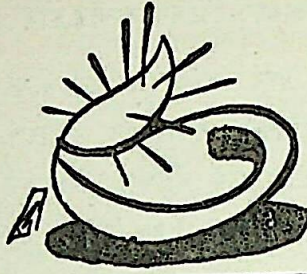
॥ পঞ্চম অবদান ॥

॥ বিবেকানন্দের সন্ধান ও সিদ্ধি ॥

[প্রাক-শিকাগো পর্ব]

১৮৬০ থেকে ১৮৮০,—সেকালের শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে এই বিশ বছরের প্রধান আন্দোলন মানে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎসাহ-উদ্দীপনা, সামর্থ্য বা বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। সাহিত্যে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন,—সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের নাম অবিস্মরণীয়। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৭০-এ, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮০-তে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বেরিয়েছিল ১৮৫৫-তে এবং 'বহুবিবাহ রোধিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দু খণ্ড বেরোয় যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ইত্যাদি বক্তৃতাগুলি 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামে ১৮৬১-তে সংকলিত হয়। সেই বছরেই রাজনারায়ণ বসুর 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' ছাপা হয়; তাঁর বক্তৃতা বেরোয় ১৮৭০-এ; 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' ছাপা হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ সাধিত হয়। এ ছাড়া আরো নানা সৃষ্টি, নানা চিন্তা এবং ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞানের সন্ধানে, কর্মবৈচিত্র্যের উদ্দীপনায়, সৃষ্টির প্রেরণায় সেই যুগ ছিল বিশিষ্টতা-চিহ্নিত। বিবেকানন্দের শৈশব, বাল্য, কৈশোর কেটেছে সেই পর্বে। ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে সে-পর্বে কেশবচন্দ্র আর প্রতাপ মজুমদারের নাম সর্বপ্রধান। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে বিলেত যাত্রা করেন। মনোমোহন ঘোষ তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। কেশবচন্দ্র বিলেতে গেছেন ১৮৭০-এ। তার আগেই ১৮৬৬-তে তাঁর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিলেত থেকে ফিরে তিনি Indian

Reform Association গড়েছেন। ১৮৭৬-এ Albert Hall স্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র জনগণের ঐক্যজাগৃতির জন্যে দয়ানন্দকে হিন্দি শিখে নিতে উৎসাহিত করেছেন তিনি। যে বছর কেশবচন্দ্র বিলেত যান, সেই ১৮৭০-এ বালক নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিট্যুশনে ভর্তি হন। ১৮৭৮-এ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' জন্মগ্রহণ করে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর শিবনাথ শাস্ত্রী সে-সমাজের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য। নরেন্দ্রনাথ সে সভার সদস্য ছিলেন। কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে তিনি যোগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রবেশিকার আগে থেকেই আহম্মদ খান আর বেণী গুপ্ত, এই দুই ওস্তাদের কাছে কণ্ঠসংগীত আর যন্ত্রসংগীতের পাঠ নেন। কলেজে পড়বার সময়ে বন্ধু-মহলে বেশ জনপ্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। তখন খুব চা আর কফি খেতেন। ঘোড়া-চড়বার ঝোঁক ছিল। হার্বার্ট স্পেন্সারকে চিঠি লিখেছিলেন একবার। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনের অধ্যক্ষ W. W. Hastie সাহেব তাঁকে ভালোবাসতেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুরেন বাঁড়ুজ্যে যখন মাৎসিনি গারিব্‌লডির কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, নরেন্দ্রনাথ তখন সে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। নবগোপাল মিত্র ছিলেন ঠনঠনে মিত্র-পরিবারের সন্তান, শিমুলিয়া দত্ত-বাড়ির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল,—দত্তদের দৌহিত্র তিনি। ভূপেন দত্ত লিখে গেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ সে-সময়ে নবগোপাল আর কেশবচন্দ্রের প্রভাবের মধ্যেই যৌবন উদ্‌যাপন করেছেন। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স তাঁর নিরন্তর বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধিচর্চায় কেটেছে। মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়—বিবেকানন্দ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও খুব পড়েছেন। সেই সত্তরের দশকে, ১৮৭৫ থেকে কেশবচন্দ্র তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের অসাধারণ সাধক-ভাবের কথা লিখতে শুরু করেন। শোনা যায় 'পরমহংস' উপাধি নাকি কেশব চন্দ্রেরই দান। তাঁরই বাংলা পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব'-তে ১৮৭৫-এর ১৪ই মে ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনী ছাপা হয়। কেশবচন্দ্র আর অধ্যক্ষ হেষ্টির লেখালেখির ফলেই রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিক্ষিত-সমাজ প্রথম অবহিত হয়। ১৮৮১-র ৯ই অক্টোবর ও ১১ই ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় ভগবান রামকৃষ্ণের কথা ছিল। ১৮৭৯-তে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ ১৮৮০-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলেজে যেতেন কালো আলপাকার চাপকান পরে, ট্রাউজার পরে,—কব্জীতে বাঁধতেন রিষ্টওয়াচ। কলেজের দ্বিতীয় বছরে পড়বার সময়ে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়। তখন শরীর সারাতে কিছুদিনের জন্যে গয়ায় গিয়েছিলেন। পার্সেণ্টেজ কম ছিল বলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ.

পরীক্ষায় বসতে দিতে বাধা ওঠে। তখন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনে চলে যান। সেই সময়ে পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে নরেন্দ্রনাথ বিলেত যাবার অভিপ্রায় জানান। কিন্তু বিশ্বনাথ রাজী হন নি। তিনি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে চান নি। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন নরেন্দ্রনাথের একই কলেজের প্রবীণতর ছাত্র। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনিই বলে গেছেন এসব কথা। ১৮৮৩-তে বি. এ. পাশ করে ১৮৮৪-তে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিট্যুইশনের আইন-বিভাগে ভর্তি হন। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনে পড়বার সময়েই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ঠাকুর তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরদর্শনের জন্যে ব্যাকুল হন। সেই অবস্থায় একবার গিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। তারপর যান রামকৃষ্ণের কাছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রামকৃষ্ণের শেষ অসুখে সেবার দায়িত্ব উপলক্ষ করে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রস্তুতি দেখা দেয়। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে কলকাতায় শ্যামপুকুরে, পরে কাশীপুর বাগান-বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা সেই সেবার ব্রতে সম্মিলিত হন। কাশীপুর-বাগানবাড়ি থেকেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-সংঘের সেবাব্রত রূপ নিতে থাকে। তাঁদের কর্মসূচী পরে সুচিহ্নিত হয় বটে, কিন্তু তখন থেকেই তার সূত্রপাত ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট, সোমবার প্রত্যুষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লোকান্তরিত হন। সেই বছরেই বড়দিনের সময়ে ভক্ত-ভ্রাতৃমণ্ডলীর এক সম্মেলন হয়। কিন্তু সে-সময়ে এইসব সাধক ভক্তের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন না। সারদা দেবীর সঙ্গে তখন কোনো কোনো ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। যোগানন্দ আর লাটুমহারাজই ছিলেন সে-কালের রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রধান কর্মী।

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বিরজা হোম করে যথারীতি সন্ন্যাস নেন আরো কিছু পরে। ১৮৮৮ পর্যন্ত তিনি প্রধানতঃ বরানগরেই বাস করেন। তবে, সেই বছরেই হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে বারাণসী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাথরাস, ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে আসেন। হাথরাসের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত। নরেন্দ্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় ষ্টেশনে নামলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। চাকরি এবং সংসার ছেড়ে;—ফার্শী ভাষায় এবং সুফী-দর্শনে অভিজ্ঞ শরৎচন্দ্র গুপ্ত 'সদানন্দ' নামে পরিচিত হন; রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন যে, এই সদানন্দ ছিলেন Franciscan Grace-এর প্রতিমূর্তি।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আবার ভ্রমণে বেরোন। সেবার তিনি যান গাজিপুরে। রোলাঁর মতে,—গাজিপুর ভ্রমণ পর্বটিতেই তিনি মানবকল্যাণ-চিন্তা বা লোকহিতচর্চার আসল আদর্শের দেখা পান। ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে অল্পকালের জন্তে তিনি গাজিপুরে আর এলাহাবাদে যান। এই সব ঘটনার মধ্যেই হিন্দু-বিশ্বাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে তিনি অন্বয়উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন।

১৮৯০-এর জুলাই মাসে তিনি বরানগর ছাড়েন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লোকান্তরিত হবার পরে, সেই সময়ে গভীরভাবে তিনি নির্জনতা খুঁজছিলেন। আত্মানন্দ তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যান, গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলমোড়ায় সারদানন্দ আর কৃপানন্দের দেখা পান তিনি। তুরীয়ানন্দও এসে পৌছোন। ১৮৯১-এর জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে তাঁদের মীরাটে রেখে নরেন্দ্র চলে যান। তাঁরা দিল্লীতে গিয়ে পৌছোন। অভিপ্রেত নিঃসঙ্গতায় এইভাবে বাধা পড়ায় নরেন্দ্র খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁদের বকাবকি করেন। তারপর ১৮৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী ত্যাগ ক'রে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে 'ডিপথিরিয়া' রোগে তিনি বিপন্ন হন। কিন্তু পেছিয়ে যাবার মানুষ ছিলেন না তিনি। ১৮৯১ থেকেই তাঁর পরিব্রাজক-জীবন, কর্ম-ব্যাকুলতা, নির্জনতা-প্রীতি, এবং জ্ঞান আর কর্মের ঐক্য-সন্ধান তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৯১এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় যান রাজপুতানা, আলওয়ার,—তারপর জয়পুর, আজমীর, খেতড়ী, আহমেদাবাদ, কাথিয়াবার, জুনাগড়, গুজরাট,—পোরবন্দরে প্রায় আট-ন মাস কাটিয়ে দ্বারকায় পৌছোন,—বরোদা রাজ্যে যান,—খাণ্ডোয়া হয়ে, বোম্বাই হয়ে পুনায়,—১৮৯২-এর অক্টোবর মাসে বেলগাঁও,—বাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবান্দ্রম, মাদুরা দেখে রামেশ্বর,—সেই ১৮৯২-এরই শেষদিকে পৌছে-ছিলেন কন্যাকুমারীতে। ১৮৯১-এর এপ্রিলে খেতড়ীর মহারাজার সঙ্গে বাস করেন তিনি। কিছুদিন হিমালয়ে তিব্বতীদের সঙ্গেও বাস করেছেন। কন্যাকুমারী থেকে পণ্ডিচেরি হয়ে তিনি মাদ্রাজে যান। আর, একথাও স্মরণীয় যে, ১৮৯৩-এর প্রথম দিকেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে যাবার বাসনা প্রকাশ করেন তিনি।

কর্ম আর জ্ঞান, এই দুটি শব্দের ইঙ্গিত দুই পৃথক ক্ষেত্রের দিকে,—দুটি শব্দে পৃথক দুই অঞ্চল বুঝিয়ে থাকে,—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্র এক হয়ে দেখা দিয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন—'Naren, with whom dream itself was action'! ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বাগবাজার থেকে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর মা আর দুই ভাইয়ের তখনকার দুরবস্থার কথা লেখেন। তাঁর পিতৃবিয়োগের পরে তাঁদের খুবই অশান্তি-

জনক পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হয়েছে। সেই চিঠিতে তিনি জানান—'ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।' এই দুঃখ দেখে তাঁর মনে 'রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়'—এবং সেই কথা স্মরণ করেই 'গীতা'-র শ্লোক উল্লেখ করে প্রমদাদাসকে তিনি আরো লেখেন—'আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূর-পরাহত হইয়া যায়……।'

স্বামিজীর সেই চিঠিতে তাঁর নিত্যসঙ্গী গীতা, আর Imitation of Christ,—দুয়েরই উল্লেখ ছিল। গীতা থেকে তিনি স্মরণ করেছিলেন :

> আপূর্য্যমাণ মচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
> তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

অর্থাৎ সমুদ্রে অজস্র জলধারা প্রবেশ করলেও সমুদ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি যাঁর মধ্যে অজস্র কামনা প্রবেশ করে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন ; যিনি সকাম কর্মে নিযুক্ত, তিনি অশান্ত।

আর, Imitation of Christ থেকে তিনি স্মরণ করেন—"We have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen."

এই চিঠির পাঁচ বছর পরে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে তিনি লিখেছিলেন—'যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও'। জনকল্যাণের কর্মী যাঁরা, শিবানন্দকে তাঁদেরই কথাপ্রসঙ্গে সেই চিঠিতেই তিনি ইংরেজিতে যা লেখেন তার বঙ্গানুবাদ এই—'যে কোন ভাষারই আবরণে থাকুক না কেন, মানুষ ভালবাসা আপনা হতেই টের পায়।' রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই প্রেমেই তিনি তাঁর 'কেনা গোলাম' হয়েছিলেন। শিবানন্দকে তিনি লেখেন—'ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই',—আবার,—'দাদা, বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim.

He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India."

এই ইংরেজির পরেই আবার বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে লেখেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট, কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস? ভায়া, যীশুখ্রীষ্টকে জেলে মালায় ভগবান বলেছিল. পণ্ডিতেরা মেরে ফেল্‌লে. বুদ্ধকে বেনেরা খালি তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।

কেশবচন্দ্র সেন. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি সাধক মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়।

১৮৮৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে যান। আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। ১৩৫৫ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের 'পত্রাবলীর' প্রথম চিঠি সেই আঁটপুর থেকে লেখা—মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্দেশে। স্বামিজী মহেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—'আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে'। ১২ই আগষ্ট ১৮৮৮ থেকে শুরু করে ৪ঠা জুন ১৮৯০ পর্যন্ত প্রায় দু'বছরের মধ্যে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয় প্রথম খণ্ডে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থভ্রমণের উল্লেখ আছে এই সব চিঠির মধ্যে,—আবার কখনো বরাহনগর মঠ থেকে, কখনো বা বাগবাজার থেকে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে রামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর বেদান্ত-পাঠ, পাণিনি-ব্যাকরণ চর্চা ইত্যাদির কথা আছে। ১৯-এ নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে বরাহনগর মঠ থেকে তিনি কাশীপ্রবাসী প্রমদাদাসকে জানিয়েছিলেন—'এই মঠে অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি'। বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়েই তাঁরা পাণিনি পড়তে আগ্রহী হয়েছিলেন। প্রমদাদাস সেই

সময়—সম্ভবতঃ ১৮৮৯-এর প্রথম দিকেই নরেন্দ্রনাথকে কাশীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি গুরুদেবের জন্মভূমি দেখতে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ পথে রোগাক্রান্ত হন। প্রথমে জ্বর হয়, তারপর ভেদবমি। সেবারে তাই আর কাশী যাওয়া হয়নি। ২১-এ মার্চ ১৮৮৯ তারিখের চিঠিতে তিনি লেখেন—'অধুনা কাশী যাইবার সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীরগতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে'। জ্ঞানানন্দ তখন কাশীতে। রাখাল আর সুবোধ—দুই গুরুভ্রাতা কাশীতে যান ঐ ১৮৮৯ সালের শেষ দিকে। গঙ্গাধর এবং আর চারজন ভক্ত তখন উত্তরাখণ্ডে। গঙ্গাধর তিব্বতে ঘুরে আসেন। তিনি ভূটানেও গিয়েছিলেন। কেদারনাথ তীর্থের পথে শ্রীনগরে শিবানন্দ নামে নরেন্দ্রনাথের এক গুরুভ্রাতার সঙ্গে গঙ্গাধরের দেখা হয়। তিব্বতীরা ফিরিঙ্গির চর মনে করে গঙ্গাধরকে কেটে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু কোনো কোনো লামার করুণায় তিনি বেঁচে যান।

১৮৮৯-এর ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, শিমূলতলায় তাঁর পূর্ব অবস্থার এক আত্মীয় একখানি বাড়ি কিনেছিলেন এবং সে-বাড়িতে ঐ সময়ে নরেন্দ্রনাথ নিজের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত গরমের ফলে উদরাময় দেখা দিতেই তিনি শিমূলতলা পরিত্যাগ করেন। সেই চিঠিতে নরেন্দ্রনাথের নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঈষৎ উল্লেখ আছে। নিজেদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর নিজের তখনকার স্মরণীয় মন্তব্য বলেই সে-অংশটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য :

> "ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৫।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট"।

হাইকোর্টে মকদ্দমার খরচা জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে, নরেন্দ্রনাথের মা আর ভাইয়েরা পৈতৃক বাড়ির ভাগটুকুই শুধু পেয়েছিলেন। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সেবার সেই মকদ্দমা শেষ হয়ে গেলে তিনি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত বোধ করেন। প্রমদাদাসের আশীর্বাদ কামনা করে তিনি 'চিরদিনের মত বিদায়' প্রার্থনা করেন। তখন নরেন্দ্রনাথের ঠিকানা ছিল—বলরাম বসুর বাড়ি, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
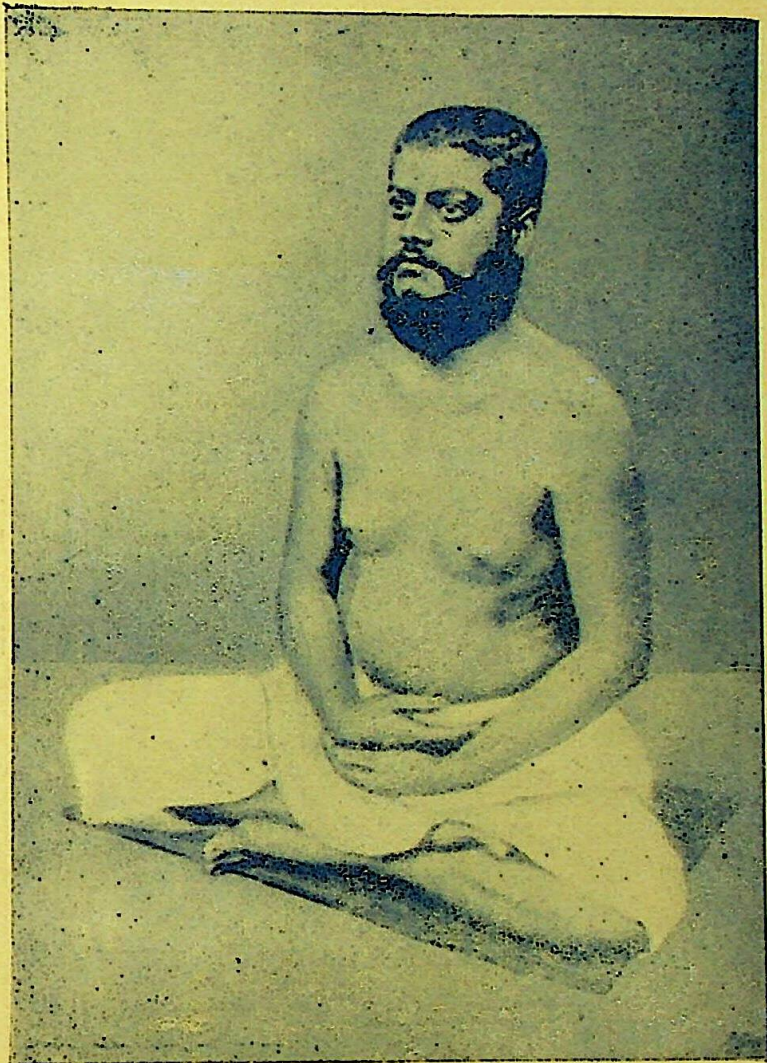
তাঁর মনে তখন—একদিকে সংসারের নানাদুঃখে কতকটা অভিভূত ভাব আর কতকটা আধ্যাত্মিক সত্য-জিজ্ঞাসা, দুইই কাজ করেছে। প্রমদাদাসের সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। সে-সময়ের এক চিঠিতে প্রমদাদাসের কাছে তিনি বারো দফা প্রশ্ন জানিয়েছেন। সে-চিঠির তারিখ, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯। সে-সব প্রশ্ন গভীরভাবে তাঁরই নিজস্ব ভাবজীবনের সঙ্গে জড়িত! যেমন, একটি প্রশ্নে তিনি জানান—'যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতে-ছেন। কোন্ কথা শোনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?' চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রমদাদাসের সঙ্গে তাঁর আরো অনেক আলোচনা হয় সে-সময়ে। শঙ্করের বিবর্তবাদ,—জার্মান Transcendalist-দের সম্বন্ধে স্পেন্সারে বিদ্রূপ, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি নানা মত, নানা দৃষ্টির কথা উঠেছিল।

১৮৮৯এর ডিসেম্বরের শেষদিকে তিনি বৈদ্যনাথে পূর্ণবাবুর বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে কাশী যাত্রা করেন, কিন্তু গুরুভ্রাতা যোগেন্দ্র তখন চিত্রকূট, ওঙ্কারনাথ ইত্যাদি দেখে প্রয়াগে পৌঁছে বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে সেবা করবার জন্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছোন। ৩০এ ডিসেম্বর সেই প্রয়াগধাম থেকেই প্রমদাদাসকে পুনরায় চিঠি লেখেন। এলাহাবাদে তিনি চক অঞ্চলে ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়িতে ছিলেন।

১৮৯০এর জানুয়ারিতে [২১এ জানুয়ারি] তিনি গাজীপুরে গিয়ে তাঁর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দেখবেন বলেই সেবার গাজীপুরে যাওয়া। পওহারী বাবা থাকতেন উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এক বাড়িতে। বাড়ির বাইরে আসতেন না তিনি। দরজায় দাঁড়িয়ে, ভেতর থেকেই নিজের ইচ্ছেমতন কখনো কখনো কারও-কারও সঙ্গে কথা বলতেন তিনি। বিবেকানন্দ ৩১এ জানুয়ারি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, বাবাজীকে দেখবার চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু দেখা মেলেনি। তারপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০এর চিঠিতে বাবাজীর দর্শনলাভ,—তাঁর মহাপুরুষভাব সম্বন্ধে নিজের সংশয়মোচন ইত্যাদি কথার উল্লেখ আছে। তাঁর নিজের কথায়—'ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন'। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দ সে-চিঠিতে লিখে গেছেন—'আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না'। তাঁরই আজ্ঞা-মতন সেবার কিছুকালের জন্যে তিনি সেখানে ছিলেন। আর, তিনি নিজে একথাও লিখে গেছেন—'ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না'। আবার মার্চের প্রথম দিকেই [৩রা মার্চ, ১৮৯০] প্রমদাদাসকে তিনি পওহারী

৪

বাবা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহমান্দ্যের কথাও জানিয়েছেন। পওহারীর সাধনা অপূর্ণ আছে—এরকম সন্দেহের কথাও আছে।

১৮৯০এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি গাজীপুর থেকে কলকাতায় বলরাম বসু মহাশয়কে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতেও পওহারী বাবার প্রসঙ্গ ছিল। ঐ ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি উত্তরকুরুবর্ষ—অর্থাৎ তিব্বত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেবকে তিনি যে খুবই ভক্তি করতেন, সে বৃত্তান্তেরও উল্লেখ ছিল সেই চিঠিতে। প্রসঙ্গতঃ এদেশে তন্ত্রসাধনার ধারা সম্বন্ধে তিনি জানান যে, বৌদ্ধরাই আমাদের দেশে তন্ত্র-প্রবর্তনার জন্যে দায়ী। বামাচারের আতিশয্যে তারা যখন নির্বীর্য হয়ে পড়ে, তখন কুমারিল ভট্ট তাদের তাড়িয়ে দেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে থাকে। বর্মা ও সিংহলের বৌদ্ধেরা তন্ত্র মানেন না, কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধেরা মানেন। বেদের কর্মবাদ অন্যান্য ধর্মের কর্মবাদের সঙ্গে মেলে। কর্মের উদ্দেশ্য—'বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধ করা'। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেবই প্রথম মানুষ—The first man,—যিনি এর বিপক্ষে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব আর শঙ্করাচার্য—এই দুই মহাত্মার ধর্মসাধনার সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের হৃদয় পান নি। বিবেকানন্দ তাঁর সেই চিঠিতেই জানিয়ে গেছেন—'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর'। স্বামী অখণ্ডানন্দ "সুত্তনিপাত" থেকে গণ্ডারসুত্তের অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদের প্রশংসা করে বিবেকানন্দ গীতার (৬।৮) 'জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ' অবস্থার দিকে তর্জনী নির্দেশ করেন।

ঐ বছর মার্চ মাসে গাজীপুর থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি যা' লিখেছিলেন, তারই এক জায়গায় ছিল—'বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়'। হঠযোগে ব্রতী বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্যটির গুরুত্ব কম নয়। ১৮৯০এর কাছাকাছি সময়ে তাঁর এই মানসিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের এই দিকটি দেখবার মতন। পওহারী বাবা ছিলেন রাজযোগী। রাজযোগীদের সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ কমতে থাকে এবং ঐ মার্চ মাসে তিনি এই কথা ভাবতে থাকেন যে, আর কোনো মিঞার কাছে যাবার দরকার নেই। এই সূত্রেই রামপ্রসাদের গানের কলি স্মরণ করেছিলেন:

আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে
(ও মন), কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচতুয়ারে ॥

সেইসব কথার সঙ্গেই সে-পর্বের চিঠিপত্রে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর গভীর যোগাযোগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন—রামকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ কিংবা অবতার।

মার্চের শেষ দিকের (৩১এ মার্চ ১৮৯০) এক চিঠিতে তিনি তাঁর তখনকার মানসিক অশান্তির কথা আবার জানিয়েছিলেন—"আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি কে জানিবে?"

২৬এ মে ১৮৯০ তারিখে, ৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের বাড়ি থেকে প্রমদাদাসকে লেখা এক চিঠিতে তিনি আবার জানান—"আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলু' করিয়াছি"। তারপর নিজের গুরুদেব সম্বন্ধে তিনি পুনরপি জানান—'আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি'। ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই মত ছিল যে, পূর্ণসিদ্ধ ব্যক্তি ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু দেহাদি ভাবনার নিবৃত্তি যতক্ষণ না ঘটে, দেহীর দেহসংস্কার যতক্ষণ অন্তর্হিত না হয়, ততক্ষণ এক জায়গায় বসে সাধনা করাই দরকার। সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন: 'অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসীমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটিতে একত্রিত আছেন, সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার তুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদির খরচ এবং বাটীভাড়া দিতেন। তাঁর সেই চিঠিতেই সুরেশবাবুর মৃত্যুর খবর ছিল—'তিনি কল্যরাত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন'। বলরামবাবু তার অল্প আগেই মারা গেছেন। ১৫ই মার্চ ১৮৯০এর চিঠিতে বলরামবাবুকে তিনি তাঁর কাছে আর চিঠি লিখতে নিষেধ করেন। বলরাম বাবুর এবং সুরেশবাবুর অসুস্থতার খবর পেয়ে সেই চিঠিতে তিনি উদ্বেগও প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দের পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর এই চিঠিখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রমদাদাসকে তিনি এই কথা জানিয়েছিলেন যে, কাশী প্রভৃতি দূর অঞ্চলে হয়তো চাঁদা উঠতে পারে। কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাতীরে জমি কিনতে ৫।৭ হাজার টাকা লাগবে। সুতরাং স্থায়ী একটি মঠ বা আশ্রমের জন্যে চাঁদা তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এদিকে, বলরামবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়েই বিবেকানন্দ গাজীপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। সে-সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠের খরচ চালাতে থাকেন।

১৮৯০এর ৬ই জুলাই তারিখে স্বামী সারদানন্দকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায় যে, অতঃপর তিনি নিজে আলমোড়ায় যেতে উদ্যোগী হন—'সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা; গদাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে'।

তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা এবং পরিব্রাজকপর্বটুকুও বিশেষভাবে দেখা দরকার। ঠাকুর-শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় থেকে শুরু করে, পরবর্তী ছ-সাত বছরের নিরন্তর সংঘ-গঠনের মনোযোগ ও কর্মব্যস্ততার পাশাপাশি তাঁর আধ্যাত্মিক সন্ধান ও স্বীকৃতির অজস্র তথ্য সাজিয়ে দেখলেই তাঁর আত্মোপলব্ধির সূত্রগুলি পাওয়া যাবে। এই বিচিত্র ভ্রমণের মধ্যেই ১৮৯১এর এপ্রিলে তিনি আজমীর থেকে আবুপাহাড়ে যান। ১৮৯২এর সেপ্টেম্বরে তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ে। ২০শে সেপ্টেম্বর খেতড়ির পণ্ডিত শঙ্করলালকে তিনি লিখেছিলেন: ভারতবর্ষীয়দের বিদেশ ভ্রমণ দরকার, মানবসেবার আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার। ১৮৯৩এ মাড়গাঁও থেকে হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠিতে তাঁর দক্ষিণভারতের পাঞ্জেম প্রভৃতি গ্রাম ভ্রমণের উল্লেখ আছে। এই চিঠিতে তিনি 'সচ্চিদানন্দ' নাম সই করেন। আমেরিকা-যাত্রার কিছু আগে থেকে আমেরিকা-যাত্রা পর্যন্ত এই নামেই তিনি চিঠি সই করতেন। ২১এ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের খার্তাবাদে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে লেখা আলাসিঙ্গার নামে একখানি চিঠি পাওয়া গেছে। সেই চিঠিতে তাঁর আমেরিকা-যাত্রার আয়োজনে কিছু যে দেরী হয়ে গেছে—অতিরিক্ত গরমের জন্যে তিনি যে রাজপুতানায় ফিরতে পারবেন না, ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যক্তিগত খবর ছিল। তবে ২৭এ এপ্রিল, ১৮৯৩ তাঁকে রাজপুতানায় খেতড়িতে বিদ্যমান দেখা গেছে। সেখান থেকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন।

বিবেকানন্দের সন্ধান ও সিদ্ধি বলতে যা বোঝায়, একদিকে সে তাঁর সারা জীবনের তপস্যা, অন্যদিকে সে-তপস্যার ফললাভের জন্যে মানব-জগতের প্রস্তুতি বা সামর্থ্য। তাঁর সন্ধানের দিকটিই এখানে আলোচিত হোলো। তাও সম্পূর্ণ নয়। আগেই সে-কথা বলা হয়েছে। শিকাগো যাত্রার আগে পর্যন্তই এ-আলোচনার সীমা। আর, তাঁর সিদ্ধি তো জগৎব্যাপী। সেটি অনুভূতির বিষয়।
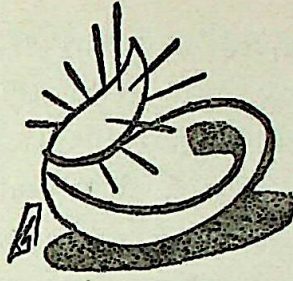
॥ ষষ্ঠ অবদান ॥

॥ ধর্মগুরু বিবেকানন্দ ॥

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, শিক্ষা কল্প নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ ব্যাকরণ বেদ প্রভৃতি অপরা বিদ্যা, আর যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় তাই পরাবিদ্যা। ধর্মের পথে চালনা করে বলে শিক্ষা বা বেদশিক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ছিল সকল কাজের উৎস। প্রাচীন ভারতের আদি-সাহিত্য—ঋক সাম যজু অথর্ববেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি সবই ধর্মসাহিত্য। প্রৌঢ় অবস্থায় লোক যখন বানপ্রস্থে যেতেন তখন বয়সের জন্যে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাঁদের দার্শনিক চর্চা আরণ্যক বলে পরিচিত হয়েছিল। সেই দার্শনিক চর্চা উপনিষদে আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। বলা হয়, উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড পূর্ণতা লাভ করেছে। উপনিষৎ তাই জানার শেষ সীমায় উপনীত,—বেদান্ত। প্রাচীন ঋষিরা যা' দেখেছেন, অর্থাৎ ধ্যানযোগে যা' অনুভব করেছেন তাই উপনিষদে উল্লেখ করেছেন। গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন 'তত্ত্বমসি'। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, আমাদের অজ্ঞানতার জন্যে ভেদ মনে হয়। শঙ্করাচার্য উপনিষদের জ্ঞানমূলক ভাষ্য করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে তৎকালীন প্রধান পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে তিনি নিজস্ব অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করের পূর্বেও বেদান্তভাষ্য ছিল, শঙ্করের ভাষ্যের পরে বেদান্তভাষ্য বলতে তাঁর ভাষ্যই বোঝায়। তবু বলব ভারতের এ' সব জ্ঞানের ঐতিহ্য পণ্ডিতেরাই বুঝতে পারে। সাধারণের শিক্ষার জন্য এ' সব ব্যবহার করা চলে না। অথচ এ' জ্ঞানের কথা, আশার কথা সাধারণে না জানলে চলবে কেন। বিশ্ববাসীকে সহজ করে জ্ঞানের সার পরিবেশণ করা যায় না কি? স্বামিজী সরল ভাষায় বেদান্ত বোঝাতে আরম্ভ করলেন। কেবল বোঝানো নয়, ব্যবহারিক জীবনে যে

বেদান্তের সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব তাও প্রমাণ করলেন। নিজে না দেখলে না বুঝলে, কেবল অন্যের কথায় মেনে নেবার লোক তিনি ছিলেন না। উপনিষৎ বলছে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। স্বামিজী বললেন, সময় আসে যখন ঐ একত্বের উপলব্ধি হয়। উপনিষদের উক্তি অভ্রান্ত। তিনি বলেছিলেন, তাঁর জীবনে এই অনির্বচনীয় অনুভূতি হয়েছিল; দক্ষিণেশ্বরের বাগানে যখন শ্রীঠাকুর তাঁর বুকে হাত দিয়েছিলেন তখন। আর একবার হয়েছিল আমেরিকায়, লেকের ধারে। সে-পরমমুহূর্তে তিনি দেখেছিলেন, বাড়িঘর দুয়ার জানালা বারান্দা গাছপালা চন্দ্র সূর্য সব যেন কোথায় কি হয়ে গেল। সব যেন ভেঙে চুরে অনু-পরমাণু হয়ে যেন আকাশে বিলীন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চৈতন্য, অহঙ্কার সব অবলুপ্ত হয়ে গেল। তাঁর আর কিছু মনে রইল না। ক্রমে তাঁর দেহজ্ঞান ফিরে এল, আবার সবই দেখলেন—সেই ঘর, সেই বাড়িবাগান সব।

শুনে কেউ কেউ বলেছিলেন, মস্তিষ্কের বিকারের ফলেও লোকে এই রকম দেখে! স্বামিজী বলেছিলেন, বিকার কি হে! দেখলাম যখন, তখন কোন রোগও হয়নি, নেশাও করিনি। তাছাড়া অনুভূতিগুলি যে বেদের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!

এই তো সেই দর্শন; জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়। কলসীতে সমুদ্রের জল ধরা হল। বলা হল কলসীর জল আর সমুদ্রের জল। কলসী ভেঙে দিলে সমুদ্রের জল আর কলসীর জল ভিন্ন থাকে না। দৃশ্যমান জগৎ ভ্রমমাত্র—রজ্জুতে সর্পভ্রম, সূর্যকিরণে মরীচিকা ভ্রম। ভেদবুদ্ধি থাকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার প্রভাবে। যার সৌভাগ্য থাকে, তার সে আবরণ অপসৃত হয়।

শ্রীঠাকুর ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। সমাধিকালে মায়াজনিত দেশ কাল নাম ও রূপের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে না। নাম-রূপধারী জগৎ লীন হয়ে যায়, আর ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রীঠাকুর স্বামিজীকে কেবল স্পর্শদ্বারা সেই উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামিজী কেবল বেদান্ত পড়েন নি, বেদের সার অনুভব করেছিলেন, তাই তাঁর বলা লেখা এত উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে। স্বামিজী কথাটি সহজ করে বুঝিয়েছিলেন। ভারতের ধর্ম উদার। পতঞ্জলি বলেছিলেন, মোক্ষলাভের চারিটি পথ—ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের বাচক শব্দের জপ, মহাপুরুষের চিন্তা, যা' ভাল লাগে তার ধ্যান। তিনি পথগুলির তারতম্য করেন নি। যে কোন পথে চললেই—যার আবেগ আছে তিনি মোক্ষলাভ করবেন। রাজার ধর্ম হল প্রজার সুখ সুবিধা দেখা। অভিষেক সময় প্রাচীন ভারতের রাজা-প্রজাদের উদ্দেশ্য করে শপথ গ্রহণ করতেন, প্রজাদের উপর অত্যাচার করলে তিনি যে সারাজীবনে

অর্জিত সুকর্মের ফল, সন্তান-সন্ততি, ইহকাল পরকাল সব থেকে বঞ্চিত হন। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বার বার বলেছে—বিভিন্ন পথে প্রবাহিত নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র, তেমনি বিভিন্ন পথ অবলম্বী মানুষের গন্তব্যস্থান সেই ভগবান। গুরু শিষ্যকে বলেছেন, গুরু বা গুরুজনদের যা' সগুণ তাহা গ্রহণ কর, যা' দোষের তার অনুকরণ কর না। ভারতের উদারতার আরও উদাহরণ আছে, দাসী জবালার ছেলে সত্যকাম, যাঁর পিতাকে জানা ছিল না, তিনিও উত্তরকালে নিজের গুণের জন্য ঋষি বলে অভিহিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়েরা অর্জন করতেন। আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র যাঁরা অবতার বলে খ্যাত, তাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ যেতেন ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য।

পাঞ্চালদেশের রাজা প্রবাহন। তাঁর কাছে এলেন ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষার জন্যে। রাজা শুধালেন, জান কি দেহী কি করে দেহত্যাগ করে? জান কি বিদেহী আত্মা কেমন করে দেহ ধারণ করে? শ্বেতকেতু জানতেন না, তাঁর পিতা ব্রাহ্মণ হয়েও এ'তত্ত্ব জানতেন না। তখন পিতাপুত্রে এলেন রাজার কাছে জানবার জন্যে। বৈদিকযুগে জাতির অভিমান ছিল না।

মত ও পথের উদারতা হিন্দুধর্মকে সনাতন করে তুলেছে। একথা এত সহজে স্বামিজীর আগে কেউ আমাদের জানান নি। গভীর অধ্যয়ন ও অনুভূতির ফলস্বরূপ যে তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাই জগতবাসীকে বলে গেছেন। মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন বলেই উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন যে হিন্দু অন্য ধর্ম-অবলম্বীকে হিংসা করেনি। রোমের অত্যাচারে একদা খ্রীষ্টান উদ্বাস্তরা দক্ষিণ-ভারতের উপকূলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। জরথুস্ত্রপন্থী পারসীক জাতি বহুকাল হল, এদেশে বসবাস করছে। বটগাছের মত প্রাচীন হিন্দুধর্মের নানা মতের ঝুরি নেমে গেছে। ভারতের ভিত্তিতে সুদৃঢ় হয়ে বসেছে।

প্রতিভার বিকাশে, কর্মক্ষমতায় শঙ্করাচার্যের সঙ্গে স্বামিজীর তুলনা করা যেতে পারে। শঙ্কর মাত্র বত্রিশবছর বেঁচেছিলেন। তাঁর মধ্যে তাঁর শেখা ও শেখানো আজও অম্লান হয়ে আছে। স্বামিজী উনচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। স্কুল, কলেজ ও অনন্তের পথে প্রস্তুতির কাল বাদ দিলে তাঁর শেখা আর শেখানোর কাল পনের বছরের বেশি নয়। ওরই ভেতর রচনাকাল মাত্র নয় বছর।

শঙ্করাচার্য তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে এগারখানা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ও অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পায়ে হেঁটে কুমারিকা থেকে বদ্রীনাথ, দ্বারকা থেকে পুরী, এই দীর্ঘ পথ ঘুরেছিলেন। চারধাম, শৃঙ্গেরী

যোশী, সারদা ও গোবর্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত কর্মশক্তি ভাবলে বিস্ময় লাগে। স্বামিজীও তেমনি করেছিলেন, তাঁর প্রব্রজ্যার দৈর্ঘ্য কিছু কম নয়। অবশ্য একালে সব পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেন নি। তেমনি তাঁর পথের দৈর্ঘ অতিক্রম করে গেছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর প্রান্তে,—পূর্ব থেকে পশ্চিম দেশে। তাঁর পথ চলা আসমুদ্র হিমাচলেই আবদ্ধ থাকে নি।

তখনকার দিনে শঙ্করকে হয়তো হিন্দু বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর অন্য ধর্মের বা ম্লেচ্ছ ভাষার পাঠ নিতে হয়নি। সে যুগে তার দরকারও ছিল না। তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে স্বামিজী তাও শিক্ষা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা এত ভাল শিখেছিলেন যাতে উত্তরকালে তাঁর সমালোচকেরা তাঁর লেখা বলা ইংরাজি ভাষায় কোন খুঁত ধরতে পারেন নি। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা না-ই বা তুললাম। এর উপর তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। গাইতে পারতেন ভাল। তাঁর গানের লহরীতে শ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হতেন। অসাধারণ পরিশ্রম করবার ক্ষমতাকে লোকে প্রতিভা বলে। স্বামিজীর মত প্রতিভার এমন উজ্জ্বল মডেল আর কোথায় পাওয়া যাবে!

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মজগতে স্বামিজীর মৌলিক দান কি? স্বামিজী বিশ্বসভায় ভারতের ধর্ম-আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বলতে গেলে প্রথম ভাষণেই। আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণকেন্দ্র, স্বামিজীর পূর্বে জোর গলায় একথা তো কেউ বলেন নি। এইটাই ত তাঁর বড় দান। পাশ্চাত্ত্য জগতকে এবং তৎসহ আত্মবিস্মৃতি ভারতবাসীকে দেখিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের অখণ্ড সার্বভৌমত্ব। হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলির এমন সহজ সরল ভাষা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আজও করেন নি। বৈদিক যুগের উজ্জ্বল ধর্ম ও দর্শন কালপ্রবাহে তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল। আচার আচরণ ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে সব বাদ দিয়ে, সারবস্তু তিনি খুঁজে বের করে জগতের সামনে ধরে দিয়ে গেলেন। এমনিভাবে, এমন ভাষাতে ধরে দিয়ে গেলেন, যা' এড়ান কঠিন হল। ভারতের বৈশিষ্ট্য, গীতা উপনিষদে ছিল। বিস্মৃত হয়েছিল। তার নতুন করে খোঁজ পড়ল, তাঁর কথায়। বেদান্ত বলতে কি বোঝায়, বেদান্তের অন্তর্নিহিত সত্য বোঝালেন বিদেশীদের, বললেন অস্পৃশ্যদের বললেন আমাদের মত জনসাধারণদের।

অদ্বৈতবাদ উপনিষদসম্মত। আচার্য গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। গৌড়পাদ ছিলেন গোবিন্দচার্যের গুরু। গোবিন্দচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের গুরু। গৌড়পাদ যে বাদের সূচনা করেছিলেন, শঙ্কর সেই অদ্বৈতবাদ পূর্ণ

পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। শঙ্কর বলেছিলেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ; জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নেই ; ভেদ জ্ঞান হয়, অজ্ঞানতার জন্যে ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

রামানুজাচার্য বললেন, ব্রহ্ম এক ও পূর্ণ এবং জীব ব্রহ্মের অংশ মাত্র। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, অভেদ নয়। জীব ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, জগৎও ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ বা শরীর। রামানুজের মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

মধ্বাচার্য বললেন দ্বৈতবাদ। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। জীব ঈশ্বরের অংশ নয়, তাঁর দাস। জীবের কর্তব্য ঈশ্বরের সেবা করা, আর তাতেই তার মুক্তি।

শ্রীঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত তিন ভাবই মানতেন। প্রসঙ্গত তিনি মহাজ্ঞানী হনুমানের কথা বলতেন। শ্রীহনুমানের যখন দেহবুদ্ধি বলবৎ থাকত তখন শ্রীহনুমান অনুভব করতেন, তিনি দাস আর শ্রীরামচন্দ্র প্রভু (দ্বৈতভাব)। যখন তাঁর বোধ হত যে তিনি মন-বুদ্ধি-আত্মাযুক্ত জীবাত্মা, তখন তিনি দেখতেন শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ আর তিনি তাঁর অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতভাব)। আর যখন তিনি ভাবতেন তিনি নামরূপরহিত শুদ্ধ আত্মা, তখন দেখতেন তিনিও যা শ্রীরামচন্দ্রও তা, কোন ভেদ নেই (অদ্বৈতভাব)। শ্রীঠাকুর বলতেন, তিনটি ভাবই মনের উন্নতির অবস্থা অনুযায়ী উপনীত হয়। তবে অদ্বৈতভাবই ধর্মোন্নতির শীর্ষবিন্দু। তিনি নিজ জীবনে উপলব্ধি করে একথা বলে গেলেন। পূর্বসূরীগণ যেসব মতবাদ প্রচার করে গেলেন তা' যে কেবল মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, প্রত্যক্ষ, তা' বুঝিয়ে দিলেন।

স্বামিজী তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কেবল সহজ কথায় বুঝিয়ে ক্ষান্ত হন নি, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর দ্বৈতবাদের সমন্বয় করে গেছেন। শ্রীঠাকুর যেমন বলতেন, ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। নিরাকার হলেও আকার নেন—যেমন জল আর বরফ। স্বামিজীও বলতেন একের তিন অভিব্যক্তি—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত। দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা থেকে অদ্বৈতভাবে পৌছানো যায়। অবশ্য অদ্বৈতভাবই ধর্মপথের চরমলক্ষ্য—তত্ত্বমসি ; একমেবাদ্বিতীয়ম্। শ্রীঠাকুর ভাগবতপাঠ শুনতে শুনতে দেখেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি, আর তাঁর পাদপদ্ম থেকে বেরিয়ে আসছে জ্যোতি—যা' ভাগবত স্পর্শ করল, তারপর শ্রীঠাকুরকে স্পর্শ করল। তাঁর উপলব্ধি হল, বস্তু পৃথক হলেও অনন্তেরই প্রকাশসম্ভূত—তিনে এক, একে তিন।

স্বামিজীর ধর্মবাদের উৎকর্ষ তো এইখানে। শ্রীঠাকুর তাঁদের তাই দেখিয়েছিলেন। নিজে আচরণ করে শিখিয়েছিলেন যত মত তত পথ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ। অভ্যাসযোগে তা উপলব্ধি করা সম্ভব। জীবন চলাই ধর্ম। কর্ম যদি অনাসক্ত হয়, ভক্তি যদি বিশ্বাসভিত্তিক হয়, জ্ঞান যদি শুদ্ধ হয়, তা'হলে পথ যা-ই হোক, সিদ্ধিলাভ হবেই। জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা কর্মবিরতি নয়। সক্রিয়তাই ধর্ম। সক্রিয়তাতে প্রাণের পরিচয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সব কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের সংহত সুরটি শিষ্য অর্জুনকে জানিয়েছিলেন। সংসারের দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় সব কাজের মাঝে সেই সুরটি বাজিয়ে যেতে হবে,—নিষ্কামকর্মের সুর, ফলবাসনারহিতের সুর। স্বামিজী বলেছিলেন অভ্যাসযোগে সাধারণ মানুষ জীবনে এ' করতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে এটা অবশ্যই সম্ভব। স্বামিজীর, তাঁর গুরুভাইদের, তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যদের মধ্যে কর্মের প্রাবল্য ও অনাসক্তি, তার অপূর্ব সাফল্য দেখা গেছে। বিরাটের উপলব্ধি এসেছে। প্রাণ বড় হয়েছে। হৃদয় সরস হয়েছে। অনুভূত হয়েছে জীবই শিব। জীবের সেবা শিব বা ঈশ্বরের সেবা। জ্ঞানচক্ষু খুলেছে। স্পষ্ট দেখা গেছে শিল্প বিজ্ঞান ধর্ম সবই সত্যের অভিনব প্রকাশ। এটা বুঝতে গেলে মনে রাখতে হয়েছে, সবেতে একেরই বিকাশ, দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

এসব বলা সহজ, ভাবাও সহজ, তবে জীবনে প্রতিফলিত করা শক্ত। অভ্যাস-যোগে ও একজীবনে তা' না-ও হতে পারে। স্বামিজীর সে সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, শিখেছিলেন, বুঝেছিলেন শ্রীঠাকুরকে, যিনি দেখেছিলেন মহৎকে, যিনি নিত্য অনুভব করতেন উপনিষদের বাণী 'তত্ত্বমসি'।

প্রদীপ, তৈল, সলিতা, শলাকা সব থাকে। আঁধার এলে দীপ জ্বালা হয়। ধর্মের জগতে আঁধার নেমেছিল, সলিতা শলাকা তেল সংগ্রহ করে দীপ জ্বেলে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার আলো আজও ম্লান হয় নি, বরং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে!
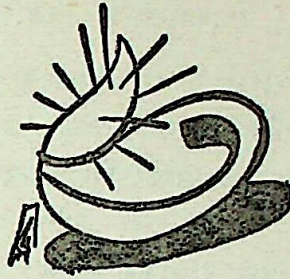
॥ সপ্তম অবদান ॥

॥ নারীজাতি ও বিবেকানন্দ ॥

'—মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন-কালে পারিবেও না'। নারীজাতি সম্পর্কে এই সশ্রদ্ধ ও সতেজ উক্তি যুগমানব বিবেকানন্দের!

ভাবপ্রবণতার 'মৌখিক পূজা' বা শুধু নারীকে 'দেবী দেবী' বলেই কর্তব্য সমাধা নয়, জাতীয় জীবনে নারীর যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাকেই তিনি পূজা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে দেশে মেয়েদের সম্পর্কে সম্যক মর্যাদাবোধ নেই, সে দেশ যথার্থ বড় বলে গণ্য হতে পারে না।

বিশ্বাস করতেন অথবা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই স্বামিজী অবিরত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশের মেয়েদের অবস্থার তুলনা করেছেন এবং দুই দেশেরই সমাজ-ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনা করে তাদের কোন্‌খানে ত্রুটি, কোন্‌খানে অন্যায়, তা' সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সব সমালোচনায় একদেশদর্শিতার প্রকাশ নেই। একই প্রবন্ধের মধ্যে দেখা যায় স্বামিজী বলছেন, 'এখানে বালবিধবার অশ্রুপাতে ধরিত্রী আর্দ্র হয়, পাশ্চাত্য দেশের বায়ু অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘশ্বাসে বিষাক্ত হয়। ··· পাশ্চাত্যের মেয়েরা কেমন স্বাধীন, সকল কার্য ইহারাই করে। স্কুল, কলেজগুলি মেয়েতে ভরা, আর আমাদের পোড়া দেশে? মেয়েদের পথে পর্যন্ত চলিবার জো নাই'। ··· আবার তার সঙ্গে এও বলেছেন, 'পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী-শক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে মাত্র স্ত্রী-শক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ভারতের একটি সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। প্রাচ্য পরিবারে মাতা কর্ত্রী, স্ত্রী অবহেলিতা, পাশ্চাত্য পরিবারে স্ত্রী কর্ত্রী, জননী উপেক্ষিতা'।

এই যে তুলনা, এর মধ্যেই রয়েছে মেয়েদের প্রতি তাঁর দরদের একান্ত আকুলতা। কোন ব্যবস্থাটিই তাঁর কাছে 'নির্ভুল' বলে মনঃপূত হয় নি। যেন দু'টি ভাবধারার সংস্কার-সাধন ও সামঞ্জস্য-বিধান করে, তিনি এক নতুন জীবনের দরজা খুলে দিতে চান।

কালক্রমে প্রাচ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানে অবরোধের দুঃখ, অধিকারহীনতার গ্লানি, সমাজব্যবস্থার শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে মেয়েরা, কিন্তু এও অস্বীকার করা যায় না, তার সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্যের ভাব-ধারার সংমিশ্রণ হচ্ছে না। একটা পরানুকরণের ছাঁচ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কে জানে এই ছাঁচটি এদেশের মেয়েদের যথার্থ কল্যাণসাধন করছে কিনা।

স্বামিজী এই ছাঁচটি চাননি। তিনি সামঞ্জস্যের মধ্যে কল্যাণ অন্বেষণ করেছিলেন।

কী এদেশ, কী ওদেশ, তাঁর কাছে তারতম্য নেই। তাঁর কাছে মেয়েরা মাত্রেই 'মা জগদম্বার জাত'। তাই পাশ্চাত্য মেয়ের কর্মক্ষমতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন, 'ইহারা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি আমাদের দেশে এক হাজার তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব'।

মহাপুরুষের সেই ইচ্ছার অঙ্কুর, সময়ের বাতাসে আর প্রয়োজনের জল-সিঞ্চনে লক্ষশাখা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। মাত্র 'একটি হাজার' নয়, আজ ভারতের হাজার হাজার মেয়ে শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মে উদ্দীপনায়, সর্বোপরি সাহসিকতায়, স্বামিজীর ভাষায় 'মা জগদম্বা'র রূপ লাভ করছেন, আর সন্দেহ নেই কোনও এক উর্ধ্বলোক থেকে তাঁদের মাথার উপর দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এ' যাত্রায় প্রথম যাত্রার সেই 'ইচ্ছার ইতিহাসটি যেন আমরা না ভুলি। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে সমগ্র নারীসমাজের যা' ঋণ তা' যেন স্বীকার করতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি তিনি মেয়েদের কী মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন।

আজকের যুগের উচ্চশিক্ষা মেয়েদের জাগতিক ও সামাজিক বহুবিধ উন্নতি এনে দিয়েছে। চিত্তের জড়তা ও চিন্তার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েরা আজ গৃহগণ্ডি অতিক্রম করে নিজেদেরকে বৃহৎ বিশ্বের পটভূমিকায় দেখতে শিখেছে। কিন্তু নবলব্ধ এই শিক্ষা আর শক্তি যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে মেয়েদেরই।

বিশ্বের কর্মযজ্ঞে নারীর ভূমিকা কিছু কম প্রধান হলেও, জীবনযজ্ঞে তার ভূমিকা পুরুষের চেয়ে বেশী বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় চরিত্রের

নিরিখ কসতে গেলে নারীকেই সে-চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলা সঙ্গত। যে দেশে নারীচরিত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়, সে দেশের ক্ষয় অনিবার্য।

হয়তো এই দুর্বলতা সহসা ধরা পড়ে না। পুরানো ব্যবস্থার নৈতিক মানকে 'কুসংস্কার' বলে বোধ হয়, অবনতির লক্ষণগুলিই আধুনিকতা বলে গণ্য হয়, আর সেই অসাবধানতার সুযোগেই জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরে। এ' যুগে অনেক তথাকথিত সভ্যদেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে এই ক্ষয়রোগের বীজ। ভেঙে যাচ্ছে গৃহ, ভেঙে যাচ্ছে পরিবার, ভেঙে যাচ্ছে প্রেমের বিশ্বস্ততা। মানুষ শান্তিহীনতার এক তীব্র যন্ত্রনার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে লোভের পথে, বাসনার পথে, অধিকতর ভোগের পথে, বৃথা শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ এই ভোগলিপ্সার উন্মত্ততা আর হতাশার যন্ত্রনা। তিক্ততা আর হতাশা, এ' যুগে টি. বি. ক্যানসারের মতই একটা মারাত্মক ব্যাধি। আজকের কাব্য, আজকের সাহিত্য, আজকের শিল্প, এই ব্যাধির যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করছে। আজকের অন্বেষায় সুন্দরের সাধনা হাস্যকর—অসুন্দরের মধ্যে, বিকৃতির মধ্যে, বীভৎসতার মধ্যে, এ' যুগের সত্য-অন্বেষণ।

ভারতবর্ষও কি এ' ব্যাধিকে আদর করে নিজের ঘরে ডেকে আনবে? তথাকথিত এই সভ্যতার পরিণাম দেখে সতর্ক হয়ে নিজের ভাঁড়ারের সম্বলটি কাজে লাগিয়ে বেঁচে ওঠবার চেষ্টা করবে না? অপরের গড়া সেই 'ছাঁচে'র হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেবে?

সত্য বটে আধুনিকতার অতিচাকচিক্য আর জড়বিজ্ঞানের সীমাহীন সাফল্য আজ মানুষমাত্রকেই বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার হতে না পারলে 'মানুষ'এর ধ্বংস অনিবার্য, মণীষারও পরিসমাপ্তি। এই উদ্ধার-চিন্তায় এগিয়ে আসতে হলে আসতে হবে আগে মেয়েদেরই।

বিদেশ থেকে আমদানী এক যান্ত্রিক সাম্যবাদের ধূয়োকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে না থেকে তাকিয়ে দেখতে হবে ভারতবর্ষের মাটিতেও সাম্যবাদের বনেদ আছে কিনা। দীর্ঘ অতীতের পরিপ্রেক্ষিতকে যদি নাও ধরা হয়, বর্তমানই কি নিষ্ফলা? মানুষে মানুষে বিভেদহীন এক অখণ্ড সাম্যের বাণী প্রচার করেননি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী? সুদীর্ঘ কালের ভুল শাস্ত্রব্যাখ্যা আর সমাজপতিদের স্বার্থান্ধ মূঢ়তায়, সমাজের স্তরে স্তরে যে গ্লানি জমে উঠেছিল, তাকে সবলে দূর করতে স্বামিজী এসেছেন এগিয়ে। উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন, 'হে ভারত ভুলিও না, ভারতবাসী তোমার ভাই। .... ভুলিও না মুচি মেথর চণ্ডাল শূদ্র......তোমার রক্ত'।

আজকের দিনে সেই শ্রেণী কৌলিন্যের দাঁত হয়তো আর তেমন নেই। কিন্তু সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে আর এক কৌলিন্য। জাতির মর্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনা না এলে, শুভবোধের সৃষ্টি না হলে, কেবলমাত্র যান্ত্রিক নিয়মের সাম্যবাদ কি সে সমস্যা দূর করে স্থায়ী কল্যাণ এনে দিতে পারবে ?

কিন্তু সেকথা যাক। আমার আলোচনা বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে।

অস্বীকার করা যায় না, অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের অসন্তোষ, মেয়েদের অসহিষ্ণুতা, মেয়েদের বিলাস-বাসনা, পুরুষকে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষার পথে ঠেলে নিয়ে যায়। শ্রেয়কে ত্যাগ করে প্রেয়কেই আঁকড়ে ধরে কেবলমাত্র জড়বস্তুর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে গেলে এমনই হয়। এক্ষেত্রে মেয়েদের কল্যাণ বুদ্ধি সজাগ হলে হয়তো দেশের লোভ আর দুর্নীতি কিছু কমতে পারে। কৃত্রিমতা আর পরাণুকরণ স্পৃহা কেবল লোভেরই প্রসার ঘটায়।

অবশ্য স্বামিজী কোনদিনই জাতিকে নিছক ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনের পথ দেখিয়ে দেন নি। তাঁর 'উন্নতি'র ধারণা ছিল সুস্থ। তাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ভোগে আনন্দে সৌন্দর্যে বীর্যে পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ এক জাতির। তাঁর মতে তুষ্টির মধ্যে পুষ্টি, শোভার মধ্যেই শুভ, শক্তির মধ্যেই সত্য। কিন্তু প্রতিমার মধ্যে কাঠামোর মত ভোগের মধ্যেও যেন একটি আদর্শ থাকে। একটি সংযমের রুচি থাকে। সেই আদর্শের জন্য, সেই রুচির জন্য ভারতকে কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। সে বস্তু ভারতের ভাঁড়ারে আছে।

একথা ঠিক, নতুন কাল আসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে—নতুন বিচার নিয়ে—নতুন মতবাদ নিয়ে, তবু মানবধর্মের এমন একটি মূলভিত্তি আছে, যেটা সর্বকালের—সর্বদেশের।

দয়া ক্ষমা ত্যাগ সহিষ্ণুতা উদারতা সহমর্মিতা সততা বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানবধর্মের বৃত্তিগুলি কোনও দেশে, কোনও কালে বা কোনও মতবাদেই অবহেলিত নয়। যে দেশের সমাজব্যবস্থা যেমনই হোক বা রীতি-নীতি আচার-আচরণ যেমনই অদ্ভুত হোক, সে' ব্যবস্থা মানবধর্মের এই মূলভিত্তিগুলির উপরেই গঠিত। বিকৃতি যদি দেখা দেয়, সেটা গঠনের দোষ নয়, পরবর্তীকালের মূর্খতার দোষ।

স্বামিজী সেই মূর্খতাকে দূর করতে হাত বাড়িয়েছিলেন। কল্পনা করেছিলেন সেই মানুষকে বিশেষ করে সেই মেয়েকে, যে মেয়ে মানবধর্মের এই মূল গুণগুলির সঙ্গে যুগোপযোগী শিক্ষা, শক্তি, সাহস এবং দৃঢ়তা নিয়ে বৃহৎ বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবে। তাই তাঁর ভিতরে দেখা গিয়েছিল জীবন-জিজ্ঞাসার অত তীব্রতা।

স্বামিজী কল্পনা করেছেন—পশ্চিমের বিজ্ঞান আর প্রাচ্যের ধ্যান, পশ্চিমের কর্মশক্তি আর প্রাচ্যের ধর্মবোধ, এই দুইয়ের একটি সুস্থ মিলন। যেন উভয় ধারার প্রেম-বিবাহ। সেই বিবাহ-জাত সন্তানই হবে ভাবী পৃথিবীর মানুষের মত 'মানুষ'। কিন্তু মানুষগড়ার প্রথম ভিত্তি তো মেয়েদের হাতেই। তাই তিনি যেমন প্রাচ্যের মেয়েকে পাশ্চাত্যের সদ্গুণগুলি গ্রহণ করতে বলেছেন, তেমনি পাশ্চাত্যের মেয়েকেও অনুধাবন করতে বলেছেন প্রাচ্যের ভাব, ধারণা ও আদর্শকে। এক কথায় এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সংসারী মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী করে ভেবেছেন মেয়েদের জন্যে। মেয়েদের সর্ববিধ উন্নতি ব্যতীত যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, সেকথা উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে।

মহামানবরা এইভাবেই দেখেন, চিন্তানায়করা এমনি দৃষ্টি দিয়েই চিন্তা করেন, কিন্তু, স্বামিজীর মত এমন মেয়েদের 'জ্যান্ত জগদম্বা' রূপে দেখতে ক'জন পেরেছেন; ক'জন তাঁর মত বলতে পেরেছেন, "নারীদিগের সম্পর্কে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত। ...নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে; তাহাদের হইয়া অপর কাহারও এ' কার্য করিতে যাওয়ার প্রয়োজনও নাই, উচিতও নয়। ... নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?"

মেয়েদের উপর এই আস্থা, এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা, আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? এদেশে নারীকে 'দেবী' বলে আসা হয়েছে, নারী 'মাতৃশক্তি' বলে স্বীকৃত হয়েছে, তথাপি তাদের জন্য বিধিনিষেধের আর অন্ত নেই। তাদের প্রতি 'নাবালক তুল্য' মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। 'স্ত্রী শিশু' সমগোত্র। তাদের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তো করুণা কর।

"তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?" এমন উদার বাণী দুর্লভ। নারীর মোহিনীশক্তির পূজক যে দেশগুলি 'শিভ্যাল্‌রি'-র মাধ্যমে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের চিন্তার মধ্যেও এই আস্থা ও বিশ্বাস সচরাচর দেখা যায় না। অনেকের চিন্তায় নারীকে 'ভোগ্য' ভাবা নিন্দনীয়, কিন্তু 'পোষ্য' ভাবা নিন্দনীয় নয়। স্বামীজির মতে সেটাও নিন্দনীয়। সেটাও কিছু মেয়েদের মর্যাদা-বৃদ্ধিকর নয়। ওটাও একপ্রকার অপমান।

আজকের মেয়েরা যে ক্রমশঃ আত্ম-মোহিনীমায়া-মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে পুরুষের আদরণীয় পোষ্য হিসেবে দেখতে লজ্জা বোধ করছে, 'কটাক্ষ'-এর চেয়ে

'কর্মদক্ষতা'-কেই জয়ের অস্ত্র বলে গণ্য করছে, পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়া হওয়ার থেকে 'শ্রদ্ধেয়া' হওয়াকে অনেক বেশী মূল্য দিতে শিখছে, তার মূলে স্বামিজীর বাণী, চিন্তা ও চেষ্টার অবদান বড় কম নয়।

হয়তো নারীসমাজের সর্বস্তরে এই ভাবের সঞ্চার হতে এখনো অনেক দেরী আছে, 'আধুনিকতা'র ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত অনেক মেয়েই এখনো পুরুষের সঙ্গে সমান বিদ্যা অর্জন করে কর্মক্ষেত্রে নেমেও কর্মদক্ষতার থেকে কটাক্ষতেই অধিক বিশ্বাসী, কাজ করে ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করার চাইতে সাজ করে মনোরঞ্জন করার দিকেই ঝোঁক প্রবল, তবু মনে হয় হয়তো ভারতের মাটিতে এ' ভাব চিরস্থায়ী হতে পারবে না। কোন্‌টি মহৎ, কোন্‌টি শ্রেয়, কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি শোভন, সেটি চিনে নেবার 'বোধ' ভারতের আছে। তাই আশা করা যায় শক্তিরূপা নারীর অভ্যুত্থান ভারতে সুদূর নয়। স্বামিজী যে শক্তিরূপার ভাব সাধক, পরিকল্পনাকার, সেই ভাবটি কোথায় ছিল ? কোথায় ছিল তার ভাষা ?

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এক পাগলা ঠাকুরের সহধর্মিণী অবগুণ্ঠনের আড়ালে নিজেকে আবৃত করে আপন মহিমাকে রেখেছেন আড়াল করে, দামাল ছেলে খুলে ধরলেন মায়ের সেই অবগুণ্ঠন, সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন জ্যান্ত জগদম্বা দেখবিতো আয়, বললেন, 'এই ভাব এই ভাষ্য। মন্ত্র দিলেন এক মহিমময়ী, বিদেশিনী ভগিনীকে, দেশ কে বললেন, দ্যাখ, ভাব আর কর্মের মিলন। দ্যাখ, শেখ, হ। শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের নারী জাতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী, 'দ্যাখ, শেখ, হ'।

অনন্তকাল ধরে জগতে কোটি কোটি মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে, তার মধ্যে ক'জনের ভিতর থাকে, 'স্মরণীয়' হয়ে থাকবার মত উপাদান ?

বেশী থাকে না। কোটিতে এক। শত সহস্র কোটিতে এক।

কিন্তু স্মরণীয়কে স্মরণ করবার শুভবোধটুকু মানুষের মজ্জাগত। তাই কোনও স্মরণীয় চরিত্রকেই সে সহজে হারায় না। আকাশের নক্ষত্রগুলির মতই তার স্মরণাকাশে জ্বল জ্বল করে স্মরণাতীতকালের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি। কত সহস্র বৎসরের ঝড়ঝাপটা সয়েও সেগুলি অক্ষয় হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সুরু হয়েছে। হাজার হাজার বছরের উজান ঠেলে সে-উৎসব পৌছবে দূরকালের পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কাল যেন বলতে না পারে 'তাঁর কাল শুধু তাঁর ঋণ স্বীকারই করেছিল, ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেনি।...তাঁর বলিষ্ঠ মহৎ বাণীগুলি ফ্রেমে বাঁধিয়ে শুধু ঘরের দেয়ালেই টাঙিয়ে রেখেছিল, মনের দেয়ালে খোদাই করে নিতে পারেনি'।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী
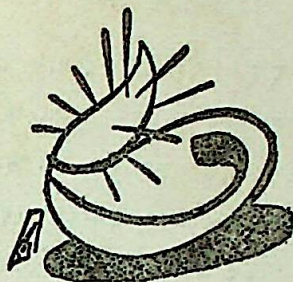
॥ অষ্টম অবদান ॥

॥ বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা ॥

স্বামী বিবেকানন্দের সকল রচনার মূল সুর এক: ধর্মকেন্দ্রিক জীবন। ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার আদর্শই তাঁর সকল আলোচনায় অনুস্যূত। ধর্মের অনুশীলন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে প্রাণহীন প্রথানুবর্তন প্রচলিত, স্বামিজী তাকে বার বার আঘাত করেছেন। কেমন করে জীবনকে ধর্মানুকূল করা যায়, ধর্মবোধের নেতৃত্বে জীবনের সকল আশা আকাঙ্খা, কর্মশক্তি ও রুচিকে বিন্যস্ত করা যায়, সে বিষয়েই স্বামিজী তাঁর চিন্তাকে পরিচালিত করেছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় একই পরিচয় লাভ করা যায়।

শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত এই যে, শিক্ষা কেবল তথ্য পরিবেশনের উপায়মাত্র নয়, ইহা জীবন-নিয়ন্ত্রী শক্তির উদ্বোধন। কতকগুলি মূল নীতি শিক্ষা দ্বারা মানুষের অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত করতে হবে ও তাদের সার্থক প্রয়োগে যাতে জীবন পরিচালিত হয়, সেদিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। তাই স্বামিজী অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন: 'মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশসাধনই শিক্ষা'।

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা ব্যাপক পটভূমিতে স্থাপিত। মানব-জীবনের সকল স্তর ও অবস্থার কথা শিক্ষাপ্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে গত শতাব্দের শেষভাগে শিক্ষাবিস্তারের যে ব্যাপক আয়োজন তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রাচ্য শাস্ত্র ও জীবনের পটভূমিতে যাচাই করে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালী মনীষীর লেখায় শিক্ষার এই সামগ্রিক দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় না।

মানুষ-গঠনের উপযোগী শিক্ষা, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষক ও ছাত্র, চরিত্র-গঠনের শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা প্রভৃতি ভাগে স্বামী বিবেকানন্দের

শিক্ষাচিন্তাকে বিন্যস্ত করা যায়। স্বামিজীর রচনাবলীতে এই সব বক্তব্য ছড়িয়ে আছে। তাঁর বক্তব্য অবলম্বন করে এই চিন্তাকে সংহত স্পষ্ট রূপ দেওয়া সম্ভব।

স্বামিজী বলেছেন: "ইউরোপের বহু নগর পরিভ্রমণকালে উক্ত দেশের গরীব লোকদের জন্যও শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা দেখিয়া স্বদেশে দরিদ্রগণের দুরবস্থার কথা আমার মনে পড়িত এবং আমি অশ্রুবিসর্জন করিতাম। কিসে এই পার্থক্য হইল? উত্তর পাইলাম, শিক্ষাই উক্ত পার্থক্যের মূলে। সুশিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাসের দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে সুপ্ত ব্রহ্ম জাগ্রত হয়"।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা বিচার্য। জীবনগ্রন্থ পাঠ করেই তিনি শিক্ষা বিষয়ে মূল ধারণায় উপনীত হয়েছেন। পুঁথিপড়া বিদ্যা নয়। জীবনগ্রন্থজাত জ্ঞানই বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠাভূমি।

আমাদের দেশে ইশ্‌কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, স্বামিজী তাকে অভিহিত করেছেন 'নেতিমূলক শিক্ষা' বলে। এই 'নেতিমূলক শিক্ষা' মানুষের সর্বনাশ করে, তা' মানুষ-গঠনের উপযোগী নয়,—একথাই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন।

এই 'নেতিমূলক শিক্ষা' কী? স্বামিজী ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "আমরা শিক্ষা পাইয়াছি যে, আমরা কিছু নহি। কদাচিৎ আমরা শুনি যে, আমাদের দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। ইতিমূলক ও উৎসাহপ্রদ কোনো শিক্ষাই আমরা পাই নাই। আমাদের হাত-পা কিরূপে চালাইতে হইবে তাহাও আমাদের শিখানো হয় না। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এইরূপ শিক্ষা একটিও মৌলিক চিন্তাশীল বা প্রতিভাবান মানুষ তৈরী করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের মৌলিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিংবা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিমতে উহাদের বুদ্ধি মার্জিত। আধুনিক শিক্ষা মাথায় এমন কতকগুলি তথ্য ভরিয়া দেয়, যেগুলি মাথায় সর্বদা গোলমাল সৃষ্টি করে, জীবনে আদৌ কার্যকরী হয় না। এমন কতকগুলি ভাব আয়ত্ত করিতে হইবে যাহার দ্বারা মানুষ তৈয়ারী হয় ও চরিত্র গঠিত হয়। যদি তুমি পাঁচটি ভাবকেও হজম করিয়া জীবনে ও চরিত্রে রূপায়িত করিয়া থাক তাহা হইলে যিনি একটি সমগ্র গ্রন্থাগার কণ্ঠস্থ করিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী। শিক্ষা বলিতে যদি সংবাদ সংগ্রহ বুঝাইত তাহা হইলে গ্রন্থাগারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ মুনি এবং অভিধান-সমূহ প্রধান ঋষি বলিয়া গণ্য হইত"।

আমাদের শিক্ষাবস্থার মূলগত দুর্বলতা স্বামিজীর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এবং পল্লবগ্রাহিতাকে তিনি নিন্দা করেছেন। সংবাদ-সংগ্রহ শিক্ষা নয়, একথা

আজকের দিনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা প্রয়োজন। তিনি আমাদের ভর্ৎসনা করে বলেছেন :

"একটি বিদেশী ভাষায় অপরের চিন্তারাশি মুখস্থ করিয়া তদ্বারা তোমার মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উপাধি গ্রহণ করিয়া তুমি ভাবিতেছ, তুমি শিক্ষিত। তোমার শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় একটা কেরাণীগিরি, না হয় একটা ওকালতী, আর খুব বেশী হইলে একটা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (যাহা আর এক প্রকার কেরাণীগিরি)। ইহা কি সত্য নহে? ইহাতে তোমার নিজের বা তোমার দেশের কি কল্যাণ হইবে! চক্ষু মেলিয়া দেখ, অন্নপূর্ণ এই ভারতভূমিতে আজ অন্নাভাবে কি মর্মভেদী চীৎকার উঠিয়াছে। তোমার শিক্ষা কি দেশের এই অভাব দূরীকরণে সমর্থ? যে শিক্ষা জনসাধারণকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে সাহায্য করে না, যাহা আমাদের সৎসাহস বৃদ্ধি করে না, যাহা পরোপকারের ইচ্ছা জাগ্রত করে না এবং মানুষকে সিংহতুল্য সাহসী করে না, তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য?"

তা'হলে ইতিমূলক শিক্ষা কি? শিক্ষার কোন্ আদর্শকে আমরা গ্রহণ করব? স্বামিজী স্পষ্টভাষায় বলেছেন : "আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে।······মানুষ গঠন করাই সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্বভাবানুযায়ী মানুষকে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। যাহার দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বিকশিত, বর্ধিত ও সৎভাবে চালিত হয় তাহাই শিক্ষা। আমাদের দেশের এখন আবশ্যক লোহার মত শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের মত বলশালী স্নায়ু এবং দুর্দমনীয় বিপুল ইচ্ছাশক্তি''।

শিক্ষা যদি শ্রদ্ধাবর্জিত হয় তবে বিদ্যাচর্চা ব্যর্থ হয়ে যায়। একথা স্বামিজী জোর দিয়ে বলেছেন। আস্তিক্যবোধবর্জিত নেতিবাচক শিক্ষার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেন: "ভারতে যে কোনো প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মপ্রচার আবশ্যক। ······ প্রথমতঃ আমাদিগকে এই কার্যে মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ··সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে। যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনিই আসিবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক

জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। প্রথমে আত্মবিদ্যা প্রচার করিতে হইবে"। (—'শিক্ষাপ্রসঙ্গ', পৃ ১৫৫)

ধর্মবর্জিত আস্তিক্যবুদ্ধিহীন শিক্ষার কারখানায় মানুষ তৈরী হয় না, এই সাবধান বাণী সত্তর বছর পূর্বেই স্বামিজী উচ্চারণ করেছেন। অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ এই বাণীতে বিধৃত হয়েছে। একালের শিক্ষানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে স্বামিজীর সতর্কবাণীর প্রয়োজন গভীরভাবে দেখা দিয়েছে। প্রচলিত শিক্ষার বিষময় ফল আমাদের হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। আজ স্বামিজীর দ্বিধাহীন সত্য সমালোচনা বার বার স্মরণ করা প্রয়োজন ঃ

"বর্তমান শিক্ষায় আবার কতকগুলি দোষও আছে। আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ ইহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ এই শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তি ভাবাপন্ন। এইরূপ শিক্ষায় সব কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল— তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আর্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইলে সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না' এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়"।

"মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া সারা জীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। ছেলেবেলা থেকে আমরা নেতিমূলক শিক্ষা পেয়ে এসেছি। আমরা কিছু নই—এ' শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখনো জন্মেছে, তা' আমরা জানতেই পাই না। Positive কিছু শেখান হয় নি। হতে পারে ব্যবহারও জানি না"।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে (শ্রদ্ধা-বিশ্বাসবর্জিত) প্রায় সবই দোষ। কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বইতো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসবর্জিত হচ্ছে; গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে, বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা-কিছু আছে, তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক, তিন পুরুষের নামও জানে না। তাই তো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধাও নেই, আত্মপ্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম"।

(—'শিক্ষাপ্রসঙ্গ', পৃ ৬২-৬৩)

শ্রদ্ধা চাই, বিশ্বাস চাই, আত্মপ্রত্যয় চাই, ধর্মবোধ চাই, অন্যথায় আমাদের সকল শিক্ষায়োজন ব্যর্থ; স্বামী বিবেকানন্দের এই গভীর বাণী আজ আমাদের পথ-নির্দেশক।

শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। শিক্ষার অর্থ আবিষ্কার, স্বাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়। এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত তাঁর বক্তব্য তাঁর মতে যথার্থ সুশিক্ষা স্ব-শিক্ষা। তিনি বলেছেন:

"কেহ অপরের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নিহিত হয় না। আমাদের প্রত্যেককেই নিজেই শিক্ষা দিতে হইবে। বাহিরের শিক্ষক পরামর্শ দেন মাত্র। তাহা ভিতরের শিক্ষককে জাগ্রত করিয়া জ্ঞানবিকাশে প্রবৃত্ত করে।......একটি চারা-গাছকে যেমন জোর করিয়া বাড়ানো যায় না, শিশুকেও তেমনি চেষ্টা করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না। চারাগাছটি স্বীয় স্বভাব অনুসারে বর্ধিত হয়। শিশুও নিজেই শিক্ষালাভ করে। কিন্তু তুমি শিশুকে তাহার শিক্ষালাভের পথে সাহায্য করিতে পার। তুমি কেবল বাধাগুলি অপসারণ করিতে পার। তখন স্বভাবতই জ্ঞানের বিকাশ হয়। মাটিটা একটুকু আল্‌গা করিয়া দাও, তাহা হইলে অঙ্কুরের উদ্গম সহজ হইবে। উহার চারিদিকে বেড়া দাও; দেখ, যেন কেহ ইহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। উহাতে মাটি জল বায়ু প্রভৃতি যাহা আবশ্যক দাও। তোমার কাজ সেখানেই শেষ। যাহা কিছু অঙ্কুর চায় সেই সমস্ত ইহা স্বীয় স্বভাবের দ্বারাই সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত উপাদান পরিপাক করিয়া ইহা স্বীয় স্বভাববশেই বর্ধিত হইবে। শিশুর শিক্ষাও এই প্রকারে হয়। শিশু স্বয়ং শিক্ষিত হয়। যে শিক্ষক মনে করেন যে, তিনিই শিক্ষা দেন, সেই শিক্ষক ছাত্রের মহা অনিষ্ট করেন। মানুষের অন্তঃস্বরূপটি জ্ঞানময়। ইহার উদ্বোধন আবশ্যক। উহাই শিক্ষকের কার্য"।

শিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেছেন: "সংবাদ-সংগ্রহ শিক্ষা নয়। আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার সার কথা; তথ্য-সংগ্রহ নহে। যদি আমাকে পুনরায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় আমি আদৌ তথ্যসমূহ পাঠ করিব না। আমি তখন মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি করিয়া উক্ত নিখুঁত যন্ত্র সাহায্যে ইচ্ছামত তথ্যরাজি সংগ্রহ করিব"।

স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রের কর্তব্য নির্দেশ করে ক্ষান্ত হন নি, সেই সঙ্গে শিক্ষকের কর্তব্যও নির্দেশ করেছেন। শিক্ষক-চরিত্রের অপাপবিদ্ধতা, চিত্তশুদ্ধি, নির্লোভতা, শাস্ত্রের যথার্থ মর্মার্থজ্ঞান, প্রেমপরতা অত্যাবশ্যক বলে তিনি মনে করেন।

আদর্শ শিক্ষকের এই সকল গুণ থাকা প্রয়োজন বলে স্বামিজী মনে করেন। তিনি শিক্ষকসমাজের সামনে এই মহান্ আদর্শ তুলে ধরেছেন:

"ছাত্রের প্রবৃত্তিকে সদভিমুখী করিবার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। গভীর স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে আমরা কখনও উত্তম শিক্ষা দিতে পারি না।......যিনি মুহূর্তে ছাত্রের সঙ্গে অভিন্নাত্মা হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি একেবারে ছাত্রের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং নিজের আত্মাকে ছাত্রের আত্মায় একীভূত করিয়া তাহারই মন দিয়া সব কিছু দেখেন ও বুঝিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষাদানে সমর্থ, অন্যে নহে"।

ছাত্রের পক্ষে অবশ্য পালনীয় ধর্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বলেছেন: ছাত্রের পক্ষে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণা, অধ্যবসায়, নম্রতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস একান্ত আবশ্যক। ছাত্র-শিক্ষকসম্পর্ক-ক্ষেত্রে আজ আমাদের দেশে যে দুঃখকর অবনতি লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে স্মরণীয় এই বিবেক-বাণী:

"পিতৃপুরুষ এবং তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ, শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধও সেইরূপ। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অন্তরে যদি বিশ্বাস, বিনয় ও নম্রতা ও শ্রদ্ধা না থাকে তাহা হইলে ছাত্রের কোন চিত্তোন্নতি হইতে পারে না। যে সকল দেশ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ রাখিতে অবহেলা করিয়াছে, সেই সকল দেশে শিক্ষক কেবল বক্তা এবং ছাত্র শ্রোতামাত্র"।

আমাদের দেশ বর্তমানে এই শ্রেণীভুক্ত নয় কি? মনুষ্যত্ব-সাধনা ও ধর্ম-সাধনার মধ্যে স্বামিজী কোনো পার্থক্য দেখেন নি। কিন্তু তাঁর ধর্ম-সাধনা পুঁথিতে আবদ্ধ নয়, জীবনের খোলা মাঠে তা' ছড়ানো। তাই তিনি বজ্রনির্ঘোষে ভারতের তরুণকে সম্বোধন করে বলেছেন:

"হে আমার তরুণ বন্ধুগণ! বীর্যবান্ হও। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার প্রথম বাণী। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে। তোমাদের পেশীগুলি কিঞ্চিৎ সবল হইলে তৎসাহায্যে তোমরা গীতার মর্ম অধিক বুঝিতে পারিবে। তোমাদের রক্ত একটু সতেজ হইলে তোমরা কৃষ্ণের অপূর্ব প্রতিভা ও অদম্য শক্তির সুন্দর পরিচয় পাইবে। যখন নিজেকে মানুষ বলিয়া মনে হইবে ও দুই পায়ে ভর দিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে তখনই উপনিষদের অর্থ ও আত্মার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে বুঝিবে। বীর্য, বীর্যই উপনিষদের বাণী।......কিন্তু কোনো শাস্ত্রই আমাদিগকে ধার্মিক করিতে পারে না।......মতবাদ প্রচারে, বিচার-বিতর্কে বা তত্ত্ব বিশ্লেষণে ধর্ম নাই। আসল ধর্ম আত্মবোধে, আত্মোৎকর্ষসাধনে ও আত্মাভিব্যক্তিতে"।

নারীশিক্ষা ও নারীর প্রতি উপযুক্ত মর্যাদাদানে স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। নারীশিক্ষাই নারীজাতির উন্নতির সোপান বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

এ-বিষয়ে তিনি রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি। "এদেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এত ভেদ কেন করা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না"। এই কথা বলে স্বামিজী নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। বেদান্ত পড়ে নয়, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে নারীপ্রগতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'পত্রাবলী'তে তিনি বারবার মার্কিন ও ইংরেজ রমণীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতের নারী-সমাজের উন্নতি ঘটলে তাদের সৎকর্মপ্রভাবে তাদের সন্তানসন্ততি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় নারী-সমাজকে যোগ্য শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়েছিলেন।

নারীশিক্ষা দেওয়া হবে কোন্ পথে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বলেছেন: "ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ অন্য সকল শিক্ষাই গৌণ। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও ব্রহ্মচর্যব্রত-পালন প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে"। সুশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণী দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। "নারীদিগের মধ্যে একজনও যদি ব্রহ্মজ্ঞা হন তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরিত প্রভাব সহস্র সহস্র নারী অনুপ্রাণিত ও সত্যব্রতে দীক্ষিত হইবে এবং ইহাতে দেশ ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে"। এই কথা বলেই স্বামিজী ক্ষান্ত হন নি, তিনি বলেছেন:

"মনু বলেন, যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,—নারী যেখানে পূজিতা, দেবতাগণ সেখানে আনন্দলাভ করেন এবং যেখানে নারী পূজা পায় না সেখানে সব কাজ সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়। যে পরিবারে বা যে দেশে নারীরা দুঃখে জীবন যাপন করে সে পরিবারের বা দেশের উন্নতির কোনো আশা নাই"।

মানবের সর্বাধিক উন্নতিতে বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারী-সমাজেরও মুক্তি চেয়েছিলেন ও নারীশিক্ষার প্রসার কামনা করেছিলেন, এই সত্য আজ বারবার স্মরণযোগ্য।

য়ুরোপ আমেরিকা ভ্রমণকালে ঐসব দেশের গরীবদের জন্য শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা দেখে স্বদেশের দরিদ্রগণের দুরবস্থা ভেবে স্বামী বিবেকানন্দ অশ্রুবিসর্জন করতেন। আমাদের দেশের গরীবদের হীনতা ও দুরবস্থার মূল শিক্ষার অভাব, এ' কথাই সেদিন তিনি চিন্তা করেছিলেন। দেশে ফিরে সুশিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা দারিদ্র্যপিষ্ট, পুরোহিততন্ত্র শাসিত দরিদ্র ভারত-

বাসীর উন্নতির জন্য স্বামিজী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জনশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"জনসাধারণকে উপেক্ষা করা আমাদের একটা জাতীয় কলঙ্ক এবং ইহাই আমাদের অধোগতির কারণ। ভারতের জনসাধারণ যতদিন না আবার সুশিক্ষা, যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও সহানুভূতি লাভ করিতেছে ততদিন কোনো রাজনীতিই কিছু করিতে পারিবে না।......আমাদের যদি পুনরায় উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারাই করিতে হইবে।......যতদিন পর্যন্ত কোটি কোটি মানব অনাহারে ও অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করিবে ততদিন দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত লোককে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব"।

জনশিক্ষার পথে প্রধান বাধা ভারতবাসীর অসহনীয় দারিদ্র্য। "দারিদ্র্যই ভারতের সর্ববিধ দুর্গতির মূল নিদান। ভারতের দারিদ্র্য এত অধিক যে দরিদ্র বালকগণ বিদ্যালয়ে আসার পরিবর্তে বরং মাঠে যাইয়া পিতাকে সাহায্য করিবে, নয়ত অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জন করিবে।......দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষার জন্য না আসে শিক্ষককে তাহাদের কাছে যাইতে হইবে"।

এই অসহনীয় দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে আমাদের সকল শুভ ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে যাবে, এই বাস্তবচেতনা ও গভীর মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের পথনির্দেশ করেছেন। পবিত্র আবেগ ও মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে গভীর বাণী আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন, তা' মানবপ্রেমী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল :

"দারিদ্র্যপুষ্ট, পুরোহিততন্ত্রের শাসনে পীড়িত কোটি কোটি পতিত ভারতবাসীর জন্য এস আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি। ধনী ও উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা আমি তাহাদিগের মধ্যেই প্রচার করিতে অধিক যত্নবান্। আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, দার্শনিক নহি, এমন কি সন্ন্যাসীও নহি। কিন্তু আমি দরিদ্র। আমি দরিদ্রকে ভালবাসি। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় চিরনিমজ্জিত ত্রিংশ কোটী নরনারীর জন্য কে কষ্টানুভব করে? তাহাকেই আমি মহাত্মা বলি যিনি দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী। কে তাহাদের কথা ভাবে? তাহারা শিক্ষার আলোক পায় না। কে তাহাদের নিকট আলোক আনিবে? কে দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাহাদের শিক্ষা দিবে? এই সকল দরিদ্র জনসাধারণই তোমার দেবতা হউক। তাহাদের জন্য চিন্তা করো, তাহাদের জন্য কাজ করো, অনবরত তাহাদের জন্য প্রার্থনা করো"।

উল্লেখ ব্যতীত সকল উদ্ধৃতি শ্রী, টি, এস, অবিনাশীলিঙ্গম্ সঙ্কলিত 'Vivekananda on Education'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'শিক্ষা' থেকে গৃহীত।
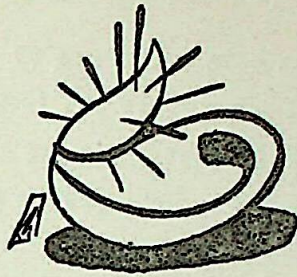
॥ নবম অবদান ॥

॥ নারীশিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একদিকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধর্মগুরু, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক ও জনত্রাতা। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, দর্শন ও ধর্ম কেবল তাত্ত্বিক বিদ্যাই মাত্র। কিন্তু স্বামিজী সজোরে বারংবার বলেছেন যে, দর্শন ও ধর্মের তুল্যমূল্য ব্যবহারিক দিকও আছে।

"আমি একজন প্রতীকই মাত্র। আমি একজন ত্যাগী সন্ন্যাসীই মাত্র। আমি কেবল একটি জিনিসই মাত্র কামনা করি। আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখের জল মোছাতে বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না"।

কি অপূর্ব সুন্দর কথা এটী!

এরূপে, তত্ত্বের দিক্ থেকে যা বিশ্বাত্মবাদ, ব্যবহারের দিক্ থেকে তাই বিশ্বসেবাবাদ। সেজন্য অদ্বৈত বেদান্তবাদী স্বামিজীর সুধন্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল জনসেবা। বিশেষ করে, সমাজের অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, উৎপীড়িত জনগণের জন্য ছিল তাঁর সহানুভূতি প্রচুর, এবং সেজন্য উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষাহীনা, অত্যাচারিতা, সামাজিক অধিকারবিহীনা নারীদের প্রতিই তাঁর সহৃদয় দৃষ্টি সর্বপ্রথম পতিত হয়। তিনি নারীসমাজের উন্নতির জন্য যে প্রাণপাত প্রচেষ্টা করেন, তা' ভারতবর্ষের নারী-প্রগতির ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে, নিঃসন্দেহ। তিনি বারংবার বলতেন: "নারী জাতির উন্নতি ও জনগণের জাগরণ—এই দু'টিরই প্রয়োজন সর্বপ্রথম এবং তখনই কেবল দেশের, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে"।

ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ: *"The Master as I saw Him"*-এ আবেগভরে বলেছেন: "অন্ততঃ আমার গুরুদেব মনে করতেন যে, তিনি যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শাশ্বত মহাব্রত হল 'নারী

ও জনগণের' জন্য প্রাণপাত করা। তিনি যখন খেতড়ির রাজাকে সংবাদ প্রেরণ করছিলেন, তখন এই কথাই তাঁর মুখে স্বতঃই এসে গিয়েছিল। বিদেশে যখনই তিনি অনুভব করতেন যে, মৃত্যু তাঁর নিকটবর্তী, তখনই তিনি শিষ্যদের বলতেন: "কোনো দিনও ভুলনা—'নারী ও জনগণ'—এইত হল মূলমন্ত্র"।

(পৃঃ ৩৫৬, তৃতীয় সং)

নারী-প্রগতির উপায় উদ্ভাবন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বৈদিক যুগের উচ্চ আসন থেকে তাঁহাদের পতনের কারণ নির্ণয়। নিশ্চয়ই নানাবিধ কারণ আছে—যথা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তারই ফলস্বরূপ ভীত চকিত সমাজপতিগণ-কর্তৃক অন্যায় বিধি-বিধান-প্রবর্তন। কিন্তু মূলগত কারণ কি? মূলগত কারণ হল উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। যে কোনো কারণেই হোক্ না কেন, লুপ্তবুদ্ধি সমাজপতিগণ যে মুহূর্তে নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ করেছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা নারী-প্রগতি, তথা, দেশ-প্রগতির পথেও নিক্ষেপ করেছেন জগদ্দল প্রস্তর। সেজন্য নারী-প্রগতির একমাত্র পন্থাই হল নারীশিক্ষা-বিস্তার। স্থির বিশ্বাস-ভরে স্বামিজী বলেছেন: "তাঁদের অসংখ্য ও গুরুতর সমস্যা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এরূপ কোনো সমস্যা তাঁদের নিশ্চয়ই নেই, যার সমাধান এই শিক্ষার যাদু স্পর্শে না হয়"। বারংবার, তিনি সজোরে বলেছেন: "স্থির জেনো যে, নারীদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি কোনক্রমেই হবেনা, যদি না সর্বপ্রথম তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়"।

অবশ্য নারী-প্রগতির জন্য শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা সকল দেশের সকল সমাজসেবকই বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামিজীর বৈশিষ্ট্য হল এক অভিনব প্রণালীর শিক্ষার বিধি দেওয়া। কারণ, সাধারণতঃ সমাজ-সংস্কারের দিক্ থেকে যে শিক্ষার কথা বলা হয়, তা ব্যবহারিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা নয়। কারণ, সাধারণ সমাজসেবকগণ মানুষের দেহমনের কথাই কেবল চিন্তা করেন, আত্মার কথা একেবারেই নয়। কিন্তু স্বামিজীর সমাজতন্ত্রবাদের মূলীভূত, অপরূপ বৈশিষ্ট্য হল এর আধ্যাত্মিক ভিত্তি অথবা দেহমনের উপরেও আত্মাকে কেন্দ্রীভূত স্থানে স্থাপন। এই কারণে, স্বামিজীর মতে শিক্ষার মূল কথা হল—শক্তি, দৈহিক শক্তিই কেবল নয়, অর্থনৈতিক প্রাধান্যই কেবল নয়, রাজনৈতিক প্রভুত্বই কেবল নয়, কিন্তু আত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক বিকাশ, "শ্রীভগবানের চরণারবিন্দস্পর্শজনিত মহাবল"।

এই আধ্যাত্মিক দিক থেকে, নরনারীতে কোনোরূপ ভেদের প্রশ্নই উঠতে পারে না। বারংবার, সজোরে স্বামিজী বলেছেন:

"মনে রাখবে, স্ত্রী পুরুষ দুই চাই। আত্মায় স্ত্রী পুরুষে ভেদ নেই"।

সেজন্য এই দিক্ থেকে স্বামিজী স্বপ্ন দেখেছিলেন সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী-পরিচালিত স্ত্রী-মঠের। পুরুষদের জন্য মঠে যেমন থাকবেন কেন্দ্রস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নারীগণের জন্য মঠে ঠিক তেমনি থাকবেন প্রাণপ্রতিম হয়ে' মহাজননী শ্রীসারদামণি দেবী। তাঁরই পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিতা, পরার্থে জীবনোৎসর্গকারিণী ব্রহ্মচারিণীগণ সমবেত হবেন বেলুড় মঠের বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরে এই পবিত্র মঠে। পুরাকালে নারী-ঋষিদের মতই তাঁরা উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনে হবেন অগ্রণী, এবং সেই জ্ঞান অকাতরে বিতরণ করবেন সাধারণ নারীদের মধ্যে। এই স্ত্রী-মঠের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও থাকবে। তাতে, শাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছু ইংরাজী পড়ানো হবে। তা'ছাড়া, সেলাই, রন্ধন, সাংসারিক কাজকর্মও শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সঙ্গে জপ, উপাসনা, ধ্যান প্রভৃতিও শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপেই গৃহীত হবে। ছাত্রীরা মঠেই বসবাস করবেন এবং মঠ থেকেই তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাদি করা হবে। যাঁরা এভাবে থাকতে পারবেন না, তাঁরা স্বগৃহ থেকে এসেও শিক্ষালাভ করে যেতে পারেন এবং মধ্যে মধ্যে মঠাধ্যক্ষার অনুমতি সাপেক্ষে মঠে কিছুদিন থেকেও যেতে পারেন। বয়স্কা ব্রহ্মচারিণীগণ ছাত্রীদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেবেন। মঠে এইভাবে পাঁচ ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পরে, ছাত্রীগণের অভিভাবকেরা তাদের বিবাহও দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যদি তারা যোগ ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সমর্থা বলে বিবেচিত হয়, তা'হলে অভিভাবকগণের অনুমতিসাপেক্ষে, তারা ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বন করে মঠে স্থায়ীভাবে থেকেও যেতে পারে। এই সকল ব্রহ্মচারিণীগণই ভবিষ্যতে মঠের শিক্ষয়িত্রী ও ধর্মপ্রচারিকা হবেন। সহর ও গ্রামে, তাঁরা নারীশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে নারীশিক্ষাপ্রচারে ব্রতিনী হবেন। এরূপ আদর্শচরিত্রা, পবিত্রস্বভাবা, পুণ্য-শ্লোকা সন্ন্যাসিনীগণের মাধ্যমেই দেশে প্রকৃতরূপে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হবে। স্ত্রী-মঠেরও মূলভিত্তি হবে ব্রহ্মচর্য। মঠের ছাত্রীগণের মূলমন্ত্র হবে আধ্যাত্মিকতা, আত্মোৎসর্গ, আত্মসংযম; এবং সেবাধর্মই হবে তাদের প্রধান ব্রত। তখন তাদের প্রতি আর অবিশ্বাস কার হবে? যদি দেশের নারীদের জীবন এইভাবে গঠিত হয়, তা'হলেই ত সীতা, সাবিত্রী, গার্গী প্রভৃতির মত আদর্শচরিত্রা নারীগণের পুনরাবির্ভাব হতে পারে।

নারীদের অবশ্য পঠনীয় বিষয়গুলির মধ্যে স্বামিজী উল্লেখ করেছেন, "ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন, সেলাই, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি"।

চির আশাবাদী স্বামিজী পরম-আশাভরে বলছেন: "ত্যাগ ব্যতীত পৃথিবীর

কোন মহৎ কর্মই সাধিত হয়নি। বটবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র চারাটিকে দেখে, কেই-বা কল্পনা করতে পারে যে, কালপ্রবাহে তাই পরিণত হবে একটি অতি বিশাল বটবৃক্ষে ? বর্তমানে আমি এইভাবেই মঠটি স্থাপিত করব। পরে, দু'এক পুরুষ পরে, দেশের লোক এই মঠকে সমাদর করবেন নিশ্চয়ই। আমার নারী-শিষ্যেরা এর জন্য জীবনোৎসর্গ করবেন। ভয় ও কাপুরুষতা বিসর্জন দিয়ে তোমরাও এই পবিত্র কার্যে যোগদান কর এবং সকলের সম্মুখে এই আদর্শ তুলে ধর। তোমরা দেখবে যে, সময়ে এই স্ত্রী-মঠ সমগ্র দেশের উপরই আলোক-সম্পাত করবে"।

অতি দুঃখের বিষয় যে, স্বামিজীর জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রী-মঠ-স্থাপনের এই মহান্ স্বপ্ন সফল হয়নি। তা'হলেও এই ইচ্ছা যে তাঁর কত বলবতী ছিল, তা' বোঝা যাবে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকে : "সুতরাং, আমাদের শ্রীমায়ের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতেই হবে। প্রথমে, মা এবং মায়ের মেয়েরা; পরে, বাবা ও বাবার ছেলেরা। তোমরা কি এটি বুঝতে পারবে ? আমার কাছে, মায়ের কৃপা, বাবার কৃপার চেয়ে শতসহস্রগুণ অধিকতর মূল্যবান। মায়ের প্রসাদ, মায়ের আশীর্বাদই আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাকে ক্ষমা করো যদি আমি এ' বিষয়ে, মায়ের বিষয়ে কিছুটা অন্ধ হই"।

এরূপে, সমগ্র নারীজাতির প্রতিই ছিল তাঁর শ্রদ্ধা অসীম; এবং প্রত্যেককেই তিনি দর্শন করতেন জগন্মাতার মূর্ত প্রতীকরূপেই। সেজন্যই তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন : "অতএব, পরিবারের এই সকল দেবীর উপাসনার জন্য, তাঁদের অন্তঃস্থ ব্রহ্মকে প্রকাশিত করবার জন্য আমি একটি স্ত্রী-মঠ স্থাপন করে যাব"।

বর্তমান অত্যাধুনিকতার যুগে, অবিশ্বাসের যুগে, আত্মম্ভরিতার যুগে, স্বামিজীর এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের নারীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করুক; এবং আমরাও যেন স্বামিজীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে, স্থির বিশ্বাসভরে বলতে পারি : "ধর্ম, এবং একমাত্র ধর্মই ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ; এবং যদি তা' চলে যায়, তা'হলে ভারতও প্রাণত্যাগ করবে—অর্থনীতি, সমাজসংস্কার, কুবেরের ঐশ্বর্য, কিছুই আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না"।

পরিশেষে, নারীদের উদ্দেশ্যে স্বামিজীর সেই অমৃতময়ী বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সমাপ্ত করছি : "আমি পুরুষদের যা বলে থাকি, নারীদেরও ঠিক সেই কথাই বল্‌ব : "ভারত ও ভারতীয় ধর্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন কর; তেজস্বিনী হও; আশায় বুক বাঁধ। ভারতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে, লজ্জিত না হয়ে গৌরব অনুভব কর। আর, স্মরণে রেখো, আমাদের অন্যান্য জাতির নিকট থেকে কিছু নেবার আছে নিশ্চয়। কিন্তু জগতের সকলের অপেক্ষা আমাদের দেবারও আছে অনেক বেশী"।

॥ দশম অবদান ॥
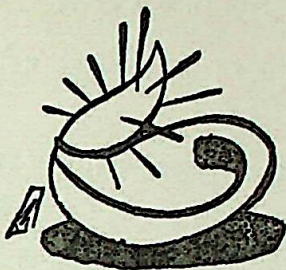
॥ শিক্ষাবিষয়ে স্বামিজীর চিন্তা ॥

শিক্ষার কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি দেশে দেশে শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে, যুগে যুগে উহা আবার পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হইয়াছে। শিক্ষা লইয়া যাহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা সেগুলির সহিত মোটামুটি পরিচিত। এখানে আমরা বিশেষভাবে দেখিব, শিক্ষাসম্বন্ধে স্বামিজী কি চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, কি পন্থা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্বে দেখা যাক্, শিক্ষাসম্বন্ধে কিছু বলিবার তাঁহার কি বিশেষ অধিকার।

অধিকারের প্রশ্ন তুলিলে এক্ষেত্রে বলিতে হয়, প্রথমতঃ জন্মগত অধিকার, দ্বিতীয়তঃ অর্জিত অধিকার; তৃতীয়তঃ বিধিপ্রদত্ত অধিকার! শিবাংশে যাঁহার জন্ম, তিনি তো বর্তমান যুগের গুরু হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গুরুকে বর্তমান যুগে লৌকিক জ্ঞানের কথাও বলিতে হইয়াছে, কারণ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন, ধর্ম ও বিজ্ঞান —সর্ব বিষয়ক গ্রন্থ-অধ্যয়ন করিয়া, সর্ববিধ চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া স্বামিজী বুঝিয়াছিলেন এ' যুগের শিক্ষাধারা কোন্ প্রণালীতে প্রবাহিত হইলে সর্বাধিক লোককল্যাণ! সর্বোপরি খোলা চোখ ও খোলা মন লইয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি সাক্ষাৎভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার বলে তিনি যখন যাহা বলিতেন, তাহাতে কেহ তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারিত না।

সর্বশেষ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কি বলেন নাই 'নরেন শিক্ষে দেবে'? শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কিছু লেখেন নাই, বাল্যে একখানা পুঁথি নকল করিয়াছিলেন—জানা যায়, আর রাণী রাসমণির মন্দিরের হিসাবের খাতায় তাঁহার নাম সই পাওয়া যায় মাত্র, আর কখনও কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে কাশীপুরে একদিন একটি কাগজ চাহিয়া লিখিয়াছিলেন 'নরেন শিক্ষে দেবে'—

অর্থাৎ নরেন্দ্র লোকগুরু, যুগগুরু। এ' কথার কী গভীর তাৎপর্য, তাহা বিশ্ববাসী ক্রমশঃ বুঝিতেছে।

অবশ্য গুরু বলিতে আমরা সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতাকেই বুঝি, কারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সর্বজ্ঞানের উৎস। তাই স্বামিজীর শিক্ষার সংজ্ঞায় আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জ্ঞান টানাপোড়েনের মতো মিশিয়া গিয়া জীবনের তন্তু বয়ন করিয়াছে।

আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মকে তিনি বলিয়াছেন অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, আর শিক্ষাকে বলিয়াছেন 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ'। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামিজীর শিক্ষাচিন্তা বিচার করিতে হইবে! শিক্ষার ডাল-পালা শাখা-প্রশাখা লইয়া তিনি খুঁটি-নাটি বিচার করেন নাই, তিনি মূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছেন। আধুনিক বহুমুখী শিক্ষার বিভিন্ন ধারা (streams) লইয়া তিনি কোন কথা অবশ্য বলেন নাই; তবে তিনি শিক্ষার উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছেন মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিয়া, নরের মধ্যে নারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করিয়া। তাঁহার প্রবর্তিত শিক্ষার উদ্দেশ্য 'মানুষ' গড়া। এই মানুষ গড়ার মধ্যেই মানুষের জীবনের আদি অন্ত,—সর্বস্তরে বিকাশের সম্ভাবনা।

স্বামিজীর শিক্ষাপদ্ধতিতে সকলই ইতিবাচক বা গঠনমূলক। নেতিবাচক বা ধ্বংসমূলক কোন নীতি তিনি দুর্নীতির সমপর্যায়ে দেখিতেন! ছোট শিশুদের শিক্ষা দিতে হইবে মদালসার মতো, দোলনায় দোল দিতে দিতে তাহাকে শুনাইতে হইবে 'শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি! —তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, তুমি নিরঞ্জন! 'তুমি দু'দিনের জন্য মায়ার জগতে আসিয়াছ, মানুষের মতো জীবনযাপন করিয়া মায়া-জাল ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাও!' মাতৃকণ্ঠের এই মহামন্ত্রই শিশুকে উদ্বুদ্ধ করিবে—ইহাই স্বামিজীর শিশুশিক্ষার আদর্শ।

পরবর্তী অধ্যায়ে স্বামিজী গুরুগৃহে বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। গুরু একজন আদর্শ মানব। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জ্বলন্ত জীবনের স্পর্শে আর একটি নূতন জীবনের দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিবে। ত্যাগতপস্যাপূত পবিত্র জীবনই কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের জীবন ঠিক ঠিক গড়িয়া দিতে পারে, সংসার হইতে অল্প দূরে—অথচ বাস্তব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নয়—শান্ত পরিবেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে স্ফুটনোন্মুখ জীবন যত সহজে ফুটিয়া উঠে, অন্যভাবে ততটা সম্ভব নয়। এই সুন্দর সুগঠিত জীবন লইয়া যখন মানুষ সংসারে ও সমাজে প্রবেশ করিবে, সে সমাজ আপনি রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। কারণ ব্যক্তির সমষ্টিই তো সমাজ।

শিক্ষা যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, তাহার কয়েকটি লক্ষণ স্বামিজী নির্দেশ করিয়াছেন। শিক্ষা মানুষের জীবন-সংগ্রামে শক্তি সরবরাহ করে, শিক্ষা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ করে। এই দিক দিয়া দেখিলে শুধু পুঁথি-পড়া বিদ্যাকে, বা সন-তারিখ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-পাস-করা বুদ্ধিকে স্বামিজী সার্থক শিক্ষা বলেন নাই। শিক্ষার অর্থ শুধু তথ্য-সংগ্রহ করা নয়, তাহা হইলে তো গ্রন্থাগারগুলিই সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত। সাধারণ শিক্ষাও 'শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের' পথেই অগ্রসর হইলে সার্থক হইবে। শ্রুত বিষয় মননের দ্বারা মানুষের সত্তায় মিশিয়া যায়, ধ্যানের আলোকেই তাহা সত্যের দীপ্তি পায়।

যথার্থ শিক্ষিত স্বাবলম্বী হইয়া জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। নিজের বিফলতার জন্য অপরকে দোষ দিবে না, বরং নূতন উদ্যমে পুরুষকার সহায়ে শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া অশুভকর্মজনিত বাধা অতিক্রম করিবে—ইহাই স্বামিজীর শিক্ষা। এই শিক্ষা মানুষকে প্রথমে আত্মবিশ্বাসী হইতে বলে, পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বলে। শিক্ষার এই মৌলিক আদর্শই সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্বামিজীর শিক্ষাদর্শ কঠিন হইতে পারে, কিন্তু কখনই অবাস্তব নয়। এই আদর্শ রূপায়ণের জন্য আজীবন আপ্রাণ চেষ্টার প্রয়োজন, সহজে লাভ করা বস্তু সহজেই বিনষ্ট হয়, সযত্নে লভ্য আদর্শই মূল্যবান্। স্বামিজীর এই শিক্ষাদর্শ জীবনকে সার্থক করিবে, জীবনের পরিপূরক মরণকেও অমৃত করিবে।
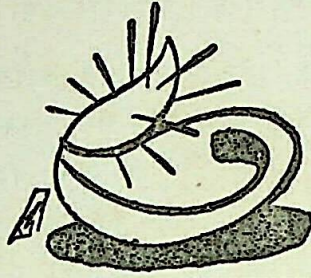
॥ একাদশ অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দের অনুধ্যান ॥

আমরা যদি কোন জাতি বা দেশের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করি তবে দেখিব যে, তাহা সংঘটিত হয় সর্বত্র একটি মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া। এই সূত্র প্রধানতঃ তিন স্তরে বিভক্ত—thesis, antithesis and synthesis; আমাদের নিজেদের ভাষাতে বলিতে পারি—ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং সমন্বয়। প্রথমে একটি জাতি বা দেশ কোন এক আদর্শ বা মতবাদকে আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকে, কালক্রমে সেই জাতির বা দেশের মধ্যে ঐ আদর্শ বা মতবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি নবীন দল গঠিত হইয়া প্রাচীন পন্থিগণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহার ফলে সংঘটিত হয় দুই মতবাদ বা আদর্শের সংঘর্ষ এবং সৃষ্টি হয় অশান্তির। কোন দেশ বা সমাজ এই অশান্তিকে বেশী দিন চলিতে দিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে এই সংঘর্ষের ফলে উত্থিত হয় সেই দেশে বা সমাজে এই দুই আদর্শ বা মতবাদের সমন্বয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়ে এই বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাহার পূর্ব হইতেই আমাদের এই ভারতবর্ষে বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে চলিতেছিল এই আদর্শ বা প্রত্যগাদর্শের thesis ও antithesis-এর সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে মুসলমানগণের ভারত-বিজয়ের সময় হইতে। ইসলামী আদর্শ ও কৃষ্টির সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুসমাজের এক অংশ সনাতন হিন্দু আদর্শ ও সমাজ-বন্ধন হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে উপ্ত হইতে থাকে ভাবী সংঘর্ষের বীজ। তখনও হিন্দুসমাজে সমাজপতিগণের রৌদ্র প্রতাপের অবসান হয় নাই। তাঁহারা প্রাচীন পুঁথিপাতি হইতে বচন উদ্ধার করিয়া বিপথগামী হিন্দুসম্প্রদায়কে সংহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফলও হইয়াছিল কিছুটা। কিছুটা বলিবার কারণ এই যে, সেই সময়ের সমাজপতিগণের শাসনকে সমাজের বর্ণহিন্দুগণ যতটা ভয় ও মান্য করিয়া

চলিত ততটা ভয় ও মান্য নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ করিত না। ইহার ফলে সেই যুগে বাংলা দেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের এক বৃহদংশ মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পর আরম্ভ হয় ইংরাজ রাজত্ব। হিন্দুধর্মের উপর প্রত্যক্ষতঃ কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া বরং সহানুভূতিপ্রকাশ ও সাহায্যদান করিয়া বিদেশী ইংরাজ ভারত-শাসনে প্রবৃত্ত হয়। এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রায় সমকালে নিজেদের স্বার্থে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট শিক্ষাপ্রচারে সচেষ্ট হন। শিক্ষার মাধ্যমে এই দেশে ধীরে ধীরে প্রচার হইতে লাগিল ইংরাজ-সমাজের রীতি-নীতি ও তাহাদের কৃষ্টি। এই নবীন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল বাংলার নবীন শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজের এক বৃহদংশ। ইংরাজ ব্যবসায়িগণের আগমনের পূর্ব হইতে যীশুখ্রীষ্টের উদার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া খৃষ্টান মিশনারীগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে এই দেশে আসিয়াছিলেন। মুসলমানগণের মত ধর্মের উপর প্রত্যক্ষ অসির আঘাত না হানিয়া এই ধর্মযাজকগণ নিজ ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে হিন্দুমনকে বিপথগামী করিতে নানাভাবে এই সময়ে সহায়তা করেন। হিন্দুসমাজপতিগণ হৃতবল ও উপেক্ষণীয় বস্তু হইয়া এই সময়ে সমাজে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের শাসনব্যবস্থাকে মান্য করিয়া চলিবার মত মনোবৃত্তি পাশ্চাত্ত্য-ভাবে ভাবিত নবীন হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিল না। ইহার ফলে গড়িয়া উঠিল বাংলা-দেশে এক নূতন সম্প্রদায়—যাহারা আহারে বিহারে রীতিতে নীতিতে এবং ধর্ম-বিশ্বাসে হইয়া পড়িল খৃষ্টীয় বা পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন। যে সংঘর্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল হিন্দু সমাজশরীরে মুসলমান রাজত্বের উষাকালে, তাহাই এখন ফলোন্মুখী হইয়া উঠিল সনাতন হিন্দু-আদর্শচ্যুত ও পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন যুব বাংলার মাধ্যমে।

সনাতন ও নবীন পন্থিগণের মধ্যে যখন এই আদর্শ ও মতবাদের সংঘর্ষ উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে চলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সমন্বয়ের শান্তিবাণী গ্রহণ করিবার জন্য দেশের এক অংশ যখন প্রস্তুতির পথে আসিয়াছে তখন যুগপ্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করিলেন মহাসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান উত্তর সাধক স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার বিবদমান দুই পন্থীর যেন মুখপাত্র বা প্রতিনিধিরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব হইয়াছিল সনাতনপন্থী ও অল্পশিক্ষিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে বাংলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয় শিক্ষিত, ধনী, পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নবীনপন্থী কায়স্থ বংশে এই কলিকাতা শহরে।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। নবীন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত

ছিলেন সুশিক্ষিত ও আইন-ব্যবসায়ী। আচারে ও ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন উদারপন্থী ; সনাতন হিন্দুধর্মের কোন বাধা-নিষেধ বা অনুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিবার মত তাঁহার প্রকৃতি ছিল না। উত্তরাধিকারীসূত্রে নরেন্দ্রনাথ পিতার এই প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেও তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও মননশীল মন লইয়া। সর্বপ্রকার বাঁধাধরা-সংস্কারমুক্ত হইলেও এই মনের প্রকৃতি ছিল সত্যসন্ধানী। সত্যকে জানিবার আগ্রহ ছিল তাঁহার বাল্যকাল হইতেই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিচারশীল মন ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। এই অনুসন্ধিৎসার আবেগের ফলে নরেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্ম-সমাজের বরেণ্য আচার্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সমাজভুক্ত হন। তখন তিনি কলেজের ছাত্র ; ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছেন। ইউরোপীয় দার্শনিক হিউম্-এর সংশয়বাদ (scepticism) ও হার্বার্ট স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়বাদের (Doctrine of the Unknowable) সঙ্গে তিনি তখন সুপরিচিত এবং ইহার ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হইয়া পড়িয়াছেন সংশয়বাদী। নরেন্দ্রনাথের এই সময়কার মানসিক অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৯০৭ সালের প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম হইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি মানসিক খাদ্যরূপে প্রচুর নীতি-বিচার, তত্ত্বকথা এবং নিরাকার সগুণ ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ যথেষ্ট পাইয়াছিলেন এবং তাহা তখন তাঁহার কাছে কোনই আকর্ষণের বস্তু ছিল না। তিনি সেই সময়ে সর্বান্তকরণে চাহিতেছিলেন এমন একজন জীবন্ত ও দরদী মানুষ যিনি তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহকে দূর করিয়া চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ মনে শান্তি দান করিতে পারেন। সর্বমন ও প্রাণ দিয়া তিনি চাহিতেছিলেন একটি শান্তির আশ্রয়কে—একজন গুরুকে।

ইহার পরেই নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে—হেমন্তের শেষভাগে শ্রীসুরেন্দ্রনাথের বাটীতে। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণের ফলে নরেন্দ্রনাথের আরম্ভ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন। কয়েকবার যাতায়াতের পরই শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রিয়দর্শন যুবক হইতেছেন সেই সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের দিব্যজ্যোতির্ঘনতনু সাতজন সমাধিস্থ ঋষির একজন—যাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সস্নেহে আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে শুভাগমনের পূর্বমুহূর্তে। তিনি বুঝিয়াছিলেন অখণ্ড জ্যোতির্লোকের মুক্ত পুরুষসিংহ তাঁহার

যুগধর্মপ্রচারে সাহায্য করিতে আসিয়া মায়ার বন্ধনে ছট্‌ফট্ করিতেছেন। মায়াকে আশ্রয় করিয়াই শিব হয় জীব। যে জীবকে ঈশ্বরী মায়া নিঃশেষে গ্রাস করিতে সক্ষম হয় সে জীব নিজের শিবত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া মায়ায় কল্পিত এই আপাততঃ রম্য জগৎপ্রপঞ্চের আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অখণ্ডলোকের বাসিন্দা পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এত বৃহৎ যে মহামায়া তাঁহাকে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার ফলে যে ভূমানন্দে সমাধিস্থ ছিলেন তিনি শিবলোকে, তাঁহার স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে এই রমণীয় পৃথিবীকে কোন সময়ে আপনার করিয়া লইতে দেয় নাই। এইজন্য জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে চলিতেছিল সত্যলাভের অত্যুগ্র বাসনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা অশান্তির তুফান।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের আগমনে যেরূপ স্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইয়া সেইরূপ বোধ করেন নাই। নিরাকার সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ পার্থিব প্রতিমাতে ঈশ্বরের রূপ কল্পনাকে বাতুলতা অথবা আদিম যুগের অপরিণত মনের খেয়ালমাত্র মনে করেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন —How I used to hate Kali and all her ways. That was the ground of my six years fight'। যাঁহার চরণতীর্থে আসিয়া মনের সকল সন্দেহের অবসান হইবে ভাবিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথ, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি দেখিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ঈশ্বরের মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী। শুধু বিশ্বাসী কেন—তিনি পাষাণী মা ভবতারিণীকে জাগ্রত দেখেন, তাঁহার সঙ্গে গর্ভধারিণী মাতার ন্যায় আলাপ আলোচনা করেন, প্রয়োজনবোধে উপদেশ গ্রহণ করেন, আবার কখনও বা অবোধ শিশুর মত তর্ক করেন—এক কথায় তাঁহার সঙ্গে ঘরকন্না করেন।

প্রতিভাধর আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমে অর্ধোন্মাদ মনে করিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখিবার এবং যতদূর সম্ভব তাঁহাকে বর্জন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না—শ্রীরামকৃষ্ণের স্বার্থলেশশূন্য সর্বগ্রাসী ভালবাসা ও জগন্মাতা ভবতারিণীর উপর তাঁহার বালকসুলভ প্রাণঢালা বিশ্বাস ও ভক্তি সত্যসন্ধানী নরেন্দ্রনাথের মনকে অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এবং ইহার ফলে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল।

জন্মাবধি নরেন্দ্রনাথের ছিল অত্যুগ্র স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা, সত্যে অচলা নিষ্ঠা এবং নিজের সুচিন্তিত মতবাদে গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য প্রতিপদে

---

(১) The Master as I saw Him—Sister Nivedita

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে এবং বুঝিয়া নিঃশেষে তাঁহার চরণসরোজে আত্মনিবেদন করিতে। দাহিকাশক্তি-লোপে অগ্নির যেমন স্বরূপচ্যুতি ঘটে, সেইরূপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য চলিয়া গেলে নরেন্দ্রনাথের স্বরূপচ্যুতি ঘটিবে—এই সত্য জানিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেইজন্য নিজ সিদ্ধান্তে বা মতবাদে বিশ্বাসস্থাপন করিবার জন্য তিনি নরেন্দ্রনাথকে কোন দিনই আবেদন-নিবেদন বা পীড়াপীড়ি করেন নাই। অহৈতুকী ভালবাসা বা প্রেমের আকর্ষণেই তিনি নরেন্দ্রনাথকে ধীরে ধীরে নিজ মতবাদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "উকিল হলে তোর হাতে জল খেতে পারব না'—ভালবাসার এই দাবীতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বিরত করিয়াছিলেন ওকালতির পাঠ থেকে। পাষাণী ভবতারিণীকে চিন্ময়ী জগন্মাতা জ্ঞান করিতে নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে গঠিত মন কুণ্ঠাবোধ করিত। তাঁহার এই কুণ্ঠাও দূর করিয়াছিলেন যথাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এক অভিনব উপায়ে। পিতার মৃত্যুর পর দারিদ্র্যদহনে দগ্ধ নরেন্দ্রনাথের মন পাষাণী ভবতারিণীর চরণে প্রার্থনা জানাইতে সেইদিন কোন সংকোচই প্রকাশ করে নাই। অভাবের পেষণে নরেন্দ্রনাথের মন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী দেখিবার জন্য প্রস্তুত। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে অভাবমোচনের প্রার্থনা নিবেদন করিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথ ভবতারিণীর চিন্ময়ী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রেমের আকর্ষণ ছিল বলিয়াই নিশাযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের ম্লান মুখ দর্শন করিয়া সেইদিন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গাজিপুরের প্রসিদ্ধ পওহারী বাবার নিকট দীক্ষা লইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহনীড়ে বাস করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নানাভাবে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় তাঁহার সসীমের মধ্যে অসীমের এবং অসীমের মধ্যে সসীমের—হিন্দু-সাধনার যে উভয় কোটীক অনুভূতি তাহার—প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, নরেন্দ্রনাথের মত শুদ্ধসত্ত্বপ্রকৃতির সাধক নির্বিকল্প সমাধির সন্ধান পাইলে যুগধর্মপ্রচাররূপ মহাব্রত ব্যাহত হইবে। সেই-জন্য সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তত্ত্বে স্বাতন্ত্র্যবিলোপের পূর্বেই তাঁহাকে ব্যুত্থিত করিয়া জগদ্ধিতায় কর্মে আত্মনিয়োগের প্রেরণা দিয়াছিলেন।

অদ্বৈততত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতির পিপাসা নির্বিকল্প সমাধির পর তৎকালে শান্ত হইলেও উহা নরেন্দ্রনাথের হৃদয় হইতে এককালে চলিয়া যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঘরের দ্বার স্বহস্তে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন একদিন, সেই দ্বার নিজ পৌরুষে খুলিবার উগ্র বাসনা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলা

সংবরণের পর। দীর্ঘ প্রব্রজ্যাকাল কাটিয়াছিল তাঁহার কঠোর তপস্যায় ও বিভিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়নে। এই সময় তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে কোনদিন দেশীয় রাজা-মহারাজাগণের প্রাসাদে বিভিন্নপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আবার কোনদিন অতিবাহিত হইয়াছে দীন-হীনের সঙ্গে তাহাদের পর্ণশালায় অথবা পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলায়—হয়তো তখন তাঁহার এক মুষ্টি অন্নও সংগ্রহ হয় নাই। এই দেশের বিভিন্ন স্তরের নর-নারীর সংস্পর্শে আসিবার এবং তাহার ফলে তাহাদের সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ ও নানা সমস্যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে এই পরিব্রাজকের জীবনে।

জ্ঞানের পরিপক্বতা আনয়ন করে সেই জ্ঞানের তুলনামূলক বিচারে। পরিব্রাজক জীবনে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন তিনি এই ভারতে, তাহার তুলনামূলক বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তিনি আমেরিকা গমনের পর। তৎপূর্বে নানা সমস্যায় জর্জরিত এই দেশের দুঃখকষ্ট তাঁহার বিশাল হৃদয় অহরহ মথিত করিলেও তাহা দূরীকরণের কোন উপায় অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মপ্রচারের কোন পরিকল্পনা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত অন্তঃকরণে তখনও দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে নাই—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। যদি কোন পরিকল্পনা তাঁহার মনের কোণে উদয় হইত, তবে তাহার আভাস বা ইঙ্গিত আমরা পাইতাম তাঁহার এই সময়কার বিভিন্ন স্থানের আলোচনায় ও চিঠিপত্রের মধ্যে। এই চিঠিপত্রের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই যে, নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে অনুভব করিতেছেন যে তাহার মধ্যে এক বিরাট শক্তির জাগরণ চলিতেছে এবং শীঘ্রই তাহার বহিঃপ্রকাশ হইবে।

নরেন্দ্রনাথের বিরাট শক্তির বহিঃপ্রকাশ হইয়াছিল যথাকালে ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে —সে ক্ষেত্র হইতেছে পাশ্চাত্যভূমি—মার্কিন দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া ধর্মমহাসভাতে যোগদান করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে। বাংলার অখ্যাত নরেন্দ্রনাথকে জগদ্বরেণ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দরূপে এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল এই সভার প্রথম দিনের বক্তৃতা। সেইদিন স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছিল মার্কিনবাসী ভারতের সনাতন ধর্মের বাণী। তাঁহার বাণীতেই নানা সমস্যাপীড়িত মানবজাতি সন্ধান পাইল যেন হারাইয়া ফেলা শান্তিরাজ্যের। স্বাধীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত পাশ্চাত্ত্য-বাসীর অতুল ধনসম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবার তাঁহাদের বহুমুখী প্রয়াস দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বিস্ময়বোধ করিলেন। যাহার যে বিষয়ে ধ্যান তাহার

সেই বিষয়ে সিদ্ধি। পাশ্চাত্ত্যবাসী অন্তর্জগৎকে ভুলিয়া বহির্জগতের ধ্যান করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন ইহাতে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল স্তরের সামগ্রী এখন তাঁহাদের করায়ত্ত হইলেও "সমুদয় পাশ্চাত্ত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে; কালই ইহা ফাটিয়া উহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। উহারা জগতের সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও শান্তি পায় নাই। উহারা সুখের পেয়ালা প্রাণভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই"।[২] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনালোকে সনাতন ধর্মের প্রচার হইলে পাশ্চাত্ত্য জগৎ শান্তিধামের সন্ধান পাইবে এবং এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐশী প্রেরণায় তাঁহার মার্কিন দেশে আগমন—এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দ মনে-প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার নিজের দেশ ভারতবর্ষ! সে দেশ পরপদানত ও হৃতসর্বস্ব। অজ্ঞানের গাঢ় তমিস্রা ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া এককালে পশুর স্তরে আনয়ন করিয়াছে তাহাদিগকে। অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ না হইলেও প্রধান কারণ। ভারতকে বাঁচিতে হইলে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া এই প্রাণনাশা অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রথম মানুষ করিয়া গঠন করিতে হইবে। ইহার জন্য একমাত্র প্রয়োজন পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একদল চরিত্রবান শিক্ষিত যুবক। এই নবীন যুবকসম্প্রদায়কে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে তাঁহার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণকে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখিয়াছেন সঙ্ঘশক্তির মহিমা। সঙ্ঘবদ্ধ খ্রীষ্টান মিশনারীগণের কার্যপ্রণালী অনুধাবন করিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণ—সংখ্যায় নগণ্য হইলেও—সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাঁহাদের দ্বারা ভারতকে উপলক্ষ্য করিয়া এই পৃথিবীর বহু কল্যাণকর মহৎকার্য সম্পন্ন হইবে। এই উদ্দেশ্যে মার্কিনদেশে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া সংঘবদ্ধ হইবার জন্য পুনঃপুনঃ নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে।

দীর্ঘ তিন বৎসরের উর্ধ্বকাল পাশ্চাত্ত্যদেশে সনাতনধর্মের শান্তির বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ফিরিয়া আসিলেন নিজের দেশে। তাঁহার স্বদেশবাসী অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে হৃদয়ে আসন দিলেন।

---

(২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—পৃ ২৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করিবার যে বৃহৎ ও সর্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা প্রবাসে থাকাকালে স্বামী বিবেকানন্দ মানসপটে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাস্তব রূপ দিবার জন্য এই দেশে আসিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন সর্বপ্রথম কলিকাতার অনতিদূরে বেলুড়গ্রামে একটি স্থায়ীকেন্দ্র বা মঠ। মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যে মঠাম্নায় রচনা করিয়াছিলেন তিনি তাহার প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন :

১। শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণপ্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী দর্শনের যে আকুল আগ্রহ লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই আগ্রহ উৎপাদনের প্রেরণা ও সুযোগ দান করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মঠে নির্মাণ করিলেন ঠাকুর ঘর এবং তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে।

হিন্দুধর্মের বহু বিবদমান সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত এই দেশে নিজ-প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভবিষ্যতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় যাহাতে গড়িয়া না ওঠে সেইজন্য উক্ত মঠাম্নায়ে "ঠাকুর ঘর" নামক অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন :

১। এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গই ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজা করিতে পারিবে।

২। ঠাকুরস্থাপন, পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরমহংসদেবের কোন উপদেশ নাই। ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা কল্পনা করিয়াছি।

৩। যোগ, ধ্যান, ভজন, জপ ইত্যাদি তাঁহার প্রধান শিক্ষা। মঠের বর্তমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই এ কথা স্বীকার করেন না যে, পরমহংসদেব কাহাকেও মূর্তিস্থাপন, পূজা, ভোগরাগাদির উপদেশ করিয়াছেন। কেবল তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় কোন-কোন শিষ্যকে নিজ মূর্তি ধ্যান করিতে বলিতেন।

৪। প্রভুর উপদেশানুসারে কার্য করাই তাঁহাকে যথার্থ সম্মান করা।

এই মঠাম্নায়ের অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন :

৫। ঠাকুরবাটীর দ্বারা দুই-চার জনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই-দশজনের কৌতুহল চরিতার্থ হয়; কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।

সাধনার শেষ পর্যায়ে নির্বিকল্প সমাধিযোগে যে তুরীয় তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের, তাহার মহিমা প্রচার করিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

সেবাধর্মের মাধ্যমে। শিবজ্ঞানে জীবসেবা—ইহাই হইতেছে এই সেবাধর্মের মূল মন্ত্র বা প্রাণ।

এই মূল মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই দিনকার এই উক্তির মধ্যে "জীবে দয়া—জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট তুই, জীবকে দয়া করবার তুই কে? না—না জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা"।[৩]

ভাবাবিষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া সেইদিন বলিয়াছিলেন—"কি অদ্ভূত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম...... ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়...... শিব বা নারায়ণের জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন-পূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালে কৃতকৃতার্থ হইবে।......যাহা হউক, ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব।[৪]

স্বামী বিবেকানন্দকে এই অদ্ভুত সত্য প্রচার করিবার সুযোগ দিলেন ভগবান্ এতদিনে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে মঠে ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বৈতভাবের সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন সেই মঠে তিনি শিব-জ্ঞানে জীবসেবার সূচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠকুরের অদ্বৈতভাবের সাধনার মহিমা প্রচার করিলেন।

সেবাধর্মের সীমারেখা বা গণ্ডি নির্দেশ না করিলেও এই দেশের সর্বাধিক প্রয়োজনবোধে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সৎশিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত এই জাতির সেবা করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহার বহু বক্তৃতায়। তিনি বলিয়াছেন—"তোমরা এই mass-এর ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর।......তোমাদের সহানুভূতি পাইলে ইহারা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে ইহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দাও। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব ইহাদের শেখাও। ......জ্ঞানোন্মেষ হইলে কুমার কুমারই থাকিবে, জেলে জেলেই থাকিবে, জাত-ব্যবসায় ছাড়িবে না। 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।[৫]

---

(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—পৃ-২৬২

(৪) ঐ ঐ —পৃঃ-২৬৩-২৬৪

(৫) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, পৃ-১৩৬-৩৭

বিশ্বের নানা দেশের ইতিহাস আলোচনা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের তুলনা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতি পর্যায়ক্রমে এই বিশাল বসুন্ধরা ভোগ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যুগ গত হইয়াছে। বৈশ্যের যুগ চলিতেছে। ব্যবসায়ে উন্নত জাতি এখন পৃথিবীকে ভোগ করিতেছে। ইহাদেরও অন্তিমকাল আসন্ন-প্রায়—মৃতের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার পর উত্থান হইবে শূদ্রবর্ণের। দেশের বা সমাজের হৃদয়হীন তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত ও পিষ্ট যে সর্বহারা সম্প্রদায় তাহারা ভোগ করিবে এই সসাগরা ধরাকে। ইহাই হইতেছে মহামায়ার সনাতনী ইচ্ছা বা প্রকৃতির নিয়ম।

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন বহুকাল পরাধীনতার পেষণে আত্মবিস্মৃত এই সোনার ভারত পরানুকরণপ্রিয় ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আত্মসম্বিদ্ জাগ্রত করিবার জন্য তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিলেন: হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য দেবতা উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ……ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।……ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ! আর বল দিন রাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।

স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ আমাদের প্রাণঘাতী জড়তা ও ক্লৈব্যকে নিঃশেষে দূর করিয়া শ্রেয়ঃপথের সন্ধান দিক—তাঁহার শতাব্দীপূর্তি বৎসরে ইহাই হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।
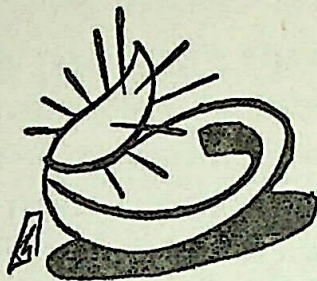
॥ দ্বাদশ অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

আজ ভারতের সর্বত্র—এমন কি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশেও সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হইতেছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। স্বামিজীর পুত পবিত্র চরিত্রের কথা, ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে তাঁহার অসামান্য অবদানের কথা, বিদেশে ভারতের সনাতন ধর্ম ও দর্শনকে প্রচার করিয়া যে ভাবে তিনি তাঁহার জন্মভূমির সম্মান ও মর্যাদা বর্ধিত করিয়াছিলেন সে সকল কথা স্মরণ করিলে হৃদয় আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবনত এবং মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। একাধারে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা, ভারতীয় সাম্যবাদের পুনঃপ্রবর্তক, অপূর্ব প্রতিভাশালী দার্শনিক এবং যে আদর্শবাদ গ্রহণ করিলে বর্তমান ভারত তাহার প্রকৃত কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিতে পারে সেই আদর্শবাদের প্রবক্তা।

কি অদ্ভুতই না ছিল তাঁহার দেশপ্রেম। পাশ্চাত্যে যখন তিনি পাশ্চাত্য যাত্রা করিতে মনস্থ করেন তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভিক্ষার ঝুলি বহন করিয়া "দেহি দেহি" মনোভাব লইয়া তিনি পাশ্চাত্যে যাইবেন না। পাশ্চাত্যকে উপহার দিবেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ—যাহা গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য ধন্য, কৃতার্থ, চরিতার্থ হইবে এবং তাহার প্রতিদানে তিনি ভারতে আনিবেন পাশ্চত্যের বিজ্ঞানকে ভারতবাসীর কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে। যতদিন তিনি য়ুরোপ বা আমেরিকায় ছিলেন কখনও ভারতের বিরুদ্ধে বা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কোনও কটুক্তি সহ্য করেন নাই। সিংহবিক্রমে সকল অপপ্রচারের উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার য়ুরোপে যখন স্বীকৃত লাভ করিল, বিবেকানন্দ তাঁহার দেশবাসী গৌরবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

একবার আমেরিকায় স্বামিজী এক দম্পতির গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের শিশুকন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—ভারতবর্ষ কোথায়? তিনি তাহাকে তাহার স্কুলে যে মানচিত্র ব্যবহার করা হয় সেইটি আনিতে বলেন এবং তাহা হইতে তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন। শিশুকন্যা যখন পুনরায় প্রশ্ন করিল ভারতের বর্ণ মানচিত্রে লাল কেন? স্বামিজী তাহাকে উত্তর দিতে পারেন নাই। গভীর দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া তাহার পিতামাতাকে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজের দম্ভ ও অহঙ্কারে ভারতভূমি রক্তিম, কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ের মর্মবেদনায় রক্তাক্ত।

ইংলণ্ডে একবার একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ভারতবাসী প্রকৃত বীরত্বের কোন দিনও পরিচয় দিতে পারেন নাই। কখনও সশস্ত্র আক্রমণ করিয়া অপরের ভূমি অধিকার করিতে পারে নাই, সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন যে, পারে নাই—একথা সত্য নহে; করে নাই বলিলে তবেই যথার্থ ইতিহাস বর্ণিত হইবে। ভারতবাসী তুচ্ছ ধন-সম্পদের লালসায় উন্মত্ত হইয়া প্রতিবেশীর রক্তে পৃথিবীকে রঞ্জিত করিতে চাহে নাই। সেইজন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের গৌরবে তিনি সর্বদা গর্ব অনুভব করেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবেকানন্দের জলন্ত দেশপ্রীতির বর্ণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জাতীয়তাবাদ তাঁহার গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি বা অধ্যাত্ম-চেতনা-প্রসূত। তিনি ভারতের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, অন্তরের অন্তরতম স্থলে ভারতবর্ষ এমন আদর্শ পৃথিবীকে দিতে পারে যাহার দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ ও সংঘাতের চিরতরে অবসান ঘটিবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পনর বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দ শেষবার য়ুরোপ ও আমেরিকায় যান। তিনি পাশ্চাত্যের ভোগ-বিলাসের ভিত্তিতে রচিত সমাজ-ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন যদি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে পাশ্চাত্য গ্রহণ না করে তো বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সেকথা বার বার তিনি শুনাইয়াছেন পাশ্চাত্যবাসীকে। তিনি তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে সহজে কোন কথা বলিতে চাহিতেন না। আমেরিকা ও য়ুরোপে তাঁহার গুণমুগ্ধ অগণিত নরনারী বহুবার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, যাঁহার প্রেরণায়, যাঁহার তপস্যা ও সাধনাবলে আকৃষ্ট হইয়া বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহার সাধনালব্ধ সম্পদ ও জ্ঞানকে প্রচার করিবার জন্য আকুল হৃদয়ে পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভক্তমণ্ডলী কিছু

শুনিতে চান। বিবেকানন্দ বলিতেন—তাঁহার গুরুদেব এত উদার, এত মহৎ, এত উচ্চস্তরের ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা বিবেকানন্দের অসাধ্য। কিন্তু বহু পীড়াপীড়ির পর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিউইয়র্ক ও লণ্ডনে তিনি দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাগুলির সারমর্ম *My Master* শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরমহংসদেব সম্পর্কে বলিবার পূর্বে বিবেকানন্দ ভারতের সুপ্রাচীন আদর্শের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন : "India cannot be killed. Deathless she stands, and will stand, so long as her own spirit remains as the background, so long as her people do not give up the God of India, so long as they do not believe in materialism ; so long as they do not abandon spirituality. ......Just as everyone in the West, even the man in the street, wants to trace his descent from some robber-barron of the Middle Ages, so in India even an Emperor on the throne seeks to trace his from some bagger-sage in the forest, from one who wore for clothing the bark of a tree, lived upon the wild fruits of the forest, and communed with God. That is the type of descent to which we aspire and so long as her pride of birth takes such a form, India cannot die".

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে তাঁহার দেশবাসীকে আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমিকে একমাত্র আরাধ্যা দেবী করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন সত্য। একথাও সত্য যে তিনি বলিয়াছেন ভারতের মৃত্তিকা তাঁহার স্বর্গ, ভারতের সমাজ তাঁহার বাল্যের শিশুশয্যা, তাঁহার যৌবনের উপবন, তাঁহার বার্ধক্যের বারানসী—ভারতের কল্যাণেই তাঁহার কল্যাণ। কিন্তু এ'সকল কথা বলিবার পূর্বে তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন তাহাদের নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে, তাঁহাদের উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্করকে। দেশবাসীকে ভুলিতে বারণ করিয়াছেন যে, তাহাদের জীবন, ধন, বিবাহ—ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নহে, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, জন্ম হইতেই তাহারা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। তিনি ছিলেন অতুলনীয় জাতীয়তাবাদী, কিন্তু সে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সাম্যবাদের পুনঃপ্রবর্তনেও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায়ই বলা হয় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিবেকানন্দের মানসপুত্র,—তাঁহার উত্তরসাধক। সুভাষচন্দ্র বহুবার বলিয়াছেন

তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার 'সাম্যবাদ'-শব্দটি কোনও বিদেশী শব্দের তর্জমা নহে, তাহা সম্পূর্ণ ভারতীয় শব্দ। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন তিনি সেই সাম্যবাদে বিশ্বাস করেন—যে সাম্যবাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ভারতের দর্শন, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে, যে সাম্যবাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বিবেকানন্দের আহ্বানে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন্ সাম্যবাদ জন্মিয়াছিল বিবেকানন্দের আহ্বানে? বেদান্ত বলিয়াছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ এই শাশ্বত-বাণীকে পারমার্থিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবেকানন্দ বেদান্তকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় সাম্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "দেশের মধ্যে,—দেশবাসীর মধ্যেই তোমার ভগবান আছেন। দেশকে ভালবাসো, দেশের সেবা করো। দেশের সেবায় সমস্ত স্বার্থ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলি দাও"। "দরিদ্র দেবো ভব, মূর্খ দেবো ভব, চণ্ডাল দেবো ভব" এই মন্ত্রে তিনি দেশবাসীকে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ আচার্য বিনোবা ভাবে ঠিকই বলিয়াছেন যে, "দরিদ্র-নারায়ণ"-শব্দটি বিবেকানন্দের অপূর্ব আবিষ্কার। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন করিয়া তাহাকে নারায়ণে পরিণত করিবার পথ বিবেকানন্দ আমাদের দেখাইয়া গিয়াছেন।

বিবেকানন্দের দার্শনিক প্রতিভা স্বল্প-পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। তিনি ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য-দর্শনে গভীর জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে হৃদয় তাঁহার পরিতৃপ্ত হয় নাই। "সর্বং দুঃখং দুঃখং, সর্বং শূন্যং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্"—ইহা ভারতীয় বৌদ্ধদর্শনের প্রথম প্রতিপাদ্য মূলতথ্য। কিন্তু ভারতীয় দর্শন এই দুঃখ—এই শূন্যতা—এই ক্ষণিকত্বের পরিসমাপ্তির পথনির্দেশও দিয়াছে। যেইদিন সাধক বুঝিবে 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহং', 'শিবোঽহং'—তাহার সকল বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইতে পারিবে; সে বুঝিবে তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; সে বুঝিবে তরুলতা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মানুষের মধ্যে সেই একই সত্তা বিরাজমান। তাহার আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক যেইদিন সে জানিতে পারিবে, সেইদিন পৃথিবীর পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে অমৃতলোক—আনন্দময় লোকের সন্ধান লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এই সত্যকে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সত্যকে যে জানিয়াছে তাহার মধ্যে কোনও প্রকারের কৌলিন্য, সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা অথবা ধর্মান্ধতা প্রবেশ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনে এই সত্যকে শুধু উপলব্ধিই করেন নাই,—তিনি ইহার মূর্ত প্রতীকস্বরূপ জনসমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ভারতকে জানিতে হইলে বিবেকানন্দকে জানিতে হইবে। ঋষি অরবিন্দ বলিয়াছেন যে বিবেকানন্দই ছিলেন ভারতের প্রাণস্বরূপ। বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা বিশ্ববিখ্যাত বৈদান্তিক স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন ঃ "He was the greatest of all Eastern and Western philosophers. In him I found the ideal of Karmayoga, Bhaktiyoga, Rajayoga and Jnanayoga ; he was like the living example of Vedanta in all its different branches".

পরিশেষে বিবেকানন্দ যে আদর্শবাদকে বর্তমান ভারতের গ্রহণীয় মনে করিতেন তাহার সম্বন্ধে সামান্য দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন ঃ "য়ুরোপের কাছে ভারতবর্ষকে শিখতে হবে বাহির প্রকৃতি জয়—আর ভারতের কাছে য়ুরোপকে শিখতে হবে আন্তর প্রকৃতি জয়"। সার্বভৌম, স্বাধীন ভারত যে আদর্শ প্রচার করিয়া বিশ্বের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে দুরদর্শী বিবেকানন্দ তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সে আদর্শকে অবলোকন করিয়াছেন। সে আদর্শ হইল সমন্বয়ের আদর্শ। বেদান্ত ও বিজ্ঞানের, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের প্রাচীনতা ও আধুনিকতার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই ভারতীয় সেই আদর্শবাদের কল্যাণময় সৌধ নির্মাণ সম্ভব এবং এই উপলব্ধি বিবেকানন্দের ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার আজীবন তপস্যালব্ধ এই সম্পদকে তিনি এই জাতিকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ এই আদর্শবাদের যত সন্নিকটস্থ হইবে ততই তাহার মঙ্গল সাধিত হইবে। আবার এই আদর্শবাদ হইতে যতদুরে সরিয়া দাঁড়াইবে ততই পরম-অকল্যাণকেও আমন্ত্রণ জানাইবে। আজিকার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বারবার সেই কথা স্মরণ করা দরকার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষপুর্তি-উৎসবে।

তাঁহার বিশাল, মহান, অলৌকিক ও অসামান্য জীবনের কণামাত্রও পরিবেশন করা একটি প্রবন্ধে অসম্ভব—লেখকের সে যোগ্যতা নাই। এই মহাপুরুষ বাঙ্গলার সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বের ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ অভিনব অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।..আজ তাঁহার স্মরণোৎসবে দেশবাসীকে সেই অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে।
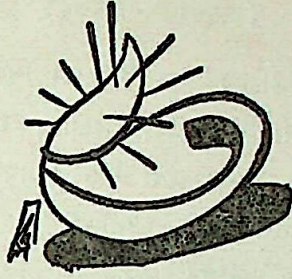
॥ ত্রয়োদশ অবদান ॥

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বিবেকানন্দ—অভেদানন্দ ॥

"These two names Vivekananda and Abhedananda are names as inseparable as is the confluence of a stream, as are reverse sides of a single coin".

—Sister Shivani

"বিবেকানন্দ অভেদানন্দ দুইটি নাম নদী-সঙ্গমের মত অবিশ্লেষ্য,—যেন একই মুদ্রার দুইটি পিঠ"।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরমপ্রকাশের আলোকে, যুগসন্ধিক্ষণে যে কয়টি তরুণ পথের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁরাই ছিলেন শ্রীঠাকুরের বাণীর ধারক ও বাহক। এঁদের সকলেই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতে এক এক দিক্‌পাল। সুন্দরের সীমানা পার হয়ে আনন্দলোকের বারতা এঁরা এনেছিলেন মর্তে। এঁদের কাম্যব্রত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী জগতে প্রচার করা। শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় উপলব্ধির বাণীর আলোকে তাঁদের অন্তরে যে চেতনা জেগেছিল তারই সাধনায় দুর্গম গিরি, নিবিড় কান্তারে, তাঁদের অভিযান শুরু হয়েছিল। তখন তাঁদের দেখে মনে হত যেন ঝড়ের অন্তরাত্মা, মানুষের রূপ ধরেছে। কেন, কোন্ প্রয়োজনে এই সব তরুণ তাপসেরা নিজেদের আত্মোপলব্ধির সাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন, সেটি উনিশ শতকের একটা পরম-বিস্ময়। আধ্যাত্মিক পিপাসার বর্দ্ধিত বেদনায় তাঁরা সকলেই একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছিলেন। যাঁর একটিমাত্র দৃষ্টি, একটি মাত্র স্পর্শ, মানুষের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত করতে পারতো, ভারত-মার্কিন সংস্কৃতি-বন্ধনের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এঁরা সকলেই তাঁর সেই স্পর্শ, তাঁর সেই ক্ষমা-সুন্দর নয়নের দৃষ্টিলাভ করেছিলেন। ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ শিষ্যদের তাঁদের ভাব অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। কারও ভাব তিনি নষ্ট করতেন না। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : "এই দেখ ঠাকুরের যারা শিষ্য—direct disciples, তাদের মধ্যে কত ভালবাসা। প্রত্যেকের যে মত এক তা' নয়। স্বামী বিবেকান্দের, আমার, কি সারদানন্দের সব আলাদা আলাদা ভাব। কিন্তু এক ভালবাসা সবার ভিতর আছে......"। সেকালে প্রজাপতি তাঁর দেবতা, মানুষ, অসুর এই তিন শিষ্যকে তিন রকমের উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রথম শিষ্য, দেবতা, অসীম ক্ষমতার আধার, যার অপব্যবহারে বিশ্বের সমূহ অকল্যাণ, তাই তাঁকে আত্মদমনের উপদেশ দিলেন। দ্বিতীয় শিষ্য মানুষ,—লোভী জীব, তাঁকে উপদেশ দিলেন দান করতে। আর তৃতীয় অসুর, যার স্বভাবই হিংসাপরায়ণ, তাঁকে উপদেশ দিলেন দয়া করতে,—হিংসাবৃত্তি যাতে বশে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা তাঁর মহান্ সমন্বয়-বাণীর প্রচারে দেশে বিদেশে অগণিত নরনারীর মনে শান্তি দিতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধের যুগে সমন্বয়বাণীর প্রয়োজন তেমন অনুভূত হয়নি। কারণ খ্রীষ্টধর্ম, ইসলামধর্মের যুগ প্রয়োজন তখনও ভবিষ্যতের আঁধারে। উনিশ শতকে বিশ্বের ধর্মজীবনে গভীর গ্লানি—অপার অনাচার প্রকট হয়েছিল। তাই প্রয়োজন হয়েছিল মিলন মৈত্রীর বাণীর। এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভারতে বিশেষভাবে বাংলায় যে সব ধর্ম বা সংস্কারক নেতাদের আবির্ভার হয়েছিল সংস্কার যুগে, তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি, যা' সাধনালব্ধ শক্তির আনন্দে অনন্ত রহস্যমণ্ডলের পারে নীত করে। যা' বিশ্বের রূপ, চিত্র, রস, সুর, সৌন্দর্যের রহস্যের সমাধান করে। যা' দূরকে আনে কাছে, অজানাকে আনে জানার সান্নিধ্যে, অদেখাকে আনে দৃষ্টিপথে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-আলোকে অনুপ্রাণিত তাঁর শিষ্যেরা, নিজেদের আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে পরম আস্তিক্যের অপাবৃত আনন্দলাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এক মহত্তর মহাধর্মের মহিমার প্রকাশ!

স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিসভায় স্বর্গত বি. সি. রায় বলেছিলেন : 'Columbus discovered the soil of America but Swami Vivekanand and Abhedanand discovered the soul of America,—'কলম্বাস মাত্র আমেরিকার ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন তার আত্মা'। এই দুই মহান্ পুরুষের মাঝে অনেক সাদৃশ্য ছিল। তরুণ বয়স থেকেই অশেষকে জানবার পরম আকুতি তাঁদের

রিজ্‌লি মেনরে (১৮৯৯ খ্রীঃ) স্বামিজীরা

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী অভেদানন্দ

দণ্ডায়মান : স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ
উপবিষ্ট : স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য

চিকাগো-ধর্মমহাসম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দ

হৃদয় মন অধিকার করেছিল। দু'জনেরই ছিল অদম্য জ্ঞানপিপাসা। দু'জনেই ছিলেন নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা, বাগ্মী, দার্শনিক, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সাধক। তাঁদের যে অবস্থায় বিশ্ব তাঁদের পরিচয়লাভ করেছিল তার প্রস্তুতি চলেছিল দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে, বরানগরে, আলমবাজারে ও ভারতের নানা তীর্থে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন কিনা। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর কাছে গিয়েছিলেন যোগ শিক্ষার মানসে। স্বামিজী তাঁর প্রশ্নের দীপ্ত জবাব পেয়েছিলেন, আর স্বামী অভেদানন্দ পেয়েছিলেন সমাধির আস্বাদ। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের অনুভব হয়েছিল দেশ-কাল-শূন্য এক অনন্তসত্বার এই গুহাতীত যিনি পরম-সত্বা,—তাঁকে জানাই জানা। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'তখন তখন ধ্যান করতুম আর যা যা দর্শন হতো শ্রীঠাকুরকে বলতুম। একবার এইরকম দর্শনের কথা শ্রীঠাকুরকে বলাতে তিনি বললেন যা' তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হল, এরপর আর (রূপ) দর্শন হবে না। সত্যি তাই। আর একবার বললুম, এই এই রকম দেখলুম! তিনি বললেন—হাঁ, এই ব্রহ্ম দর্শন হয়ে গেল…"। এই রকম ব্রহ্মোপলব্ধিতে স্বামী বিবেকানন্দের দেহজ্ঞান রহিত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় হেদুয়া-পুষ্করিণীর (বর্তমান আজাদ হিন্দবাগ) লোহার বেষ্টনীতে মাথা ঠুকে দেখতেন দেহ-চেতনা আছে কিনা। কাশীপুর বাগানে একবার স্বামী বিবেকানন্দ চিৎকার করে বলেছিলেন: 'গোপাল দা (পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ) আমার দেহটা কোথায়'।

> "Without a Vivekananda, without an Abhedananda, how far outside India would have travelled the gospel of Sri Ramakrishna is a question we cannot answer. Other beside myself have raised it. But without Ramakrishna where an Abhedananda, where a Vivekananda......?"
>
> —Sister Sivani

"বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ভারতের বাহিরে কতদূর প্রসার লাভ করত—এ' প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আরও অনেকে এ' প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিলে কোথায় থাকেন বিবেকানন্দ বা অভেদানন্দ?" ভগিনী শিবানী বিদেশিনী হলেও এই তথ্যটী সুন্দরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিলে বিবেকানন্দের বা অভেদানন্দের অস্তিত্বই থাকে না। এই তথ্যটী আজকের দিনে এ' দেশের অনেকেই মনে রাখেন না। স্বামী বিবেকানন্দ খুব বড় আধার ছিলেন সন্দেহ নেই, তা' না হলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি তিনি ধারণ করতে পারতেন না। স্বামী অভেদানন্দ

সম্পর্কে ওই একই কথা বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "নরেন (বিবেকানন্দ) লোক শিক্ষা দেবে"। আর বলতেন: "কালী (অভেদানন্দ) ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান, নরেনের মত একটা মত চালিয়ে দিতে পারে"। রামকৃষ্ণগতপ্রাণ বিবেকানন্দ বলেছেন:

"Then I began to come to that man, (Sri Ramakrishna) day by day. I actually saw that religion might be communicated. One touch once glance, could change a whole life. This I have seen repeatedly."

"দিনের পর দিন আমি এই মহান পুরুষটীর সান্নিধ্য লাভ করেছি আর দেখেছি ধর্মসংক্রমণ করা যায় আর তাঁর মাত্র একটী পরশে, একটী দৃষ্টিতে মানুষের সারা জীবনের পরিবর্তন সাধিত হয়। বার বার আমি এইটী হতে দেখেছি।" স্বামী অভেদানন্দও বলেছেন:

"But one power which we have seen Him (Sri Ramakrishna) frequently to exercise was the Divine power to transform the character of a sinner and to lift a worldly soul to the plane of super consciousness by a single touch. He would take the sins of others upon his own shoulders and would purify them by transmitting his own spirituality and by opening the spiritual eyes of his true followers."

"একটীমাত্র ঐশী শক্তি প্রয়োগ করতে তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) আমরা বার বার দেখেছি, যা' দিয়ে পাপীর চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হত, আর একটীমাত্র স্পর্শে বদ্ধ জীবকে ব্রহ্ম-চেতনার স্তরে উন্নীত করতো। তিনি অপরের পাপভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে আপন আধ্যাত্মিকতার সংক্রমণে তাদের পবিত্র করে দিতেন, আর প্রকৃত অনুগামীদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করতেন"।

মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শী সম্ভাষণ 'আমেরিকার ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ' যুক্তরাষ্ট্রে অভূতপূর্ব আবেগ সঞ্চারিত করেছিল। স্বামিজী আমেরিকাবাসীদের শোনালেন বিশ্বমানবধর্মে সকল রকম চিন্তাধারা সকল রকম ধর্মীয় আদর্শেরই স্থান হতে পারে। তিনি আরও শোনালেন বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ঐক্যবোধ স্থাপন করা, বিরোধ দূর করা সম্ভব। স্বামিজীর জলদগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত তেজোদীপ্ত এই বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি। তাঁর উদ্দেশ্যে স্বামিজী লিখেছেন: 'বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর'। নিজ উপলব্ধির প্রত্যয়ের শক্তিতে বেদান্তের গভীর দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমেরিকাবাসীর পরিচয় ঘটিয়ে স্বামিজী বিশ্বমানবের অখণ্ড রূপের একটা ধ্যানের ছবি আধুনিক মানুষের মনে এঁকে

দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে সময় আমেরিকা গিয়েছিলেন সে সময় ওদেশের সমাজের মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশের ভারতের ধর্ম, সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সেটী গভীর আর ব্যাপক রূপ ধারণ করে। আপন সত্তার মাঝে ঈশ্বর উপলব্ধিই সকল ধর্মের শেষ কথা, এই তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছেন। আমেরিকায় সাফল্যের সঙ্গে প্রচারকার্যের পর স্বামিজী লণ্ডনে আসেন। সেখানে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। প্রিয় গুরু ভ্রাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে ভারতীয় ভাবধারা প্রচারের সুযোগ দেবার জন্য স্বামিজী তাঁকে লণ্ডনে আবাহন করেন। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ ভাবধারা প্রচারে সম্পূর্ণ উপযোগী। তিনি বলেছেন: '...লণ্ডনে স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আমায় না জানিয়ে আমার নামে invitation (বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পত্র) ছাপিয়ে দিয়ে আমায় lecture (বক্তৃতা) দিতে বলেন। তারপর শেষে জানতে পেরে আমি বললুম, আমি কি করে লেকচার দেবো? এই সমস্ত দিন ঝুটোপুটি। যখন বললুম, তবে শিখিয়ে দাও কি রকম করে আরম্ভ করতে হয়—কি করে শেষ করতে হয়। তখন বললেন, আমায় কে শিখিয়েছিল? যাঁর মুখ দেখে আমি বলেছি তুমিও তাঁকে দেখেই বল"।

হলো তাই, দাঁড়ানো-মাত্রই পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত একটা electric current (বিদ্যুৎপ্রবাহ) বয়ে গেল। লোকে কি বলবে এই হল ভয়। যাই হোক সেটাকে দাবিয়ে রেখে বলে গেলুম। স্বামিজী দেখি এদিকে খুব মাথা নাড়ছেন। আমার দেখে ভয় হলো—কি বুঝি ভুল হচ্ছে। আমার বলা হয়ে গেলে স্বামিজী খুব প্রশংসা করলেন। বললেন—এই বেদান্তচর্চার ফল। আমায় বললেন: "you have resonant voice which has carrying power too" (তোমার কণ্ঠস্বর মধুর এবং শ্রোতাদের মনকে নিয়ে যাবার শক্তিও আছে)। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলুম তখন অত মাথা নাড়ছিলে কেন? তিনি বললেন, খুব আনন্দ হচ্ছিল তাই। পাশ্চাত্য দেশে স্বামী অভেদানন্দের এইটী প্রথম বক্তৃতা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এইটি প্রদত্ত হয়। বিষয় ছিল মুনি বিদ্যারণ্যের "পঞ্চদশী"-র ভূমিকা।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকধারা প্রাচ্য ও প্রতীচীর গগনে ভাস্বর হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দের অমিত ব্রহ্মতেজ, বিদ্যাবত্তা, আর স্বামী অভেদানন্দের পঁচিশ বৎসর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা, মনীষা, প্রতিভা,

সুনিবিড় দার্শনিকতা ও গভীর জ্ঞান তার কারণ। তিনি বলেছেন: "……যদি আমি পঁচিশ বৎসর স্বামিজীর কাজে লেগে না থাকতুম তবে পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্ম-প্রচারের কার্যক্ষেত্র কি প্রসার হত? দু'দিন বাদে পাশ্চাত্ত্যেরা স্বামিজীর বাণী ভুলে যেত……দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে ওদেশে আমি স্বামিজীর প্রবর্তিত পথে ঠাকুরের প্রচার করেছি"। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে সত্যের উপলব্ধি আর বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করবার পর স্বামী অভেদানন্দ সম্যক দৃষ্টি লাভ করেছিলেন আত্মসমাহিত জ্ঞানে, তাই তাঁর বক্তৃতা বা লেখায় দেখা যায় সূক্ষ্মবিচার বুদ্ধি ও অপূর্ব বিশ্লেষণশক্তি। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—'তুই একঘেয়ে হোস্ নি। একঘেয়েমি ভাল নয়'। সত্যকে যুগোপযোগী করে প্রচারের জন্যে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর বক্তৃতা বা লেখার মধ্যে পাওয়া যায় একটা অখণ্ড রূপ। ভারতীয় দর্শনের সেটি স্বাতন্ত্র্য। স্বামিজী বা স্বামী অভেদানন্দ যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি মাত্র বেদান্ত দর্শনের কোন ভাষ্যের ব্যাখ্যা মাত্রই নয়, সেগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত তাঁরই অনন্ত ভাবরাশি। যেগুলি আপন আপন জীবনে প্রতিফলিত করে তাঁরা সুনিহিত, সুবিহিত, সুষমাযুক্ত ভাষণগুলি দিয়েছিলেন এ'গুলিতে আছে বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশের দর্শন ইতিহাস। তাদের মধ্যে নেই অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালী। তাঁরা সত্যের অপরূপ রূপ দেখেছিলেন, সেটিই ছিল তাঁদের জীবনপথের পাথেয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চিরতরে মার্কিণ ত্যাগের আগে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর বেদান্ত আশ্রম স্বামী অভেদানন্দকে যে মানপত্র দিয়েছিলেন তাতে সভ্যদের ব্যথা অপ্রকাশিত থাকেনি:

> "Although there are many teachers amongst us, still we have not found another like you who has such a vast treasure of wisdom and such a deep spiritual realisation and who has the power to awaken the Divine Consciousness in the earnest souls of seekers after Truth. Therefore we feel that in your absence we shall be sailing in troubled water in a ship without her captain and cannot bear the thought that you would leave us so soon and go to India".

"যদিও আমরা আরও অনেকগুলি ধর্মাচার্যের সঙ্গলাভ করেছি, কিন্তু আপনার মত অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী আর গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতিসম্পন্ন দ্বিতীয় একজনকে পাইনি। পাইনি এমন একজনকে যিনি আপনার মত অকপট সত্যানুসন্ধানীদের অন্তরে ভগবৎ অনুভূতি জাগ্রত করতে পারেন। আপনার অবর্তমানে আমাদের অবস্থা হবে কর্ণধারহীন তরণীর মত। আপনি যে এত শীঘ্র ছেড়ে যাবেন, একথা আমরা ভাবতেই পারি না"।

প্রাচীন আচার্য শিষ্যকে বলেছেন: "যানি অনবদ্যানি কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি"; —যে কর্ম অনবদ্য তাই তুমি করবে। অন্যকর্ম করবে না। যে কর্ম দোষবিহীন, তাই হল অনবদ্য কর্ম। যে কর্ম কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল নয়, তাই অনবদ্য কর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই কর্মই করেছিলেন। কর্ম যেমন বাঁধন খোলার জন্য তেমনি বাঁধন পরার জন্যও। এ' বিষয়ে তাঁরা খুবই সচেতন ছিলেন। কর্মের কৌশল তাঁদের আয়ত্তে ছিল, তাই সহস্র কর্মের মাঝে পরম মুক্তির স্বাদ তাঁরা পেয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কর্মে স্বামিজীর বিতৃষ্ণা দেখা গিয়েছিল। এই সময়ে মিস্ ম্যাক্‌লিওডকে তিনি লিখেছিলেন:

> "......Work is always difficult, Pray, for me, that my work stops for ever, and my whole soul be absorbed in Mother. Her work she knows. ......After all, I am only the boy who used to listen with rapt wounderment to the wonderful words of Ramakrishna under the Banyan at Dakshineswar, That is my true nature, works and activities, doing good and so forth are all superimpositions".

"কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। প্রার্থনা কর, কর্ম যেন আমার চিরতরে বন্ধ হয় আর আমার আত্মা মহামায়ায় লীন হয়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। প্রকৃত-পক্ষে আমি সেই বালকটি যে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে নির্বাক বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্চর্য কথামৃত পান করতুম। এইটিই আমার প্রকৃত পরিচয়। কর্মপ্রচেষ্টা, উপকার করা এ' সকলই বাহির হতে আরোপিত মাত্র"। এই সময়েই স্বামিজী, স্বামী অভেদানন্দকে বলেছিলেন:

> "Well brother, my days are numbered. I shall live only for three or four years at the most". The Gurubhai replied, "you must not talk like that Swamiji. You are fast recovering your health, If you stay here for some time, you will be completely restored to your former strength and vigour. Besides, we have got so much work to do. It has only begun". But the Swami repliedsignificently: "You do not understand me brother. I feel that I am growing very big. My self is expanding so much that at times I feel as if this body could not contain me any more. I am about to burst. Surely this cage of flesh and blood cannot hold me for many days more".

"ভাই আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি মাত্র আর তিন কি চার বছর বাঁচবো"। গুরুভাই উত্তর করলেন: "ওকথা বলোনা স্বামিজী। তোমার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। এদেশে কিছুদিন থাকলেই তুমি পূর্বের শক্তিসামর্থ ফিরে পাবে"। স্বামিজী অর্থপূর্ণ উত্তর করলেন: "ভাই, তুমি আমার কথা বুঝতে

পারছো না। আমি অনুভব করছি আমি অতিশয় বড় হয়ে যাচ্ছি। আমার সত্তার এতই বিস্তার হচ্ছে যে, সময় সময় মনে হয় দেহ আমায় ধারণ করতে পারবে না। আমি যেন ফেটে পড়বো। এই রক্ত মাংসের খাঁচাটি খুব বেশী দিন আর আমায় ধরে রাখতে পারবে না"। স্বামিজী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'ও যেদিন স্ব-স্বরূপ জানতে পারবে সেদিন শরীর ছেড়ে দেবে'। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানরা ছিলেন তাঁর হাতের যন্ত্র। শ্রীঠাকুর ছিলেন যন্ত্রী। এঁরা সকলেই ছিলেন রামকৃষ্ণময়।

প্রচারকার্যের কর্মকোলাহলের মাঝে তাঁদের আসল পরিচয়টি অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকতো। তাঁদের শেষের পরিচয়টি পাওয়া যেত তাঁদের শেষের দিনগুলিতে। স্বামী অভেদানন্দের অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেক আগেই বলেছিলেন: "কালী যখন বাহিরের সমস্ত কাজকর্ম কমিয়ে দেবে তখনই তার অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ লোকচক্ষে পড়বে"। পরম কারুণিক বিবেকানন্দ, মানব-মিত্র বিবেকানন্দ, বাগ্মী-বিবেকানন্দ, লোকগুরু-বিবেকানন্দ, কর্মযোগী বিবেকানন্দ, পরম নির্বাণের সম্মুখে সকল কর্ম ত্যাগ কোরে পারের নৌকার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলেন। দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত অভেদানন্দ দার্শনিক অভেদানন্দও শান্তি পারাবারের আবাহন শুনে শেষের দিনগুলিতে যাত্রা কোরে বসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথাকাহিনীতে তাঁর বিচিত্র জীবনের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দকে আমরা দেখেছি দিনের পর দিন। শুনেছি তাঁর সুললিত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, দেখেছি তাঁর সৌম্য সহাস মূর্তি। দেখেছি তাঁর দেবদুর্লভ হাসিটি, যা শেষের অসুখের সময়ও কখনো ম্লান হয়নি। এই মহান্ সরল পুরুষটি যে এককালে য়ুরোপ, আমেরিকার প্রখ্যাত মনিষী, দার্শনিকদের সঙ্গে বিচারে জয়ী হয়েছিলেন একথা তখন আমাদের মনেই হত না। মনে হত তিনি যেন আমাদেরই একজন ছিলেন। এইখানেই তাঁদের সত্যিকারের পরিচয়। সে পরিচয়টি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে আজও ভাস্বর।

॥ চতুর্দশ অবদান ॥
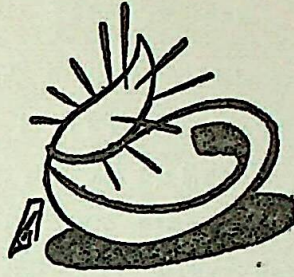
॥ ভারতের মৌলিক সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥

আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের যখন আবির্ভাব হয়, তখন ভারতবর্ষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন আজ হইতে যে স্বতন্ত্র ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আজিকার দিনে যে সমস্যার আমরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হইতেছি, জীবন-সংগ্রামের পথে আমাদের মধ্যে যে নূতন নূতন জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে, একশত বৎসর পূর্বে তাহা যে ছিল না এমন নহে—তবে তাহার প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে সেদিন সংগ্রাম করিয়া তাঁহার যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা আজিকার ভারতীয় জীবনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপ দেখিয়া কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিব না। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও সাধনার প্রভাব অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল যাবৎ ভারতীয় সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশলাভ করিতেছে, তাহার ফলে বর্তমান ভারতের সমাজ-জীবন অনেকখানি নূতন আদর্শে গঠিত হইতেছে। সুতরাং ভারতের প্রকৃত যে অবস্থা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকান্দকে আত্ম-কেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক সাধনার সনাতন ক্ষেত্র হইতে বহির্মুখী কর্মের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া আনিল, তাহা কোনদিনই আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র ছিল সমগ্র ভারত, তাঁহার ধ্যানের লক্ষ্য কেবলমাত্র বাংলার 'সাত কোটি সন্তানের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না। সেদিনকার বাংলার অন্যান্য মনীষীর মত তাঁহার সাধনার লক্ষ্য যদি কেবলমাত্র বাংলার হিন্দু সমাজমাত্র হইত, তবে তাঁহার কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন সে যুগের অন্যান্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই অনুকূল হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই।

এ' কথা অবশ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, সে'যুগে অখণ্ড ভারতের চিন্তা কোন বাঙ্গালী মনীষীর হৃদয়েই উদিত হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্যান্যের নিকট অখণ্ড ভারত একটি স্বপ্ন মাত্র ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের নিকট তাহা প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। সেদিন অন্যান্য বাঙ্গালী মনীষিগণ যখন ভারতবর্ষকে প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণপত্র হইতে উদ্ধার করিতেছিলেন, সেইদিন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিটি পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং অন্যান্য সমাজহিতৈষী ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত দর্শনের একটি মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল। পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের ভিতর দিয়া ভারতের স্বরূপ উপলব্ধির তুলনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ দর্শন-জাত উপলব্ধির শক্তি যে অধিক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিয়া দেশ ও জনহিতৈষণার যে প্রেরণা সেদিনকার সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দের জনহিতৈষণার প্রেরণা সেই পথ দিয়া আসে নাই। সুতরাং যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতা দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া একদিক দিয়া ইহাদের পরিচয় যেমন অভিনব, অন্যদিকে ইহাদের শক্তিও বিস্ময়কর হইয়া উঠিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজ-কর্মীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মধারার পার্থক্য কোথায় ছিল, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যান্য মনীষীদিগের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কেবলমাত্র রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে—আর কাহারও জীবনের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা যায় না। কারণ, এই দুইজন মনীষীর মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দের মত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মেরও সংযোগ ঘটিয়াছিল। সামাজিক কু-প্রথা দমন করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নির্ভীক সংগ্রাম, তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার সকল সামাজিক প্রথাই কু-প্রথা ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার নূতন ধর্মমত গঠন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতাকে আঘাত করিলেন না, ইহার কোন প্রথাকেই কু-প্রথা বলিয়া নিন্দা করিলেন না, নূতন কোন ধর্মমত গঠন করিবার পথে অগ্রসর হইলেন না। সহস্র বৎসর ব্যাপী

যে ধর্ম কোটি কোটি হিন্দুকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়াছে, তাহাদের ধর্ম সত্যাশ্রয়ী ধর্ম, ইহার মধ্যে পরিত্যাগ করিবার কিছু নাই। রাজা রামমোহন উপনিষদকেই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের আচারকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষৎ-বেদান্তকে যেমন সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের সকল আচারকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁহার একেশ্বরবাদী ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা করিবার কার্যে তাঁহার সকল বুদ্ধি ও চিন্তা কর্ম নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দেশের মধ্যে একটি নূতন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে বহু শতাব্দী হইতেই যেমন অসংখ্য ধর্মমতের উদয় ও বিলোপ হইতেছে, তাঁহার ধর্মমতও তাহাদেরই অন্যতম একটি ধর্মমত হইল মাত্র। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম ও চিন্তা হিন্দুধর্মের বিশাল ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করিল না, ইহাকে সমগ্রভাবে আশ্রয় করিয়া লইয়াই তাঁহার সাধনা ও কর্ম রূপ লাভ করিল। এই পার্থক্যের প্রধান কারণই এই যে, একজন ইতিহাস হইতে ভারতের দেহের এবং উপনিষদ হইতে ইহার আত্মার সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আর একজন তীর্থে তীর্থে পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া ইহার প্রত্যক্ষ রূপ ও ইহার আত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ উভয়কেই যে একই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাঁহারা খৃষ্টান-ধর্মপ্রচারক। কিন্তু এক শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বীর ইহারা উভয়ে একইভাবে যে সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা নহে। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রের ভিতর হইতে যুক্তি সন্ধান করিয়া প্রতিপক্ষের যুক্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শাস্ত্রের যুক্তি যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তথাপি তাঁহার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্ররূপে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের যুক্তির সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের শক্তি সংযুক্ত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের সাধনাতে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহা সে যুগের মনীষীদিগের আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট হৃদয়ের অনুভূতির যে মূল্য ছিল, শাস্ত্রের যুক্তি কিংবা ধ্যান-ধারণার সেই মূল্য ছিল না। হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে তিনি সত্যকে সহজভাবে লাভ করিয়াছেন, কোন জটিল শাস্ত্রীয় যুক্তি কিংবা ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহা তিনি লাভ করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী কিংবা ঈশ্বরোপাসকও

ছিলেন না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, তাঁহার নিরাকারত্ব কিংবা সাকারত্ব সম্পর্কে তাঁহার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না ; তিনি সহজভাবে অন্তরের মধ্যে যে সত্যের প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার শাস্ত্রসম্মত যৌক্তিকতা বিচার না করিয়া সহজভাবে তাহা আচরণ করিয়াছেন। ভারতের সনাতন আদর্শ যে কি, তাহাও তিনি অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার প্রধান বিরোধ দেখা যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং বিধবার পুনর্বিবাহের মধ্যেই যে নারী-জীবনের মৌলিক কল্যাণ নিহিত আছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ভারতীয় সমাজ-জীবনে ব্রহ্মচর্য সাধনার আদর্শের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জীবনে তাহাই যে যথার্থ কল্যাণের পথ নির্দেশ করিতে পারে, তাহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সমাজের কুসংস্কার দূর হইতে পারে, কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন দ্বারা তাহা হয় না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এ' কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আজ যে বিধবা-বিবাহ বাংলার সমাজের যে কোনও সমস্যা নহে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়ন দ্বারা সম্ভব হয় নাই, বরং শিক্ষার প্রসার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সাময়িক কোন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করিবার পরিবর্তে সর্বদাই ইহার মৌলিক কারণটির সন্ধান করিয়াছেন। মৌলিক কারণটি দূর করিতে পারিলেই সমাজ-দেহের ব্যাধির যে চিরতরে উপশম হইতে পারে, ইহাই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে যখন সমস্ত দেশ প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যখন হিন্দু-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়া ইহার সংহতি ক্ষুণ্ণ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তখন স্বামী বিবেকানন্দ এই আন্দোলনের সঙ্গে কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিবার পরিবর্তে হিন্দু-সমাজের কি ভাবে সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে, তাহারই পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর আর কোন ভারতীয় মনীষীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মত চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র এত প্রসারিত ছিল না। তিনি উপনিষদের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে যেমন জীবের স্বরূপ-সম্পর্কে চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার পর্যটক-জীবনের পদযাত্রার মধ্য দিয়া ভারতের প্রায় প্রতিটি নরনারীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের অবস্থা জানিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পর্যটক-জীবনের আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি ভারতের কেবলমাত্র প্রাদেশিক

রাজধানী কিংবা বড় বড় সহরের মধ্যেই তাঁহার ভ্রমণ এবং ইহার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তিনি তাঁহার পদযাত্রার ভিতর দিয়া ভারতের ক্ষুদ্রতম পল্লীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহার দীনতম অধিবাসীর আর্থিক এবং সামাজিক জীবন-সম্পর্কেও তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। জীবের স্বরূপ কেবলমাত্র যে ঈশ্বরতত্ত্ব-আলোচনার সঙ্গেই সংযুক্ত নহে, এই জীব যে নগরে নগরে তীর্থে তীর্থে পল্লীতে পল্লীতে ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবেও প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় তাহা সেই যুগে কেবলমাত্র তিনিই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সাধনার মধ্যে তাহা অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মধারার সঙ্গে তাঁহার কতকটা তুলনা করা গেলেও স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে বহুগুণ বিস্তৃত ছিল। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের আর কোন সমাজহিতৈষী কর্মীর মধ্যে এই প্রেরণা দেখা যায় নাই। এমন কি, ইহাই যে পরবর্তী শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর গণসংযোগ এবং হরিজন আন্দোলনের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

পরিব্রাজক-জীবনের ভিতর দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এমন একটি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যাহা সেই যুগে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সেই যুগে দেশ-প্রেমিকতাই হউক কিংবা মানব-প্রেমিকতাই হউক, উভয় বিষয়ই আমরা পুঁথির ভিতর দিয়া যতখানি শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ততখানি শিক্ষা লাভ করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতীয় অন্যান্য সন্ন্যাসীদেরও একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। তীর্থভ্রমণ ভারতীয় সন্ন্যাসীমাত্রেরই অবশ্য আচরণীয় ধর্ম। তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে দেবতা এবং পুণ্যকর্মের সন্ধানেই সন্ন্যাসিগণ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এক তীর্থ হইতে আর তীর্থে যাইবার পথে যে সকল জনপদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যেও যে দেবতা আছেন, তাঁহারাও উপেক্ষণীয় নহে বরং পূজ্য—সেকথা স্বামী বিবেকানন্দ যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভারতের আর কোন সন্ন্যাসী তাহা করেন নাই। ইহার মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পূর্বে কেবলমাত্র উত্তর ভারতের কয়েকটি তীর্থ পর্যটনের ফলেই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সমস্যা প্রকৃত যে কি, তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পর্যটক-জীবনের মধ্য দিয়াই তাঁহার মধ্যে যে দৃষ্টি বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই তাঁহার পরবর্তী সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিন্তু

তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের এই অভিনব মানব-চেতনা তাঁহার সহযোগী সন্ন্যাসীদিগের কর্ম ও সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই প্রথম বাধা পাইলেন। তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারা যায়: "......he strove to inspire his brother desciples with this new idea of religion. Even in those early days Naren would urge them to go to the village of the outcasts to preach; but the monks were quite averse from preaching".

ভারতীয় সাধনার বিশেষত্বই এই যে, ইহা আত্মকেন্দ্রিক। মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন প্রধানতঃ ইস্‌লাম ধর্মের প্রভাবের ফলেই উত্তর-ভারতে এমন কয়জন সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহাদের সাধনায় আত্মকেন্দ্রিক ধর্ম-সাধনার আদর্শ রক্ষা পাইতে পারে নাই, বরং তাহাদের সাধনায় প্রচারমূলক ভাবটিও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কবীর, দাদূ, গুরু নানক ইহাদের কাহারও সাধনা যে অর্থে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা আত্মকেন্দ্রিক বলিয়া অনুভূত হয়, সেই অর্থে আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। সে যুগে বাংলাদেশেও চৈতন্যদেব কর্তৃক যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাও মূলতঃ আত্মকেন্দ্রিক সাধনা ছিল না। চৈতন্যদেব তাঁহার পার্ষদদিগের সহযোগিতায় তাঁহার নূতন ধর্মমত বাংলা ও উড়িষ্যার মত দুইটি প্রদেশে নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ব্যাপক প্রচার-কর্মের মধ্য দিয়াই চৈতন্যদেবের প্রকটকালেই তাঁহার ধর্মমত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল—তাহার আজ পর্যন্তও আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু-সমাজে যে ধর্মচিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার মূলে ভারতের সনাতন আদর্শের পুনরভ্যুত্থানের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। এ'কথা সত্য, সে যুগের ব্রাহ্মধর্ম খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেক দিক দিয়াই প্রচারমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি ব্রাহ্মধর্মেরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে দিন হিন্দু সমাজ-জীবন যেভাবে পুনর্গঠিত হইতেছিল, তাহারই একটি অংশে হিন্দু সনাতন ভাবাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, তাহাও হিন্দু-ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবিষয়ের প্রচারকার্য সকলের সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পর্যটক-জীবনের মধ্য দিয়া এ'কথা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম কেবলমাত্র আত্ম-কল্যাণের হেতু হইতে পারে না, একান্ত আত্মার কল্যাণ-কামনার মধ্যে যে স্বার্থ-

পরতার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা ধর্ম নহে, বরং অধর্ম। সেইজন্য তিনি দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহযোগী সন্ন্যাসীদিগের উদ্দেশ্যে সেদিন বলিলেন: "Aye, even if you, my brother monks, stand in my way, I will go and preach among the Pariahs in the lowest slums".

চৈতন্যদেবও 'দরিদ্র, মূর্খ, নীচ' ইত্যাদির মধ্যে নিজের প্রেমধর্ম প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পার্ষদদিগকে এই কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একজন প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দকে এই কার্যে একজন অত্যন্ত উৎসাহী কর্মীরূপেই লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে এ'দেশে ধর্মপ্রচার করার যে নীতি, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের যে পুনর্জাগরণ দেখা গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মত সংস্কারমূলক ধর্মের আধ্যাত্মিক কিংবা কর্মধারার কোন যোগ ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের আদর্শ গ্রহণ করিলেও ইহা সনাতন হিন্দুধর্মের মৌলিক কতকগুলি আদর্শ হইতে বিছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য ইহার দ্বারা যে স্বতন্ত্র এক সমাজ রচিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্ম হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যে ধর্মচেতনা স্বামী বিবেকানন্দকে প্রচারকর্মে উদ্বুদ্ধ করিল, তাহা সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ হইতে কোন দিক দিয়াই বিচ্যুত ছিল না; এবং পরমহংসদেবের আদর্শ উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ও সেদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মূলতঃ সনাতন হিন্দুধর্মকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শে বিশ্বাসবান হইয়াও যখন ধর্মপ্রচার-কর্মকে ধর্মসাধনার একটি অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীগণ প্রথমতঃ ইহা অনুমোদন করিতে পারিলেন না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পর্যটক-জীবনের মধ্য দিয়া ভারতের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রচার কর্মকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহার দৃষ্টি কেবলমাত্র অন্তরাশ্রয়ী ছিল না, বহির্মুখী সকল বিষয়ের প্রতিই তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সুতরাং এই দৃষ্টি লইয়া তিনি যে কেবল তীর্থভ্রমণেরই যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তীর্থ-মন্দিরের বাহিরেও যে বিস্তৃত মানব-সমাজ অভাব-অভিযোগ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া দৈনন্দিন জীবনযাপন করিতেছে, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত না করিয়া পারিলেন না। ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, তীর্থের দেবতা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া গিয়া

একমাত্র যে দেবতার মূর্তি তাহাতে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা মানুষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতদিন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণ-ভারতে পদার্পণ না করিয়াছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার এই চেতনা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, দক্ষিণ-ভারতে সেদিন তিনি দারিদ্র্যের যে ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতের কোন অংশের সঙ্গেই তাহার তুলনা হয় না। একদিন তিনি মাদ্রাজ সহরের সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়া কোন্ দৃশ্যটি যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনীতে এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে: "One day, when he saw the wretched and half-starved children of the fishermen working with their mothers, waist-deep in the water, tears filled his eyes, and he cried, "O Lord, why dost thou creat these miserable creatures! I cannot bear the sight of them. How long, O Lord, how long!"

দক্ষিণ-ভারতে একদিকে অস্পৃশ্যতার পাপ, আর একদিক দিয়া অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক এবং আর্থিক বিষয়ে যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সহজেই স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সর্বত্রই মানুষের দুর্গতির চিত্র তাঁহার সকল চিন্তা এবং কর্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক অনাচার, অস্পৃশ্য সমাজের অর্থনৈতিক দুর্গতি, মানুষের নামে পশুর জীবন-যাপনের নগ্ন চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভারত-পর্যটনের শেষসীমা কন্যাকুমারিকায় আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, সমগ্র ভারত তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, কেবলমাত্র শাস্ত্রে নহে, নিজের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, —আর দেখিবার কিছু নাই, আর জানিবার কিছু নাই। কিন্তু ইহার সম্পর্কে নানা আশা-নিরাশার তরঙ্গ তাঁহার অন্তরকে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি একদিকে যেমন ভাবিলেন: 'India shall rise only through a renewal and restoration of that highest spiritual consciousness which has made of India, at all times, the cradle of the nations and the cradle of the faith"। চরম-দারিদ্র্যে অপমানজনক পরাধীনতায় দুরপনেয় অজ্ঞতায় সামাজিক দুর্গতিতে ভারতের পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় তাহার আধ্যাত্মিক চেতনার উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা সত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ সে দিন উপলব্ধি করিলেন, যে দারিদ্র্য হিমাচলের মত অবিচল হইয়া ভারতের সামগ্রিক উন্নতির মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সমাধান কি করিয়া সম্ভব হইতে

পারে। কারণ, তাহার সমাধান ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতিও কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। সেই সময়ের মনোভাব সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন: 'In view of all this, specially of the poverty and ignorance, I got no sleep. At Cape Comorine sitting in Mother Kumari's temple, sitting on the last bit of Indian rock,—I hit upon a plan: We are so many Sannyasins wandering about, and teaching the people metaphysics,—it is all madness. Did not our gurudeva used to say, "An empty stomach is no good for religion?" That those poor people are leading the life of brutes, is simple due to ignorance. We have for all ages been sucking their blood and trampling them under foot'.

কেবলমাত্র ত্যাগ এবং সেবা দ্বারা এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী সমগ্র জাতির এই বিরাট অভাব-মোচনের দায়িত্ব কিভাবে গ্রহণ করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহার চরিত্রে যে আস্থা ও বিশ্বাসের শক্তি ছিল, তাহা দ্বারাই তিনি উদ্বুদ্ধ হইলেন, তাঁহার তেজ এবং বীর্য দ্বারা সকল বাধা তিনি অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন: 'Yes, he would cross the ocean and go to America in the name of India's millions. There he would earn money by the power of his brain and returning to India devote himself to carry out his plans for the regeneration of his countrymen or die in the attempt'.

আমেরিকা যাইবার ইহাই তাঁহার মূল-উদ্দেশ্য ছিল এবং সেখানে গিয়াও দরিদ্র ভারতের চিন্তা তাঁহার দিনের কর্ম এবং রাত্রির নিদ্রা যে কি করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি। চিকাগো ধর্মসভার দশমদিবসের অধিবেশনে তিনি 'দরিদ্র পৌত্তলিক' বিষয়ক যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন: 'হে খ্রীষ্টিয়ানগণ, তোমরা পৌত্তলিকদিগের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে ব্যস্ত, কিন্তু বল দেখি অনাহারের হস্ত হইতে তাহাদের দেহ উদ্ধারের জন্য কোন যত্ন কর না কেন?......আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনহীন স্বদেশীয়গণের জন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি '... ('চিকাগো বক্তৃতা' ১৯শ সং পৃঃ ৩৮)। অথচ এ' কথা আমরা সকলেই জানি যে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে নিজের পারিবারিক জীবনের কঠিন দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রামকৃষ্ণদেব যখন নরেন্দ্রনাথকে

বিশ্বজননীর নিকট চাল ডালের জন্য প্রার্থনা জানাইতে বলিলেন, তখন নিজের কিংবা নিজের ক্ষুধার্ত পরিবারের জন্য তাঁহার নিকট এত তুচ্ছ জিনিসের জন্য প্রার্থনা জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। নিজের জীবনে একদিন নরেন্দ্রনাথ দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের কোটি কোটি লোকের দারিদ্র্যের চিন্তা তাঁহার অন্তর যেভাবে অধিকার করিয়াছিল, আর কোন বিষয় তাঁহার হৃদয়ে সেভাবে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এইভাবেই তাঁহার মনে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার পরিকল্পনার উদয় হইয়াছিল। সেবাকর্মের সঙ্গে একটি আধ্যাত্মিক দায়িত্ব যুক্ত করিয়া দিবার ফলে এই সেবাকর্ম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেবাকর্মের মত কেবলমাত্র একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন মাত্র বুঝাইল না, বরং তাহার পরিবর্তে একটি অবশ্য পালনীয় ধর্মাচরণের মধ্যে তাহা স্থান লাভ করিল। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর ব্রহ্মোপাসনা একদিক দিয়া প্রত্যক্ষ নর-নারায়ণের সেবা ও অন্য দিক দিয়া অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মচিন্তার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

সেইদিনকার ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা ছিল দারিদ্র্য অশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা। সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা তাহার এই দারিদ্র্য অশিক্ষা এবং অস্পৃশ্যতা দ্বারাই সে'দিন বিপর্যস্ত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই সমস্যাগুলির সেদিন কেবলমাত্র পুঁথিলব্ধ জ্ঞান হইতে সন্ধান লাভ করেন নাই বলিয়া ইহারা তাঁহার সমগ্র জীবনের ধ্যানদৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাঁহারই চিন্তা এবং কর্মের ধারা পরবর্তী শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর কর্ম ও সাধনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।
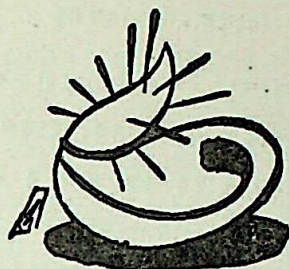
॥ পঞ্চদশ অবদান ॥

॥ শাশ্বত ভারত ও বিবেকানন্দ ॥

ভারতবর্ষ ভৌগলিক সীমায় সীমিত একটি দেশমাত্র নয়; ভারত একটি ভাবের প্রতীক। দীর্ঘকাল ধরে শত উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, বিপদ-বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ তার বিশিষ্টভাব রূপটি হারায়নি। সমগ্র পরিবর্তনের মধ্যে তা' অপরিবর্তিত, সমস্ত চঞ্চলতার মধ্যে তা' অচঞ্চল, বিচিত্র প্রতীয়মানতার মধ্যে তা' নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার মত প্রচ্ছন্ন হলেও প্রোজ্জ্বল। শাশ্বত ভারত বা সনাতন ভারত বলতে আমরা একেই বুঝি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যুগপুরুষ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই শাশ্বত ভারতের বাণীমূর্তি। স্বামিজীর লেখায় ও কথায় এই ভারতবর্ষই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ একথা উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যই তিনি বলেছেন: "If you want to know India study Vivekananda. In him everything is Positive and nothing negative".

এখানে প্রশ্ন উঠবে—ভারতের ভাবরূপটি কি এবং বিবেকানন্দই বা কিভাবে তা' প্রকাশ করেছেন? এই প্রবন্ধে আমরা এই প্রশ্নেরই উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাঠ করি তা' নিশীথ রাত্রির স্বপ্নকাহিনী মাত্র। ভারতবর্ষের আসল ইতিহাস তার সংস্কৃতির ইতিহাস, বিচিত্রের মধ্যে একেকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাস। সহজ কথায়, বিরোধ নয়, সমন্বয়; বৈচিত্র্যের অস্বীকৃতি নয়, বৈচিত্র্য-সঞ্জাত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা; বর্জন নয়, গ্রহণ—শাশ্বত ভারতের বাণী। উপনিষদের ঋষি চরমসত্য বলে যাঁর জয়গান করেছেন তিনি অবর্ণ কিন্তু বর্ণবৈচিত্র্যের নিহিতার্থ তিনিই বিধান করেন। ('যো একঃ অবর্ণঃ বর্ণানেকান্ হিতার্থে দদাতি')। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এর থেকেই ভারতীয় সাধনার মর্মবাণীটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে উপলব্ধি করার সাধনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ এ'কথা বৈদিক যুগের ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন : 'একং সৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি,—অগ্নি, মিত্র, যম, বরুণ আহুঃ' ;—সৎ এক, পণ্ডিতেরা তাঁকে অগ্নি, মিত্র, যম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন মাত্র। ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্তে বিশ্বভুবন-বিধৃত এবং ভুবন-অতিক্রান্ত এক বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে ; আবার নাসদীয়সূক্তে সমস্ত বর্ণনার অতীত এক ও অদ্বিতীয় সত্তার কথা আছে। এর থেকেই বোঝা যায়, ভারত এক-এরই সাধনা করে, এই এক বৈচিত্র্য-বিরোধী নয়, বৈচিত্র্যের নিহিতার্থ বিধানকারী।

ভারতবর্ষ মানসিক প্রবণতা অনুসারে সাধনার পথে বিভিন্ন স্তরের অধিকারী পথিকের কথা স্বীকার করেছে। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন পথেই ইষ্টলাভ সম্ভব। সহজ সাধক রামকৃষ্ণদেব ভারতের এই মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন : 'যত মত তত পথ'। ভারতের এই শাশ্বত বাণীই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্, মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'—যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। মানুষ যে পথেই যাক্ না কেন আমাতেই এসে পৌছাবে, পার্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ শাশ্বত ভারতের সাধনার ইতিহাসের এই তাৎপর্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যুগ-প্রয়োজনে ভারত-ইতিহাসের এই মূল সুরেই তিনি মহামিলনের মহাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এ' সঙ্গীত পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সঙ্গীত। কথাটি খুলে বলতে হলে স্বামিজী স্বদেশের যে পরিপ্রেক্ষিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা' আলোচনা করা দরকার। আমরা এবার সে পথই ধরবো।

স্বামিজী যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতের সমাজে দু'টি বিপরীতমুখী ধ্যান ধারণার ধারা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। একদিকে ছিল বেদ-বেদান্ত-আশ্রিত সনাতন ভারতের আত্মমুখী সংস্কৃতির প্রবাহ, অন্যদিকে ছিল পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাহিত বহির্মুখী সভ্যতার প্লাবন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল শোচনীয়, তাদের পক্ষে আবর্তে ভেসে যাওয়াই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি। দেশে তখন সুস্পষ্ট দু'টি বিবদমান দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একদল উৎসাহের আতিশয্যে অদ্ভুত ব্যাপার সব সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি বলে প্রচার শুরু করলেন ; তাড়াহুড়োয় ভারতাত্মার সন্ধান না পেয়ে তাঁরা আচার বিচার অনুষ্ঠান নির্ভর দেহটাকেই শাশ্বত ভারত বলে ভুল করলেন। এঁদের হাতে

ভারতের যুক্তি-নির্ভর কথা কেমন অসংলগ্ন প্রলাপের মত হয়ে উঠলো। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের ব্যঙ্গ করে বললেন, 'ফোঁটা কাটা অনুস্বার বাদীর দল'। আর একদলের লোক সদ্যপ্রাপ্ত ইংরাজী শিক্ষার ফলে যা কিছু বিদিশী তারই বড় বেয়াড়া স্বরে জয়গান শুরু করলেন। এরা আমাদের বহুকালাশ্রিত সংস্কৃতি মানতে রাজী ন'ন, সাগরপারের স্বপ্ন দেখে এরা সব 'চলতি হাওয়ার পন্থী' হয়ে উঠলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'হ্যাটকোট পরা সাহেব'। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই সময়কার একটি নিখুঁত ছবি মেলে।

স্বামিজী এই পটভূমিকায় জন্মগ্রহণ করে একদিকে যেমন ভারতাত্মার সন্ধান দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি অসহায় বিভ্রান্ত দেশবাসীকে নিরাপদ এবং নিশ্চিত পথনির্দেশ দিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণদেব সহজ উপলব্ধির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে শাশ্বত ভারতকে যেভাবে বুঝেছিলেন, বিবেকানন্দ তা-ই দেশে বিদেশে প্রচার করেছেন কম্বুকণ্ঠে। ভারত-ইতিহাসের সমন্বয়ের শিক্ষাটিও রামকৃষ্ণদেবের অন্তর্দর্শনের প্রেরণায় বিবেকানন্দ প্রয়োগ করেছিলেন যুগ-সমস্যা-সমাধানে। আমাদের ধারণা, স্বামিজীর কর্ম-কৃতির আসল পরিচয় এইখানেই।

বিবেকানন্দ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্ত্য-ভোগসর্বস্বতা কখনই চরম-শান্তি দিতে পারেনা। শান্তির পথ ত্যাগের পথ, ভোগের পথ নয়। এইদিকে ভারতেরই জয়। আবার জগতে বাস করে দুঃখ-দুর্গতি-হীনতার চরম-অপমানের মধ্যে কোনপ্রকারে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখাও অর্থহীন। ভারত কখনও এ' শিক্ষা দেয় না। ঐহিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্ত্যের কর্মনিষ্ঠা, বিজ্ঞানচর্চা, শ্রম-মূল্যবোধ নিশ্চয়ই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। জগতে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য নিরলস চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসার, কিন্তু এই জগতকেই সর্বস্ব মনে করাতেই দোষ। পশ্চিমীরা প্রশংসিত কাজটি করেও দোষটি পরিহার করেনি। আমরা এই দোষটি পরিহার করে প্রশংসনীয় ব্যাপারটি গ্রহণ করবো। বিবেকানন্দের ভাষায় বলি: 'We want harmony, not one-sided development!' এক কথায়, পাশ্চাত্ত্যের ঐহিক উন্নতির প্রচেষ্টা ভারত তথা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সহায়ক হলেই পরিপূর্ণতা লাভের পথ উন্মুক্ত হবে। আমাদেরও ঐশ্বর্য আছে, পশ্চিমীদেরও সম্পদ আছে, এমন নয়। দুই-ই যখন মিলবে তখনই আমরা সার্থক হব। শাশ্বত ভারত-ইতিহাসের শিক্ষা-সমন্বয়কেই স্বামিজী যুগের বিশেষ সমস্যা-সমাধানের মূলসূত্র বলে গ্রহণ

করেছেন। ফলে একদিকে যেমন তিনি সার্থক 'ভারত-পুরুষ' হতে পেরেছেন অন্যদিকে তেমনি যুগ-সমস্যা সমাধানের ঋষিও হতে পেরেছেন। স্বামিজীর সমসাময়িক—মাত্র এক বছরের বড় কবি রবীন্দ্রনাথও এই পথই মিলনের পথ বলে মনে করেছেন। তিনি বলেন: "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা স্বামিজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর '*Unity in Diversity*' বিষয়ে বক্তৃতায় লণ্ডনে যেভাবে বলেছিলেন আমরা তা' উদ্ধার করার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনে। তিনি বলেছেন: "I do not say your view is wrong, you are welcome to it. Great good and blessing come out of it, but do not, therefore, condemn my view. Mine also is practical in its own way. Let us all work on our own plans. Would to God all of us were equally practical on both sides! I have seen some scientists who were equally practical, both as scientists and as spiritual men, and it is my great hope that in course of time the whole of humanity will be efficient in the same manner. When a kettle of water is coming to the boil, if you watch the phenomenon, you find, first one bubble rising, and then another and] soon, until at last they all join, and a tremendous commotion takes place. This world is very similar. Each individual is like a bubble and the nations resemble many bubbles. Gradully the nations are joining and I am sure the day will come when separation will vanish and that oneness to which we are all going, will become manifist. A time must come when every man will be as intensely practical in the scientific world as in the spiritual, and then that oneness, the harmony of oneness, will pervade the whole world"। বিশ্বাসের আন্তরিকতায়, অনুভূতির গভীরতায় এবং প্রকাশের মাধুর্যে এই ভাষণটি অনবদ্য। অনুবাদে বা ভাষ্যে মূলের সুরটি মিলবে না ভয়ে আমরা তা' করছি না। আর তা' অবান্তর বলেই মনে করি।

ভারত-ইতিহাসের নির্দেশ যুগসমস্যা-সমাধানে স্বামিজী কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার আলোচনা শেষ হল। এবার ভারতাত্মার পরিচয় স্বামিজী যেভাবে দিয়েছেন তাই আলোচনা করবো।

ভারতবর্ষ চিরকালই অনাত্মবস্তুর চেয়ে আত্মার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে বেশী। উপনিষদের ঋষি বলেছেন: 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য বা'—আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করা উচিত। উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য অদ্বৈতমতে এই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। আমরা যে জীবাত্মায় এবং পরমাত্মায় ভেদ কল্পনা করি তা' একান্তই অযৌক্তিক, জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। উপনিষদ-বাক্য 'তত্ত্বমসি' এই সত্য প্রকাশ করেছে। উপনিষদের এই যুগান্তরকারী বাণী দীর্ঘকাল নিবদ্ধ ছিল পুঁথির পাতায়। আমরা অনেকেই তার তাৎপর্য বুঝিনি; অথচ এত বড় কথা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ কখনও বলেনি; উনবিংশ শতাব্দীর সহজ-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'কথার সারমর্ম সহজ করে বললেন: 'যত জীব, তত শিব'। নরই আসলে নারায়ণ। নর-নারায়ণের উপলব্ধিই চরম-উপলব্ধি। ঈশ্বরকে খুঁজতে বনে, বিজনে, গিরি-গুহায় বা মন্দিরেও যাবার দরকার নেই। দেহালয়ের দেবালয়ে যে আত্মার অধিষ্ঠান তাই ত পরমাত্মা। তা-ই একমাত্র বরণীয়, স্মরণীয় ও পূজনীয়। মানুষের এমন মর্যাদা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ কখনও দেয়নি। এই দৃষ্টিতে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নহে। হাল আমলে আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক পশ্চিমী দর্শনের মানবতাবাদের (Humanism) কথা খুবই বলি। কিন্তু আমাদের দেশের উপনিষদ মানবাত্মার অনন্ত মহিমা প্রচার করে সুদূর অতীতে যে দৃঢ়ভিত্তিক মানবতাবাদের পত্তন করেছিল তার কথা তেমন বলিনা। আত্মবিস্মৃতির এ' এক লজ্জাকর প্রকাশ।

স্বামিজী শাশ্বত ভারতের এই মানবতাবাদ রামকৃষ্ণদেবের সহজ উপলব্ধির আলোতে নূতনভাবে পেলেন। তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন,

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর !

জীবই যদি সত্যিকারের শিব হয় তবে শিব-সাধনা তো আসলে জীবের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা। সেজন্যই স্বামিজী বলেন, জীবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশই ধর্ম ('religion is the manifestation of divinity already in man')। রবীন্দ্রনাথ এরই নাম দিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম'। বিবেকানন্দের মতে ভারতীয় জীবনের এই হচ্ছে মূলসুর। আমাদের মনে হয়, এমন উদার, এমন মহৎ, এমন গভীর ধর্মবোধ আর হতেই পারে না। এই ধর্ম প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অপরিহার্য। কারণ, এ' ছাড়া মানুষ যে মানুষই হবে না। একদিকে নিজের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি ও বিকাশ এবং অন্যদিকে অন্যের মধ্যে এই দেবত্বের আস্বাদন

এই ধর্মের মূল কথা। সেজন্যই শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা এই ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। স্বামিজী এই জীব-সেবার ওপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'সেবাধর্ম'। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'-তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ এই ভাবেই আমরা লক্ষ্য করি স্বামিজীর কর্মে ও আদর্শে। স্বামিজী স্বয়ং এর নাম দিয়েছেন '*Practical Vedanta*' বা ব্যবহারিক বেদান্ত। দীর্ঘকাল ধরে যে বেদান্ত-তত্ত্ব ছিল বুদ্ধির চর্চার বিষয় বিবেকানন্দ তাকেই আমাদের জীবনচর্যার অঙ্গ করে তুললেন। আমরা বিবেক-বাণীর মুকুরে শাশ্বত ভারতকে আবার নূতন করে দেখলাম।

ভারতীয় ঋষিদের মতে আত্মা আনন্দরূপ ও অমৃতরূপ। অনাত্ম বস্তু ত্যাগ করে অন্তর্মুখীন প্রবণতায় এই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। তাই ঋষি বলেছেন: 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ',—ত্যাগ করেই সেই আত্মা বা সেই আনন্দকে ভোগ করা যায়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, কাম কখনই কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না ('ন কামম্ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি')। অগ্নিতে কাষ্ঠ সংযোগ করলে অগ্নি তো নির্বাপিত হয় না, পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সুতরাং বস্তু-সংগ্রহের পথে আনন্দলাভের চেষ্টায় মরিচীকার পেছনে ছোটার মতই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কস্তুরি মৃগ যেমন তার নাভিদেশেই কস্তুরি রয়েছে একথা বিস্মৃত হয়ে কস্তুরির গন্ধের উৎস-সন্ধানে বনে বনান্তরে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়, আমরাও তেমনি আনন্দের আধার আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে অনাত্ম বস্তুতে আনন্দ খুঁজে হতাশ হই। এপথ ত্যাগ করে আন্তর সাধনার পথ গ্রহণ করতে হবে, তবেই মিলবে বহুবাঞ্ছিত আনন্দের সন্ধান। সেজন্যই ভারতীয় সাধনায় ত্যাগী হওয়ার নির্দেশ। স্বামিজী একথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেজন্যই ভারতীয়দের দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ত্যাগী হও'। সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন যুবকদের। অগণিত যুবক তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশ মাতৃকার চরণে সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। সে ইতিহাস আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

ভারতের ঋষি আরও বলেছেন: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,—এই আত্মা কখনই বলহীনব্যক্তি লাভ করতে পারে না। ভারতীয় সাধনায় দুর্বলতা, কাপুরুষতা, ভীরুতা সর্বত্রই প্রচণ্ডভাবে নিন্দিত হয়েছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হৃদয়দৌর্বল্য পরিহার করার জন্য আহ্বান করেছেন, ক্লৈব্য প্রাপ্ত হতে নিষেধ করেছেন, উদ্যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন ('ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ')।

স্বামিজী শাশ্বত ভারতের এই নির্দেশ অনুবর্তন করেই বলেছেন : 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর' ; প্রার্থনা করতে বলেছেন : 'আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর' বলে, আশীর্বাদ করেছেন,—'বীর্যবান হও'। কখনও বলেছেন : দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় পাপ, নচিকেতার মত নির্ভয়প্রাণ তরুণদের সঙ্গ চেয়েছেন, সবাইকে আশ্বাস ও অভয় দিয়ে বলেছেন : 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। এই প্রসঙ্গে স্বামিজীর নিম্নোদ্ধৃত বাণীটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ : "লোক ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগৎ এতদ্রূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও ; বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সরল করিবে, যাহাতে তাহাদের একথা যথার্থ হিত হইবে। দুর্বলতা ও অবসাদকারক চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে। ...ইহাই সত্য—জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দাও। সাহসী হও"।

(—ভক্তিযোগ ৬৭ পৃষ্ঠা)।

সাহসী হতে হলে আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। যার নিজের ওপর আস্থা নেই সেকি বীর্যের অধিকারী হতে পারে ? ভারতবর্ষ চিরকালই আত্মপ্রত্যয়ের দীক্ষা দিয়েছে। শাস্ত্রকার যাকে অমৃতের পুত্র বলে ঘোষণা করেছেন তার পক্ষে আত্ম-প্রত্যয় লাভ খুবই স্বাভাবিক। স্বামিজী বার বার বলেছেন, : 'আত্মবিশ্বাসী হও'। ব্যক্তি-জীবন বা সমাজ-জীবন সর্বত্রই সাফল্যের জন্য আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিপর্যয়ের দিনে স্বামিজী একথা উপলব্ধি করে সবাইকে আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছেন।

সাম্প্রতিক কালের মত ও পথের দ্বন্দ্বে বিবিধ দুর্যোগ ও সমস্যায় শাশ্বত ভারতকে বিবেকানন্দ যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাকেই যদি ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করি তবে একদিকে স্বামিজীর জন্মজয়ন্তী-উৎসবপালন যেমন সার্থক হবে, অন্যদিকে তেমনি আমরা ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা পাবো। স্বামিজীকে সার্থকভাবে স্মরণ করতে হলে তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ করতে হলে 'শাশ্বত ভারতকে' বরণ করতে হবে। পায়ের নীচের মাটি সরে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের সনাতন ধ্যান-ধারণার মাটি সরিয়ে দিলে জাতি হিসেবে আমাদেরও মরতে হবে—ডামাডোলের বাজারে একথা যেন না ভুলি।
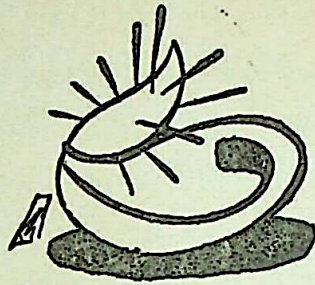
॥ ষোড়শ অবদান ॥

॥ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব ॥

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

সুগভীর সাগরের আঁধারে হিমাচলের ন্যায় পুঞ্জীকৃত কজ্জল ভরে পৃথিবীর ন্যায় বিশালায়ত পত্রে কল্পতরুশাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সরস্বতী যাঁর গুণ বর্ণনা করতে পারেন না সেই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ শংকর প্রতিম পুরুষোত্তম স্বামী বিবেকানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম জানাই। কোটি কোটি প্রণাম।

ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র সাধনধারার অপূর্ব সমন্বয় যেমন যুগাচার্য পরমহংসদেব —তেমনি তাঁর রিকৃথভাগীরূপে স্বামী বিবেকানন্দ অলৌকিক তপস্যা ও অমানুষিক সংযম কঠোরতায় এমন এক মহাশক্তি লাভ করেছিলেন যাতে তিনি প্রাচ্যকে আপন অতীত প্রত্যক্ষ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতকে অমৃতের বাণী শুনাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ স্বামিজীকে মর্ত্যকায়াতে দেখতে পাবো না কেউ। তিনি ধ্যানগম্য আমাদের। সেই মহাপুরুষকে দেখেছেন এমন লোকও আজ বিরল হয়ে আস্ছে ধীরে ধীরে।

আজ ভারতের গ্রামে-গ্রামে, তীর্থে-তীর্থে, নগরে-নগরে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বজা উড়ছে। মানস-নেত্রে ভেসে উঠছে সেই অপূর্বরূপ—"দাঁড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী, পাদপল্লব থেকে মুণ্ডিত মস্তক অবধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধৃত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ পার্শ্বীকৃত উন্নতমুখ, উদার আঁখি সুদূর দিগন্তে বিলগ্ন— এরূপ কি শুধুই বিবেকানন্দের!"

"তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ-যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি"।

মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন: "পুরুষসিংহ, জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত, তাঁহার চক্ষে জলদর্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য"। আমেরিকাবাসী সেরূপ দেখে বলেছে: "সাইক্লোনিক হিন্দু মঙ্ক"। আমরা ভারতবাসী বলি: "মূর্ত মহেশ্বরমুজ্জলভাস্কর"। অপরূপ বীরমূর্তি! "ঐ সমুন্নত উষ্ণীষ, দীপ্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, বিশাল আনন, ঐ বিস্তৃত বক্ষ—বক্ষোপরিস্থাপিত যুগলবাহু—অমেয়দর্প ও মহিমার একি তুংগমূর্তি! বিশাল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে পিষ্ট করে দুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত, পদ্মনয়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠসম্বদ্ধ অথচ মেঘমন্দ্রিত হতে উন্মুখ"।

'Sinners? It is sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep'.

"মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্‌ নিবোধত"। যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন রামকৃষ্ণগতপ্রাণা জননী সারদামণি দেবী, আর সে পবিত্র হোমাগ্নির আহুতির জন্য অগ্রসর হয়ে এলেন সুদূর পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে আইরিশ কন্যা মার্গারেট নোবল।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"......

ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও রেখে যায় তার মধুর সুরভি, যে সুরভি বিমোহিত করে সমগ্র জগতকে। এ' সুরভি বাতাস বয়ে আনে না। এ' সুরভি পঞ্চভূতে তৈরী। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে এর মিতালী—নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করে ধূপ রূপায়িত হয় সুরভিতে। ঠিক এমনিভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে মার্গারেট হয়েছিলেন 'নিবেদিতা'।

"বাংলার দিগ্বিজয়ী বীরপুত্র বিবেকানন্দের
পুণ্য অভিযান-জিতা সেবা-লক্ষ্মী,—মহাভারতের
আত্মার আত্মীয় তুমি। পশ্চিমের রাজনাত্রি-চূড়ে
জন্মিয়াও তুমি তাই ছুটে এলে এই এত দূরে

হিন্দুভারতের পূতসিন্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ
করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন
মহীয়সী ভগ্নী নিবেদিতা,
.........প্রীতিশ্রদ্ধাঞ্জলি লহ সুচরিতা"।

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন,

The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southerns breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free.
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India's future son
The Mother, Maid and Friend in one.

"মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পূণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর বেদীতলে :
এসব তোমারই হ'ক আরো ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
অনাগত ভারতের যে-মহামানব,
সেবিকা বান্ধবী মাতা—তুমি তার সব"।

সত্যি সত্যি বিবেকানন্দের এবাণী সার্থক হয়েছিলো। আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও মা-ই হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেছিলেন : 'লোক-মাতা', ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন 'শিখাময়ী'। নিবেদিতা নিজেকে বলতেন : 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। শিশুবয়স থেকেই সত্যানুসন্ধানের অভীপ্সার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিলো মার্গারেটের জীবনে। তাঁর ছেলেবেলার পরিবেশ ছিল অধ্যাত্ম-জীবন গড়ে ওঠারই অনুকূলে। ঠাকুরদা ধর্মযাজক ও বিপ্লবী। পিতাও হয়ে উঠলেন তাই। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। শরতের এক সোনাঝরা প্রভাতে মায়ের বুকে এলো তাঁর প্রথম সন্তান। যন্ত্রণায় কাতর হয়েও মা আকুল কণ্ঠে দেবতাকে নিবেদন করলেন : "ঠাকুর, আমার সন্তানকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম"। ঠাকুরমার নামে নাম মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখা হলো মার্গারেট এলিজাবেথ। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

স্ত্রীকে শেষ সম্ভাষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন: "ভগবান যেদিন ওকে (মার্গারেটকে) ডাক দেবেন, সেদিন বাধা দিওনা যেন......ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি...ও এসেছে একটা বড়-কিছু করবার জন্ম...", যেন প্রিয়তমা কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে হাসিমুখে স্তামুয়েল ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর এলো সাংসারিক বিপর্যয়। বিদ্যালয়ের জীবন শেষ করে ক্রমে শিক্ষয়িত্রী জীবন গ্রহণ করলেন মার্গারেট নোবল। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বৎসর। কেস্ উইকের বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু একুশ বছর বয়সে আবার কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন—রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষিকার পদ। শুধু শিক্ষিকা নয়। মার্গারেট ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রেক্সহামের দরদী সমাজ-সেবিকা এবং বিভিন্ন কাগজে সামাজিক নিবন্ধরচয়িত্রীও।

কর্মক্ষেত্রের আবার পরিবর্তন। শিক্ষিকাই বটে, তবে এবার চেষ্টারে। আবার দু'বছর পরে লণ্ডনে। প্রথমে মিসেস ডি-লীউর নূতন ধরণের স্কুলে উইম্বল্ডনে। তারপরে উইম্বল্ডনের অপর অঞ্চলে নিজস্ব রাস্কিন স্কুলে। শিক্ষিকার কাজ ছাড়াও সমাজ ও সাহিত্যসেবায় মগ্ন রইলেন মার্গারেট। সেণ্ট জেমস্ গেজেটের সম্পাদক আর. ম্যাক্নীল ও মার্গারেটের চেষ্টায় গড়ে উঠলো বিখ্যাত সাহিত্য সমিতি 'সিসেম ক্লাব'। এখানেই গড়ে ওঠে ক্রমে তাঁর নীড়বাঁধা ও ভালবাসার স্বপ্ন। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মার্গারেটের সুখের স্বপ্ন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল নিয়তির নিষ্ঠুর নিঃশব্দ আঘাতে।

ভগ্নহৃদয়ে গেলেন তিনি হ্যালিফ্যাক্সে বান্ধবী মিস কলিন্সের কাছে। তাঁর বুকে মাথা রেখে সব লজ্জা ভুলে মার্গারেট তাঁর নষ্ট নীড়ের জন্য শিশুর মতো আকুল হয়ে কাঁদলেন। তারপরে সপ্তাহ শেষে বান্ধবীর সান্ত্বনায় শান্তি ফিরে পেয়ে চলে এলেন তিনি পুনরায় লণ্ডনে। বান্ধবী বলেছিলেন: "এই গভীর আঘাতে অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাবে, চিত্তপ্রশান্ত হলেই সে-দিব্যজ্যোতির অনির্বচনীয় প্রসাদ সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে তুমি"। এমনি সময়ে ঠিক স্বর্ণ মুহূর্তেই প্রথম সাক্ষাৎ স্বামী বিবেকানন্দের সংগে। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাঁকে ঘিরে—মার্গারেট মুগ্ধ বিদায়ে তাকিয়ে থাকেন।

কত চমৎকার কথা বললেন তিনি। নিজের অনিচ্ছাতেও মার্গারেটের মন ভেসে চলে কোন অসীমে। তিনি অনুভব করেন একটা সুগভীর নিবিড় শান্তি, সংশয় বুদ্ধির অবিরাম দ্বন্দ্বের মাঝে মুহূর্তের বিরতি যেন। আর সেইসঙ্গে মার্গারেটের হৃদয়ে একটা প্রবল আলোড়ন জাগলো। মার্গারেটের জীবনের ধারা যেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। অন্ধকারে যেন ফুটে উঠলো আলো।

হিন্দুভারতের পূতসিন্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ
করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন
মহীয়সী ভগ্নী নিবেদিতা,
.........প্রীতিশ্রদ্ধাঞ্জলি লহ সুচরিতা"।

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন,

The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southerns breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free.
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India's future son
The Mother, Maid and Friend in one.

"মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর বেদীতলে :
এসব তোমারই হ'ক আরো ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
অনাগত ভারতের যে-মহামানব,
সেবিকা বান্ধবী মাতা—তুমি তার সব"।

সত্যি সত্যি বিবেকানন্দের এবাণী সার্থক হয়েছিলো। আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও মা-ই হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেছিলেন: 'লোক-মাতা', ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন 'শিখাময়ী'। নিবেদিতা নিজেকে বলতেন: 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। শিশুবয়স থেকেই সত্যানুসন্ধানের অভীপ্সার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিলো মার্গারেটের জীবনে। তাঁর ছেলেবেলার পরিবেশ ছিল অধ্যাত্ম-জীবন গড়ে ওঠারই অনুকূলে। ঠাকুরদা ধর্মযাজক ও বিপ্লবী। পিতাও হয়ে উঠলেন তাই। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। শরতের এক সোনাঝরা প্রভাতে মায়ের বুকে এলো তাঁর প্রথম সন্তান। যন্ত্রণায় কাতর হয়েও মা আকুল কণ্ঠে দেবতাকে নিবেদন করলেন: "ঠাকুর, আমার সন্তানকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম"। ঠাকুরমার নামে নাম মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখা হলো মার্গারেট এলিজাবেথ। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

স্ত্রীকে শেষ সম্ভাষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন: "ভগবান যেদিন ওকে (মার্গারেটকে) ডাক দেবেন, সেদিন বাধা দিওনা যেন……ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি…ও এসেছে একটা বড়-কিছু করবার জন্য…", যেন প্রিয়তমা কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে হাসিমুখে স্যামুয়েল ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর এলো সাংসারিক বিপর্যয়। বিদ্যালয়ের জীবন শেষ করে ক্রমে শিক্ষয়িত্রী জীবন গ্রহণ করলেন মার্গারেট নোবল। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বৎসর। কেস্ উইকের বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু একুশ বছর বয়সে আবার কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন—রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষিকার পদ। শুধু শিক্ষিকা নয়। মার্গারেট ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রেক্সহ্যামের দরদী সমাজ-সেবিকা এবং বিভিন্ন কাগজে সামাজিক নিবন্ধরচয়িত্রীও।

কর্মক্ষেত্রের আবার পরিবর্তন। শিক্ষিকাই বটে, তবে এবার চেষ্টারে। আবার দু'বছর পরে লণ্ডনে। প্রথমে মিসেস ডি-লীউর নূতন ধরণের স্কুলে উইম্বল্‌ডনে। তারপরে উইম্বল্‌ডনের অপর অঞ্চলে নিজস্ব রাস্কিন স্কুলে। শিক্ষিকার কাজ ছাড়াও সমাজ ও সাহিত্যসেবায় মগ্ন রইলেন মার্গারেট। সেন্ট জেমস্ গেজেটের সম্পাদক আর. ম্যাক্‌নীল ও মার্গারেটের চেষ্টায় গড়ে উঠলো বিখ্যাত সাহিত্য সমিতি 'সিসেম ক্লাব'। এখানেই গড়ে ওঠে ক্রমে তাঁর নীড়বাঁধা ও ভালবাসার স্বপ্ন। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মার্গারেটের সুখের স্বপ্ন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল নিয়তির নিষ্ঠুর নিঃশব্দ আঘাতে।

ভগ্নহৃদয়ে গেলেন তিনি হ্যালিফ্যাক্সে বান্ধবী মিস কলিন্সের কাছে। তাঁর বুকে মাথা রেখে সব লজ্জা ভুলে মার্গারেট তাঁর নষ্ট নীড়ের জন্য শিশুর মতো আকুল হয়ে কাঁদলেন। তারপরে সপ্তাহ শেষে বান্ধবীর সান্ত্বনায় শান্তি ফিরে পেয়ে চলে এলেন তিনি পুনরায় লণ্ডনে। বান্ধবী বলেছিলেন: "এই গভীর আঘাতে অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাবে, চিত্তপ্রশান্ত হলেই সে-দিব্যজ্যোতির অনির্বচনীয় প্রসাদ সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে তুমি"। এমনি সময়ে ঠিক স্বর্ণ মুহূর্তেই প্রথম সাক্ষাৎ স্বামী বিবেকানন্দের সংগে। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাঁকে ঘিরে—মার্গারেট মুগ্ধ বিদায়ে তাকিয়ে থাকেন।

কত চমৎকার কথা বললেন তিনি। নিজের অনিচ্ছাতেও মার্গারেটের মন ভেসে চলে কোন অসীমে। তিনি অনুভব করেন একটা সুগভীর নিবিড় শান্তি, সংশয় বুদ্ধির অবিরাম দ্বন্দ্বের মাঝে মুহূর্তের বিরতি যেন। আর সেইসঙ্গে মার্গারেটের হৃদয়ে একটা প্রবল আলোড়ন জাগলো। মার্গারেটের জীবনের ধারা যেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। অন্ধকারে যেন ফুটে উঠলো আলো।

"সাগরপারের জ্ঞাতি, শুভক্ষণে শ্রবণে তোমার
পশিল উদাত্তবাণী ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার।
আনন্দে বিস্ময়ে হলো বিকশিত চিত্তশতদল
বিবেক অরুণরাগে, ভোগ সুখ সম্ভোগ সকল
ধূলিসম ত্যাগ করি অকাতরে ছেড়ে পিতৃভূমি
আসিলে প্রাচীর বুকে, সুপবিত্র ত্যাগমূর্তি তুমি।
আত্মভোলা উপচিকীর্ষার
জীবন্ত প্রতিমাখানি—স্নেহ, দয়া, মমতা আধার'।

এই প্রথমদর্শন এবং তাঁর জীবনে তাঁর বিপ্লবী প্রভাবের কথা স্মরণ করে ১৯০৪ সালে মার্গারেট কোলকাতা থেকে লিখেছিলেন: "মনে কর সে-সময় উনি যদি লণ্ডনে না আসতেন! এ' জীবনটাই তা'হলে একটা কন্ধকাটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। কিন্তু আমি জানতাম কারও ডাক শুনতে পাবই। তার জন্য একটা নিরন্তর প্রতীক্ষা আমার ছিল, ডাক এল সত্যি। যদি অভিজ্ঞতা বেশী থাকত, হয়তো সংশয় হতো, জীবনে শুভলগ্ন এলেও মেনে নেওয়া হয়তো শক্ত হত। আমার ভাগ্য ভাল, আমি কিছুই জানতাম না। তাই দোটানার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছি। ... ... ভিতরে আমার আগুন জ্বলতো, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না। এমন কতদিন হয়েছে, কলম হাতে নিয়ে বসেছি অন্তরের দাহকে রূপ দেব বলে—কিন্তু কথা জোটেনি। আর আজ আমার কথা বলে শেষ করতে পারি না। তুনিয়ায় আমি যেমন আমার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, তুনিয়াও তেমনি আমারই অপেক্ষায় তৈরী হয়ে বসেছিল যেন। এবার তীর এসে লেগেছে ধনুর ছিলায়।...কিন্তু যদি স্বামিজী না আসতেন আমার জীবনে? যদি হিমালয়-শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? অন্ততঃ আমার কথা বলতে পারি...আমি তো এখানে আসতে পারতাম না"। তাঁর জীবনে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো যাঁর উদয় হয়েছিলো, সেই আচার্যের কাছে মার্গারেট চিরদিন তাঁর ঋণ স্বীকার করে এসেছেন।

ভারতের শাশ্বতবাণী তাঁর সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠলো। স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জাগালো প্রাণে এক অপূর্ব আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। কোন পরশমণির স্পর্শে মার্গারেটের জীবনে এলো এক অলৌকিক পরিবর্তন। মন যেন তাঁর বলে উঠলো,

"আমি কি এমতি রবো?
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,—
আমি কি ও পদ পাবো?"

যোগেশ্বরী ভৈরবী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন: 'তুমি অবতার'। "চৈতন্যের আবির্ভাব নিতাইয়ের খোলে"। স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভৈরবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। আর নিবেদিতা বিবেকানন্দের স্বরূপ জগতের সামনে অতি সুনিপুণ তুলিকাপাতে নিখুঁত-ভাবে রূপায়িত করে গিয়েছেন। নিবেদিতার চরিত্র চিত্রাংকনে যে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা পাই আর কারোর কাছে তা' পাইনা। এখানেই নিবেদিতার বিশেষত্ব। এই বিদেশিনী বিদুষী আইরিশ-কন্যা বিবেকানন্দের যেরূপ আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নারীশিষ্যা সম্ভবতঃ সামান্যই ছিল। যদিও তাঁর অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে, নারী-শিষ্যারূপে গ্রহণ করে তাঁকে তাঁর পূর্বসংস্কার ভুলিয়ে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। একজন আইরিশ অসামান্য বিদুষী নারীর পক্ষে ভারতবর্ষে এসে একেবারে হিন্দু হয়ে যাওয়া সহজ কথা নহে। তখন ভারতবর্ষ অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে জড়িত। বিশেষ করে ভারতীয় নারীসমাজ স্বমর্যাদা থেকে দূরে সরে এসেছে। মার্গারেটের জীবনে নতুন সুর ধ্বনিত হলো। তিনি মহাপুরুষের সংগে ভারতে আসতে চাইলেন। স্বামিজী তাঁকে বোঝালেন ভারতের বিধিব্যবস্থার ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে। এই আদর্শ গ্রহণ করতে হলে অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট বরণ করতে হবে। তাঁকে অকারণে অনেকসময় লাঞ্ছিতও হতে হবে অজ্ঞ ভারতবাসীর কাছ থেকে।

মার্গারেটের চিত্তবীণায় ধ্বনিত হচ্ছে তখন সেই মহতী শাশ্বতী বেদবাণী—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ'।

ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিতা নারী এলেন ভারতবর্ষে।

> "এদেশের নারীশক্তি যবে
> অজ্ঞতার অন্ধকারে মুখ ঢেকে কাঁদিত নীরবে,
> তোমারি দরদী চিত্ত সমদুঃখে সমবেদনায়
> উঠিল অধীর হয়ে..........."।

কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ও ধর্মের উৎকর্ষই কি তাঁকে এমন সুতীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিলো? না, শুধু তাই নয়। এ' সকলই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। কারণ এর আড়ালে ছিলেন তাঁর চির-আরাধ্য শক্তিমান গুরু বিবেকানন্দ। নিবেদিতা বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে ও বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে

ভারতবর্ষকে—হিন্দুর সমষ্টিগত আদর্শকে দেখেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী হিন্দুধর্ম, সভ্যতা, সমাজ ও পরিবার বিশেষতঃ বিবেকানন্দের অপূর্ব দেশ-প্রেমের মর্মার্থ নিবেদিতা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনিকরে অপর কোন শিষ্য তা' হৃদয়ংগম করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে গড়ে তুলেছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি নিবেদিতাকে তাঁর বিরাট চিন্তার ও কার্যের সহায়িকারূপে গড়ে তুলেছিলেন। ওঁদের দু'জনেরই দু'জনকে প্রয়োজন। আচার্যের প্রয়োজন শিষ্যাকে আপন আদর্শের উপযোগী করে গড়া, শিষ্যার প্রয়োজন তার বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভাকে এক লক্ষ্যে একাগ্র করে তোলা।

নিবেদিতার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার আগেই বিবেকানন্দ তাঁকে তাঁর স্বদেশের কল্যাণময় কার্যের উপযোগী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন:

> "I have plans for the women of my conntry in which you, I think, could be of great help to me".
>
> "I will stand by you unto death, whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it. The tusks of the elephant come out but they never go back. Even so are the words of a man".
>
> —*The Master as I saw Him.*

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র-চিন্তা স্বদেশপ্রেম নারীজাতির উন্নতির জন্য তাঁর আদর্শই শুধু নিবেদিতা পর্যবেক্ষণ করেননি—তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি ভংগী নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি আহ্বান কানপেতে শোনেন তিনি। তাঁর বুক দুলে ওঠে। অজস্র কথা ভিড় করে আসে মনের বেলাভূমিতে। বিবেকানন্দকে নিবেদিতা যে চোখ দিয়ে দেখেছিলেন ও যেরূপ উচ্চভাবে ও অনবদ্য ভাষায় তিনি সেভাব প্রকাশ করেছেন তা' অতুলনীয়। নিবেদিতার ভেতর দিয়ে আমরা যে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পাই তা' সম্পূর্ণ স্বামিজীর রূপ! সেভাবে না দেখলে আমাদের তাঁকে দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

ভারতবর্ষে আপনার সত্তাকে বিলিয়ে দিলেন নিবেদিতা। গ্রহণ করলেন তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে শত দুঃখ, শত গ্লানি আর শত বেদনা। 'ভারতবর্ষ' 'ভারতবর্ষ' মন্ত্র জপে কাটলো তাঁর দিনগুলো। ভারতীয় আদর্শে সঞ্জীবিত জীবনের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন তিনি। যে মহান্ ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন তাপসী নিবেদিতা, তারজন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি। গুরু উদাত্তকণ্ঠে বললেন: "ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে

নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীমপ্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে"। স্বামী বিবেকানন্দ চান মুক্ত বিহংগীর মতো আকাশে পাখা মেলবেন নিবেদিতা। তিনি বললেন: "তোমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমার মাঝে থাকা প্রয়োজন তা' নেই। তাকে জাগাও, তাকে জ্বালাও! শিব! শিব!"

নিবেদিতার নিজের চেয়ে গুরু তাকে বেশী চিনতেন। কোন্ ধাতুতে নিবেদিতার চিত্ত গড়া সে তাঁর জানা ছিল। সেজন্যই তো তিনি ধরা-বাঁধা উপাসনার দায় থেকে নিবেদিতাকে রেহাই দিতে চেয়েছিলেন। নিয়ে গেলেন তাঁকে তীর্থে। অতি বিচিত্র পুণ্যভূমি এ' ভারতবর্ষ! সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা, অসংখ্য নদ-নদী-বিধৌতা ভারতভূমি। ভারতমাতার চরণতলে অসীম-অতল মহাসাগর অধীর আবেগে যুগ-যুগান্ত ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর ধ্যান-গম্ভীর শুভ্রতুষারাবৃত হিমগিরি যোগাসনে গভীর তপস্যায় আত্ম-সমাহিত। একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলামনোহর মহাদেব যেন সতীদেহ-স্বরূপা ভারতবর্ষকে নিজের কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কি অপরূপ রূপ! এই অনন্তের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করে নিবেদিতার হৃদয় ভরে উঠলো। তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন:

> "অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষঙ্গ জটাধরায়।
> জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়" ॥

হিমালয়ের বিরাটত্বের স্পর্শে নিবেদিতা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখতে পেলেন। সেই গম্ভীর পরিবেশে তিনি শ্রীগুরুর মুখে শুনলেন ভারতবর্ষের কত শত পুণ্য কাহিনী। নিবেদিতার সারা হৃদয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠলো অনির্বচনীয়ের মধুর সুর।

তিনি বুঝতে পারলেন স্বামিজী কেন তাঁকে এখানে এনেছেন—

> "কর্মের কলরব ক্লান্ত,
> কর তব অন্তর শান্ত"।

এই অন্তর্মুখীতাই হলো ভারতবর্ষের পরমসম্পদ। জীবনের কর্মমুখরিত দিন-গুলোর ভেতরে এই অন্তর্মুখীতাই আনবে পরম আনন্দ আর চরমশান্তি।

নিবেদিতা অনুভব করলেন স্বামিজীর মনের ভাব—চিত্ত সমাহিত করলে তবেই কর্মে অধিকার জন্মে। নিবেদিতার মনপ্রাণ যেন এক অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতিতে থর থর করে কাঁপতে থাকে। প্রকৃতির লীলানিকেতন সমগ্র

উত্তর ভারত ভ্রমণ করে নিবেদিতা ফিরে এলেন—সংগে করে নিয়ে এলেন চিত্ত-সমাহিত করবার সম্পদ। কাজে নামিবার আগে তিনি স্টেশন থেকে একলাই চলে এলেন বাগবাজারে সারদেশ্বরীর বাড়ীতে। মায়ের কাছে একটু আশ্রয় চান নিবেদিতা। "ফল আর ছায়া দুই-ই দিতে পারে এমন বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় নিতে হয়। ভাগ্যে যদি ফল না-ই জোটে, আমাদের ছায়া পাবার আনন্দ কেড়ে নেবে কে ?"

স্বামী বিবেকানন্দ এ'কথা মিষ্টার ষ্টার্ডিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। সারদাদেবীর পায়ের তলায় তপস্যা আর সাধনায় অন্তর্মুখ হয়ে নিবেদিতার দিন কাটতে লাগলো। শ্রীমায়ের সংগে নিবেদিতা একতনু একপ্রাণ হয়ে যেতেন। তাঁর প্রতিটি ভাবে ও ভংগিমায় মায়ের কাছে আত্মনিবেদনের আকুতি ফুটে উঠতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীমা আসন থেকে উঠতে যাচ্ছেন, নিবেদিতা এসে প্রণাম করলেন। দৃঢ়সংকল্পের আভা নিবেদিতার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। শ্রীমা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন: "এবার তোমার কাজে নামবার সময় হয়েছে…"। বোসপাড়া লেনের ষোল নম্বর বাড়ী। ভেতরটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে।

অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানে নিবেদিতা নির্বাচন করলেন আপন কর্মক্ষেত্র। অনাড়ম্বরের মাঝেই আছে প্রাণের স্পর্শ। অজ্ঞতা, মূর্খতা দীনতা ও হীনতার মধ্যেই প্রকাশিত আছে সেই "শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্"। অনাদৃত মানুষের মাঝেই খুঁজে নেবেন তিনি তাঁর চির-আরাধ্য দেবতাকে। কবির সুরে প্রতিধ্বনি তুলে আমরাও বলি—

"রুগ্ন বিপন্নের বন্ধু, করে নিলে পরকে আপন,
পরার্থে স'পিলে নিজ চিত্ত দেহ, জীবন যৌবন।
দুঃসময়ে দুর্ভিক্ষে মারীতে
নগ্নপদে পথ চলি পীড়িতের ব্যথা নিবারিতে
যোগালে ঔষধ পথ্য,—নিত্য আত্মভাবনা রহিতা,
মানব মঙ্গলরতা হে মঙ্গলময়ী নিবেদিতা"।

স্বামিজী সাধারণের সংগে নিবেদিতার মেলামেশার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি, বরং সাধারণের সহানুভূতি যাতে তার ওপর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সে-ব্যবস্থাই করলেন তিনি। অনেকের সংগে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। মাসখানেক পরে তিনি বললেন: "এখন তুমি সবার সংগে দেখা সাক্ষাৎ ছেড়ে অবরোধ বাসিনী হও"। ভদ্রঘরের হিন্দু বিধবার মতো জীবন কাটানোর পরিবর্তে

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীদের জন্য যে সমস্ত নিয়ম আছে, আপাতত স্বামিজী নিবেদিতার জন্য সেগুলোই নির্দিষ্ট করে দিলেন। উপদেশ তিনি অল্পই দিতেন। এমনি করে নিবেদিতার বাইরের জীবনটাকে তিনি পরিচালিত করবেন, আর বাকীটুকুর জন্য নিজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁকে। বললেন: "নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে চেষ্টা কর, মনের সবরকম চাঞ্চল্য দূর কর, মুখের ভাব হোক নির্বিকার"।

স্বামিজী-নির্দিষ্ট এসব অনুশাসনে অভ্যস্থ হবার জন্যে নিবেদিতা সুদীর্ঘ সময় তাঁর নির্জন ঘরটিতে উপাসনা ধ্যান-ধারণাদিতে কাটাতেন। দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করে তাঁর বুক গভীর আনন্দে ভরে ওঠে, আবার কখনও-বা কত সময় উদ্বেগ ও নৈরাশ্যে মন ছেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন সময় এলো, যখন ধ্যানীচিত্তের বিরোধী সব চিন্তাকে নির্জিত করতে পারলেন নিবেদিতা: "নিজেকে নিয়ে নির্জনে মৌনী থাকা যায় যদি, আত্মার অপৌরুষেয় মহিমার উপলব্ধি গভীর হয়। ব্যক্তিগত যত কিছু সঙ্কীর্ণতা আর বক্রতা, সবই যেন আপনা-আপনি সরল হয়ে মিলিয়ে যায়"।

ভারতীয় জনগণের সংস্পর্শে এসে নিবেদিতার অন্তরে জাগতো গভীর উচ্ছ্বাস। ভারতের মানুষ যেন তাঁরই আপনজন, এমন সুতীব্রভাবে তিনি এই অনুভূতি উপলব্ধি করতেন যে তাঁর যেন চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হতো: "ওগো পথিক, আমিও তোমাদের সবার আত্মীয়; যে-ধূলায় তোমরা ধূসর, আমারও দেহ দগ্ধ করছে সেই ধূলার তাত, তোমাদের মত কঠিন শ্রমে আমারও আঙ্গুল ফেটে রক্ত ঝরছে। ভিস্তিওয়ালা যে জল নিয়ে চলেছে তার ভারে আমারও পিঠ নুয়ে পড়ছে। তবুও আমি তোমাদের মাঝে থেকেই আনন্দে আছি। দেবতার মুখ চেয়ে জীবন কাটে তোমাদের। ওগো পথিক, আমাকেও অমনি করে ইষ্টের মুখপানে চেয়ে হাসতে শেখাও"।

> "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
> সেবাধর্ম রূপায়িত হলো তব পূণ্য জীবনের
> প্রতি কর্মে: মর্মে মর্মে বুঝে নিলে বেদান্তের বাণী,
> "যত জীব তত শিব"—গীতাপাঠে তুমিই কল্যাণি,
> জানিতে পারিলে শুধু ত্যাগী আর ত্যাগের মহিমা,
> ফলাকাঙ্খাহীন কর্মসাধনার কি যে মধুরিমা"!

নিবেদিতা এদেশে প্রথম মরণকে দেখলেন। গুরুকে তিনি বললেন। স্বামী বিবেকানন্দ মন দিয়ে শুনলেন। বললেন: "এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে

এসেছিলেন। তিনিই জোর গলায় বলে গেছেন, সকলের সঙ্গে অন্তরের ভাষায় কথা কইতে হবে। ......মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখ, ভয়ঙ্করের পূজা কর! দেবতা যেন বৃত্তের মত। সব আঁধারেই তাঁর কেন্দ্র, কিন্তু পরিধি কোথাও নাই। মৃত্যু আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে স্থিতিমাত্র। জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে দেখতে শেখ। রুদ্রের অর্চনা কর; মার্গট" নৌকা করে নিবেদিতা বাগবাজারে ফিরে এলেন। মনে হল, মাঝির সামনে নৌকার গলুইতে মৃত্যুপতি যমকে দেখছেন তিনি। সাতরঙ্গাদিনের সূতোয় বোনা তাঁর রাজবেশ, ঐ তো বসে তিনি! এই-যে নিবেদিতার আশেপাশে অগণ্য জীবের মেলা, সবাই কি তবে ওঁর প্রজা? এই বিশ্বপ্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য মানুষ, পশু-পাখি, তরুলতা, পৃথিবী সবই স্পন্দিত হচ্ছে এক প্রাণের স্পন্দনে। এরা যেন মৃত্যুকে ডেকে বলছে: "হে যম, শুধু তুমিই পার আমাদের বাঁধন কাঁটতে"। আলো ঠিকরে পড়ছে নদীর জলে, কলকলতানে ঢেউয়েরা যেন গুরুর বাণীই আউড়ে চলেছে: "মৃত্যুকে ভালবাস, মার্গট, রুদ্রের অর্চনা কর"। নিবেদিতা কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে-প্রাণ সাধনায় রত, তার কোন অবসাদ নেই, শ্রান্তিও নেই।

নিবেদিতার জীবনের কর্মমুখরিত অগণিত দিনগুলো নির্জনে অপ্রশস্ত পল্লীর মধ্যে কেটে গেছে। প্রাণ ঢেলে বিদ্যালয় গড়ে তুললেন তিনি। কিন্তু দারুণ অর্থাভাব। অর্থ ভিক্ষাও সহজ নয়। সহজ না হলেও তা' সফল করতেই হবে। ভগিনী নিবেদিতা তখন একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের মধ্যে যে মহান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন, তা' দেশবাসীর পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব হয়নি। মনে পড়ে স্বামিজীর বাণী: "মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা কাজের মত কাজ। তাদের উদ্‌বুদ্ধ কর। ইউরোপীয় নারী কাপুরুষকে ঘৃণা করে, তারাই ওদের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে। বাঙ্গালীর মেয়েরা কবে তাদের মত পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মম বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করবে?"

"..........হে বিদুষী, মায়ের মায়ায়
বসুপাড়া নিজালয়ে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপন
মূকমুখে ভাষা দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিয়া আপন
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার,
'নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি'—বুঝে নিলে সার।
'ধর্ম শুধু কথা নয়—কাজ'
এ'তত্ত্ব তোমারি মাঝে মূর্ত হয়ে করিবে বিরাজ"।

মানুষকে ভালবেসে তার সেবা করে নিবেদিতা বিরাট ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছেন। সুযোগ বুঝে স্বামিজী এবার নতুন এক ত্যাগের মন্ত্র দিলেন তাঁকে। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন কর্মের কোন্ আদর্শ নিবেদিতাকে গ্রহণ করতে হবে। "ভালবাসাকে ছাপিয়ে ওঠে যে কর্ম তাকে চিনে নাও। সৃষ্টির আনন্দে নির্ঝরিত স্রষ্টার যে-প্রেম, তাই তাঁর কর্ম"।

নিবেদিতা বললেন: "স্বামিজী, আমি শেষের ব্রত দীক্ষা নিতে চাই"। স্বামিজী উত্তর দিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষায় আছেন"। এদিকে আত্মসচেতনতা যতই নিবেদিতাকে পরম গুরুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ততই তাঁর দিশারী যে-গুরু তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন।

সাধনালব্ধ শক্তি নিবেদিতাকে জীবসেবায় নিয়োজিত করতে হবে। সব বিষয়ে সচেতন থেকেও তিনি দীন হতে শিখেছেন। গুরুর হাতে তিনি খেলার পুতুল, তাঁর প্রতিটি কথা মেনে চলাই নিবেদিতার প্রধান কাজ। তিনি অপরিগ্রহ ব্রহ্মচর্য ও ব্রতনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হলেন। নিবেদিতা বন্ধু 'য়ুমের' (মিস্ ম্যাক্‌লয়েড) কাছে নিজের অন্তরের আকুলতাকে ছন্দে রূপ দিলেন,

'হে তেজঃস্বরূপ! আমায় তেজ দাও!
তুমি শক্তিস্বরূপ, আমায় শক্তি দাও!
বজ্র-বীর্যে উদ্বোধিত কর আমার,
জীবন-ব্রত পালন করবার শক্তি দাও'।

তারপর লিখলেন: "মনে হয় দু'টি কারণে উনি আমায় নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারিণী করলেন। প্রথমত, প্রাচীন প্রথাটা আবার চালু করতে চান। দ্বিতীয়ত, তাঁর দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় আর কিছু পাওয়ার জন্য প্রস্তুত নই আমি। এটা সত্য কথা। কখনও যদি-এর পরের স্তরে যেতে হয়, তার জন্য সব রকমে নিজেকে প্রস্তুত করেই তাঁর কাছে আসব'। তাঁর অন্তর বলে উঠলো আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে—'তাঁর মহিমাই প্রকাশিত হবে আমার মাঝে, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে'। নিবেদিতা অনেকবার কল্পনা করেছেন স্কুলটি কিভাবে করবেন। স্বামিজীর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি একটু হেসে বললেন: "তোমার কাজ তুমিই কর। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তা' তো ভালই, এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই হল আসল কথা। তিনি খৃষ্টান, মুসলমান কি পারিয়ার সংগে খেয়েছেন, তাদের পোষাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সব শিখতে পারবে। এর পরে—অনেকদিন পরে—পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার

কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে"।

নিবেদিতা শিক্ষাদাত্রী হলেন। দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত সংস্কারে জড়িত সুপ্ত আনন্দময়ের সত্তাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই উদ্দেশ্যে এক অভিনব উপায় উদ্‌ভাবন করলেন তিনি। ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস বলে যেতে লাগলেন মেয়েদের কাছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, রাণী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপরূপ জীবন-কাহিনী তাদের মনের নিভৃত কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে পড়লো। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন ভারত-নারীর সুপ্ত অন্তরাত্মা জাগরিত হয়ে উঠলো। হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি ও দরদ উজাড় করে নিবেদিতা সে-সব পুণ্য-গাঁথা বলতেন আর নিজেও এক গভীর ভাবরাজ্যে বিভোর হয়ে যেতেন।

ভগিনী নিবেদিতা সকলের মনেই আলোড়ন তুললেন। দেশে তখন ধর্মের বিভিন্ন মতামত নিয়ে বিরুদ্ধতা জেগেছিলো। ব্রাহ্মসমাজীরা ভাবতেন, এদেশের জনসাধারণ স্থূল পূজার্চনা করে, তাদের আধ্যাত্মিক গতি মন্থর। এর তুলনায় ব্রাহ্মসমাজে শুদ্ধচিত্তে উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক সাধনার চরমকথা বলা চলে। কিন্তু নিবেদিতা গুরুর দিকে রইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন: "একটা জাতিকে বুঝতে হলে তার সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষ পৌত্তলিক? সে যা তা-ই থাক, আমাদের কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা"। স্বামিজীর যুক্তিকে নিবেদিতা সমর্থন করতেন। দেবতার সান্নিধ্যলাভের জন্য জনসাধারণের প্রাণের সুগভীর আকুলতা দেখে তাঁর মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠতো। তিনিও দেবতার পায়ে মাথা নত করে বলেন: "হে দেবতা, 'তুমি দুর্জ্ঞেয়। তোমার যতটুকু বুঝেছি, যা পেয়েছি হাতের মুঠোয়, তারই অর্চনা করি। অপূর্ণ মানুষ আমি, এর বেশী আর কী করতে পারি?"

অধ্যাত্মজীবনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিবেদিতা নিবেদন করে দিয়েছিলেন গুরুর কাছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ছিল তাঁর আশ্চর্য স্বচ্ছ ও শাণিত বিচারবুদ্ধি। তাঁর অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাসের ধারাটি উচ্ছল। নিবেদিতা মনে মনে ভাবেন: "নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো বয়ে চলেছে এ-জিনিস, এক খাত হতে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে নির্ঝরের তুষার শীতল প্রবাহ। সে-প্রবাহিণীতে সকল পাত্রই পূর্ণ করা চলে, তা' সে স্ফটিকেরই হোক আর মাটিরই হোক। তারপর অমূল্য সম্পদের মতো আপন ঘরে বয়ে আনা তাকে। অরুণরাগে যেমন করে ফুলপাপ্‌ড়ি মেলে তেমনিকরে হৃদ্‌পদ্ম ফুটে ওঠে গুরুর ছোঁয়ায়..."।

ব্রাহ্মসমাজের একটি লোককে দেখে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট হয়েছিলো। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি সত্যান্বেষী। জগদীশচন্দ্র বসু আর নিবেদিতার জীবনব্যাপী সৌহার্দ্য একটা আশ্চর্য জিনিস! দু'জনেই যাঁর যাঁর আদর্শ রক্ষা করে চলেছেন।

ধ্যানের নিভৃত প্রদেশে তলিয়ে নিবেদিতা নিজেকে চিরে-চিরে দেখেছেন। মায়ের কাছে যাবার কথা ইংগিতে বলেন গুরু। কিন্তু কোথায় সেই পথ? স্বামিজী শুধু বলেন: "নিজেকে সঁপে দাও তাঁর কাছে"।

সত্যি স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-মরণ-সমস্যার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন নিবেদিতাকে। তিনি শুধু আপন সত্তার গভীরে উপলব্ধি করতে চান একটিমাত্র জিনিস—তাঁর প্রাণস্পন্দন। নিজেকে বিলোপ করে আকুল হয়ে ডাকেন মাকে: "জয় মা কালী, জয় মা কালী"—এই তাঁর মন্ত্র। ধ্যান করতে গিয়ে নিবেদিতার মন পূর্ণতায় ভরে ওঠে। বলেন: "মা, মা, আমি তোমার দাসী, তোমায় তুষ্ট করবার মতো কিছুই জানি না। প্রাণ ঢেলে শুধু তোমায় ভালবাসি"।

স্বামিজীর সব ভাবনাই সব উপদেশই নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে ঘুরতো। গুরুর উপদেশ শুনতে শুনতে নিবেদিতা ভাবেন: "আমি তো মুক্ত, আমার সংকল্প নেই, বাসনা নেই......"। সংগে সংগে আতংকে শিউরে উঠতেন নিবেদিতা: "একলা এগিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে কি?" একমাত্র ভাই মৃত্যুশয্যায়—খবর পেয়ে মিস্ ম্যাক্লয়েড গেছেন ক্যালিফর্ণিয়ায়। তাঁকে লেখা নিবেদিতার একখানা চিঠি থেকে বোঝা যায়, এই সময় স্বামিজী তাঁর মধ্যে কিভাবে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। "সকালে নীচে নেমে এলাম। স্বামিজী ঘণ্টা দেড়েক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করতে করতে তথাকথিত ভদ্রতা সম্বন্ধে আমায় সতর্ক করে দিতে লাগলেন। "কী মিষ্টি, কী সুন্দর"—এসব বাঁধি গৎ চলবে না, আর অনবরত এই বাইরের দিকে নজর। ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো। নিজেকে যখন জানতে পারবে, তখন আকাশ হতে বজ্রের মতো ভেঙে পড়বে দুনিয়ার উপরে। যারা বলে 'আমার কথা কি কেউ শুনবে?' তাদের উপর আমার কোন আস্থা নাই। কিছু বলবার মত পুঁজি যার আছে তার কথা না শুনে ফিরিয়ে দিতে দুনিয়া এপর্যন্ত পারে নি। নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এ'করতে পারবে? পারবে তুমি? যদি না পার তো হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এস"। বলেই শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর আবৃত্তি করে চললেন, তার শেষে চর্পট পঞ্জরিকার সেই ধুয়া: "ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে"! কখনও-বা তাকে পাল্টে করেন: "মার্গট, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে"!

স্বামিজী গম্ভীরকণ্ঠে নিবেদিতাকে সতর্কবাণীও বলেন : "এখন বুঝেছ, শিবই পরম গুরু। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি শিক্ষা দেন, অজ্ঞান্ নাশ করেন। তাঁকেই সব কর্ম সমর্পণ করতে হবে। নইলে সুকৃতিও বন্ধন হয়ে ওঠে, তা' হতেও কর্মের সৃষ্টি হয়। নিত্যবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব। জগতের হলাহল পান করেন বলে তিনি নীলকণ্ঠ। অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ শুধু তিনিই।.........জীবনের তারুণ্যকে উৎসর্গ করা কী যে কঠিন! বৃদ্ধবয়সে আত্মত্যাগ করতে আসে যারা তারা নিজেদের মুক্তির পথ সাফ করে বটে, কিন্তু অন্যের গুরু হতে পারে না। যৌবন-মধ্যাহ্নে যে নিজের জীবন ডালি দিতে পারে সে-ই ধন্য, সে-ই তো সদ্‌গুরু"।

নিউইয়র্কে যাবার আগে, স্বামী বিবেকানন্দের আনন্দঘন প্রশান্ত মূর্তি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। দু'বাহু প্রসারিত করে তিনি বললেন: "আমার সন্তান তোমরা, আমি এসেছি, এই যে আমি…"। নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলয়েডকে একটি চিঠিতে এই দৃশ্যটি বর্ণনা করে লিখেছেন: 'সূতী পোষাকটা আলখাল্লা উড়ানির মত করে ধীরামাতার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বললেন: "আজ থেকে তুমি সন্ন্যাসিনী"। তারপর আমাদের দু'জনের মাথায় হাত রেখে বললেন: "পরমহংসদেব আমায় যা-কিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাদের দিয়ে দিলাম। একটি নারীর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা' তোমাদের দু'জনকেই দিলাম—দিলাম নারীকেই। এ নিয়ে যা' পার কর…"। গুরুকে প্রণাম করতেই তিনি নিবেদিতার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এই পরমমুহূর্তে নিবেদিতা নিজের গভীরে অনুভব করলেন তারায় তারায় আলোর কম্পনের মতো একটা সর্বব্যাপী বিরাট শক্তির স্পন্দন। তখন তাঁর মনে হচ্ছিলো, যেন তাঁর মাথার উপরে বীর সন্ন্যাসীর উষ্ণস্পর্শ আর তাঁর হাতখানা হতে যেন শক্তির বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে।

সম্পূর্ণ চেতনা নিয়েই নিবেদিতা জীবনের চরম ব্রত গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা শুধু গুরুর বাণীই মনে মনে আবৃত্তি করেন: "মনে রেখো, তুমি শুধু মায়ের দাসী"।

তিনি পাশ্চাত্য দেশে ঘুরে ঘুরে বললেন শান্তির বাণী। একটা নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিবেদিতা মনে মনে ভাবেন: "এই যে কাজ করছি এর মধ্যে ফলাকাংখা কতখানি ঢুকেছে? ভারতের মেয়েদের জন্য যে ভিক্ষা করছি তা' কি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবেই করছি? মাগো! শুধু সেবা করবার আনন্দেই যেন যুগের পর যুগ সেবা করে যেন যেতে পারি"।

এই-ই ছিল নিবেদিতার অন্তরের প্রার্থনা। স্বামিজী বললেন: "...অন্তরের অন্তস্তলে ডুবে যাও। সংস্কারের সকল ছাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে, তবেই না কূল ছাপিয়ে ছুটবে আলোর নির্ঝর। তখনই তোমার সব আয়োজন পূর্ণ হবে। যে পাঁকের ছোঁওয়ায় আজ তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়ে গড়বে প্রতিমা, তাতে সঞ্চার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বস্তুকে দাম দিও না। তুমি শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চল"। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শতবার মনে মনে উচ্চারণ করেন নিবেদিতা: "তুমি কেবলই সৃষ্টি করে যাবে—"। মিস্ ম্যাকলয়েডকে নিবেদিতা লেখেন: "স্বামিজী যে-আঘাতে আমায় ছিটকে দিয়েছেন তা' আমার পাওনা বটে...ও একরকম ভালই হয়েছে"। "ভাবীযুগের হিন্দুনারীর স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাদের জন্য আর তাঁর জন্যই আমায় বেঁচে থাকতে হবে, এছাড়া আর কোনও অবলম্বন আমার নাই ..."। মিসেস্ বুলকে লেখেন: "মানুষের সবচেয়ে বড় আকাংখা হ'লো জ্ঞান লাভ করা। জানতে চাই। বৃহৎ কেউ আছে। এমন কারও সন্ধান চাই যিনি সকল দুর্বলতার উর্ধে। তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁর খবর জানি না, এ খুবই ঠিক কথা। স্বামিজী অলৌকিক উপায়ে সে-জ্ঞান যদি আমাতে সঞ্চারিত না করেন তা'হলে নিজে থেকে তার নাগাল পাব এমন আশাও রাখি না। এখন এইখানে এসে ঠেকেছি। শুধু বাইরের দুনিয়া আর তিনি, আর সবকিছু তিক্ত চিত্তে সয়ে যাওয়া। যা চাই তা' কি দেবেন তিনি? দেবেন কি? হায়রে... "আজ চুপি চুপি বলি তোমায়, দিতে তিনি পারবেন না। এর আগে ওঁকে চেষ্টা করতে দেখেছি আমি। সত্যকে লাভ করেছেন তিনি, দেওয়ার শক্তিও রাখেন। কিন্তু আমার নিজেরও কিছু করবার আছে। অথচ সে-সাধ্য আমার নাই, সত্যি নাই। এমন চাওয়া কি জেগেছে যার জন্য হেন জিনিস নাই যা'ছাড়া না যায়? নিজের ভাবনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বাসনা-লালসা একি কেউ ছাড়তে পারে?"

নানা প্রশ্নের সংঘাতে নিবেদিতার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নিজের উপর ধিক্কারে তাঁর চোখে জল আসে। নিবেদিতা ভাবেন: "মুক্তা তুলে আন্‌তে পারব কি?...কোথায় সেই শুভ্র-শুচি অজানা রত্নের ঝলক? মুক্তা যদি খুঁজে পাই, নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বরে, মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দেব"। স্বামিজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে বললেন: "...শক্তিধর পুরুষ কর্মী তৈরী করে দূরে সরে যান,—এই নিয়ম। কারণ, তিনি কাছে থাকলে তারা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না। আমি এখন তোমার কেউ নই। আমার যা' শক্তি ছিল তা' তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি এখন শুধু সন্ন্যাসী। এক শ্রেণীর

মুসলমান আছে, তারা এমন ধর্মান্ধ যে শিশু জন্মাতেই তাকে বাইরে ফেলে রেখে বলে: "ভগবান যদি তোকে বানিয়ে থাকেন তো মর, আর আলি যদি তোকে প্রাণ দিয়ে থাকেন তো বাঁচ"। "নবজাতককে তারা যা' বলে, আমিও আজ রাত্রে তোমায় তাই বলছি—অবশ্য উল্টো করে। যাও, জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি যদি তোমায় গড়ে থাকি, তুমি টিকবে না। আর মা যদি তোমায় গড়ে থাকেন, অমৃতা হবে"।

কম্পিত হৃদয়ে নিবেদিতা মনে মনে বলেন: "আমি চললাম। গুরু আমার! রাজা আমার! পিতা আমার! তোমার জয় হোক। তোমার করুণার তোমার মহিমার পারাপার দেখি না দেবতা। এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে হাত রেখেছেন আমার মাথায়"।

বন্ধুদের কাউকে না জানিয়ে নিবেদিতা লণ্ডন থেকে ভারতের পথে রওনা হলেন। স্বামিজীর অসুস্থতার খবর পেয়েছেন তিনি। নিবেদিতার ভারতে প্রত্যাবর্তন স্বামিজীর পক্ষে এক বিজয় গৌরব যেন। "স্বেচ্ছায় ও-মেয়ে ভারতের জন্য কাজ করতে এসেছে। ওর স্বচ্ছ দৃষ্টির আলো কী যে ভালো লাগে·। সত্য-স্বরূপকে আপন অন্তরে খুঁজে পেয়েছেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দ তাঁকে দেখেন নিবেদিতার দৃষ্টিচ্ছায়ায়। তাই তিনি আসতেই নিজের পাশে সসম্মানে তাঁকে ঠাঁই দেন"।

তীর্থভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন ভাঙা শরীর নিয়ে। সকলেই বুঝলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। স্বামিজী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন: "স্নেহের নিবেদিতা, অফুরন্ত শক্তির আঁধার হও। স্বয়ং জগদম্বা তোমার দেহ-মনে আবিষ্ট হোন। তোমার মাঝে চাই দুর্নিবার বিপুলশক্তির উদ্বোধন। আর সেই সংগে অসীম শান্তিও। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্যের ঠাকুর হন, আমায় যেমন তিনি চালিয়ে নিয়েছেন, তেমনি করে তোমায়ও চালিয়ে নিন···না, তার চাইতেও হাজার গুণে সার্থক করুন তোমায়"। বুধবার। একাদশী। নিবেদিতা ব্যাকুল হৃদয়ে গুরুকে দেখতে এলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়লো। স্বামিজী নিবেদিতার যাওয়ার পরে তাঁর হাত ধুইয়ে দিলেন। পরিপূর্ণ অমৃতের ঘট বহন করে নিবেদিতা ফিরে এলেন। সকালে একজন সাধু স্বামিজীর তৈরী পাঁউরুটি নিয়ে এলেন নিবেদিতার কাছে। তিনি লক্ষ্য করলেন, রুটি খানিকটা। "এ যে প্রসাদ! গুরু তাঁকে ভাগ করে দিচ্ছেন ঠাকুরভোগের"। রুটীখানি অসীম শ্রদ্ধাভরে কপালে ছুঁইয়ে নিবেদিতা মনে মনে বলেন: "স্বামিজীর মানস-কন্যা হয়ে আজ ধন্য আমি"।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই—স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ-তিথি। চিতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা বসে থাকেন: "ঠাকুর, এ-জীবনের সব কাজ নিয়ত যেন তোমারই অন্তরের কামনাকে রূপ দিতে পারে, আমার নয়। হর! হর! শিব! শিব! * * ... তাঁর কর্ম-গৌরবের প্রমাণ দেওয়ার জন্য একজনকারও বেঁচে থাকা দরকার। তাঁর বোঝা তাঁরই হয়ে বইতে চাই আমি, আর কিছু চাই না। যদি নিয়তির বিপাকে পথভ্রষ্টও হই, তুমি তো জান, আমি তোমারই থাকতে চেয়েছি চিরকাল......"। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো পৃথিবীতে। সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রধ্বনি উঠলো চারদিকে।

নিবেদিতা উঠলেন। বললেন: "সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা উপাসনা করছেন, কিন্তু আমার সময় কই! আমায় বিশ্বাস করে একটা ব্রতের ভার দিয়ে গেছেন তিনি। আমার কেবল কাজ করা আর দেখে যাওয়া...প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"।

স্বামিজীর মহাপ্রয়াণে নিবেদিতা নিজেকে হারিয়ে ফেললেন না। বিরাট কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। গুরু যে শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য দিয়ে ছিলেন তাঁকে, তার সত্যিকার মূল্য উপলব্ধি করলেন। স্বামিজী তাঁকে কর্ম-যোগিনী করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে ব্যক্তিত্বের অহংটাকে ত্যাগ করতে শিখিয়ে ছিলেন গুরু। তারপর বাধ্য করেছেন আত্মসমর্পণে। সকলের শেষে দিয়েছেন পরিপূর্ণ জিতাত্মার আদর্শ ও আত্ম-কর্তৃত্বের সাধনা। এখন নিবেদিতা একা নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে অনুভব করেন, কেন তাঁকে গড়ে তুলতে স্বামিজী এত আয়াস স্বীকার করেছিলেন। এই ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবেদিতা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত-দীক্ষার শান্তি খুঁজে পেলেন।

নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে ছিল এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। জাতির মধ্যে তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করলেন। দৈহিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যেও তিনি দিনের পর দিন গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরাধীনতার গ্লানি দূর করবার জন্য যখন দেশের তরুণদের বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিলো, তখন তিনি সব দুর্দশা সহ্য করে তরুণদের প্রাণে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন।

এদিকে ভগিনী নিবেদিতার দেহ ক্ষীণ হয়ে এলো। তিনি এলেন শৈল-শিখরে। কর্মক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়াই ছিল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাকালের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ।

- তপস্যা সাংগ হয়েছে। শিব-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখানেই পূর্ণবিরতি। অন্তরে অনন্ত শান্তি নিয়ে শুভ্র তুষারের কোলে মিলিয়ে গেলেন মহাশ্বেতা ভগিনী নিবেদিতা—

...……"হে ব্রহ্মবাদিনি !
অমৃত-আস্বাদ-ধন্যা অমরাত্মা মৃত্যুবিজয়িনী।
তোমারে স্মরণ করে আজও সারা ভারতবাসীর
অন্তর পবিত্র হয়, শ্রদ্ধাভরে নত হয় শির"।
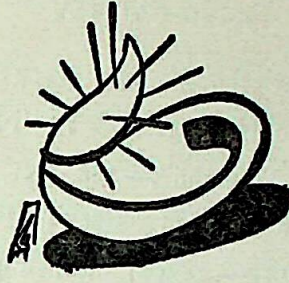
। সপ্তদশ অবদান ।

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ॥

স্বামী বিবেকানন্দের দেশব্যাপী জন্মশতবার্ষিকীর দিনে আমরা তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতার কথা স্মরণ না করে পারি না। নিবেদিতাকে তাঁর আচার্যদেবের পরমাশ্চর্য জীবনের সার্থক উপসংহার বলা যেতে পারে, কারণ, সেই বীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবনের অসমাপ্ত কর্ম বা চিন্তা, তাঁর এই শিষ্যাটির কর্ম ও চিন্তার মধ্যেই একটি সুষ্ঠু পরিণতি ও পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল। বাঙালী তথা ভারতবাসীর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্থান, এবং আমাদের কর্মে ও চিন্তায় তাঁর ভাবধারার যে প্রভাব আমরা অনুভব করি (অন্তত অনুভব করা উচিত, বললেই ঠিক হয়), ভগিনী নিবেদিতা-সম্পর্কেও ঠিক সেই একই উক্তি নির্ভয়ে করা যেতে পারে। আমি এই মহীয়সী মহিলার জীবন-কথা আলোচনায় যখন সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন থেকেই এই নারী-চরিত্রটি আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করে। নিবেদিতার কথা যেন শতমুখে শতবার কীর্তন করেও শেষ করা যায় না। বিবেকানন্দকে বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে নিবেদিতাকে বুঝতে হয়, এই কথাটা আমরা যেন বিশেষভাবে মনে রাখি।

সন্ন্যাসীর জীবনকাব্যের সবচেয়ে সুষমামণ্ডিত অধ্যায় নিবেদিতা। বিবেকানন্দের ভারত-স্বপ্নের মূর্তিমতী প্রতিমা এই বিদেশিনী মহিলা। এই বিদুষী আইরিশ মহিলাকে যখন তিনি লণ্ডনে প্রথম দেখেছিলেন, তখন তার সঙ্গে পরিচিত হোয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। লিখেছিলেন এক পত্রে : "ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে, তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতো শক্তিময়ী একটি নারী চাই"। মিস মার্গারেট নোবেলের মধ্যে বিবেকানন্দ এই শক্তিময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ করেই তাঁকে গ্রহণ করে নির্মাল্য হিসাবে নিবেদন করেছিলেন ভারতমাতার বেদীমূলে। এঁর শিক্ষা,

আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানবপ্রেম আর সংকল্পের দৃঢ়তা—এইসব দেখেই কি বিবেকানন্দ সেই সুন্দর উক্তিটি করেছিলেন: "Nivedita is the fairest flower of my work in England",—এমন কথা তিনি তাঁর আর কোনো বিদেশী শিষ্য বা শিষ্যা-সম্পর্কে বলেন নি। ভারতের প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের সেদিন এইটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন—এতবড়ো উপঢৌকন য়ুরোপ থেকে আমরা আজ পর্যন্ত আর দু'টি পাই নি। তাই বলছিলাম, নিবেদিতার কথা আজ নতুন করে স্মরণ করবার, আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁর শতবার্ষিকীও আসন্ন।

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বোপরি ভারতপ্রেমিক। স্বামিজীর ভারতপ্রেম তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, আন্তরিকতায় মহৎ—এত মহৎ যে তা' সহজে ধারণা করা যায় না। বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম বুঝতে হোলে তাঁর ভাবে ভাবিত হোতে হয়। যাঁরাই তাঁর ভারতচিন্তা গভীরভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করেছেন তাঁরাই এটা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সন্ন্যাসীর ভারতপ্রেম ভারতের অতীত গৌরবের রোমন্থনমাত্র ছিল না; তাঁর ভারতপ্রীতির মধ্যে আভাসিত হয়েছে দুর্জয় পৌরুষ, অসামান্য আত্মিকশক্তি আর অতুলনীয় ধী-শক্তি। তাঁর জীবনচরিত পাঠ করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, সর্বকালীন ভারতের দুর্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাঞ্ছনা স্বামী বিবেকানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল বেদনায়। কেমন করে ঘুচবে তাঁর স্বজাতির রাজনৈতিক পরাধীনতার দুর্বিসহ অপমান আর হীনতা, এই ছিল সেই সন্ন্যাসীর দিনের চিন্তা—রাত্রির স্বপ্ন। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে নিভৃতে ধ্যান-জপ নিয়ে কিম্বা আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে বিবেকানন্দ তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন নি বা তাঁর সতীর্থদের করতেও বলেন নি। এ কথা আজ আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলব যে, স্বামিজীর সাধনার প্রাণবায়ু ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি, সে-মুক্তি শুধু ধ্যান-ধারণার দ্বারা ব্যক্তির উপলব্ধিমূলক মুক্তি নয়, সে মুক্তি জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর জীবনে যে তাঁর আচার্যদেবের রাজনৈতিক সত্তার প্রবল ছাপ পড়বে, সেটি সহজেই অনুমেয়। কেল্‌টিক রক্ত প্রবাহিত ছিল নিবেদিতার ধমনীতে, আইরিশ বিপ্লবের কোলে আবাল্য লালিত-পালিত হওয়ার ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর জাতিগত সংস্কার। জাতীয় মুক্তিকে আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেখা যেমন সম্ভব ছিল না বিবেকানন্দের পক্ষে, তেমনি সম্ভব ছিল না নিবেদিতার পক্ষে। গুরু ও শিষ্যার মন এ ক্ষেত্রে যেন একসুরে বাঁধা ছিল। বিবেকানন্দকে

লণ্ডনে প্রথম সন্দর্শনের পর তাঁর কাছে এই বিদুষী আইরিশ কুমারীর আত্মসমর্পণের ইতিহাস সুপরিচিত। ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁকে ভারতমাতার চরণতলে উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন: "যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক! আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও। তোমার জয় হউক"। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্কটি বুঝবার পক্ষে স্বামিজীর এই উক্তিটি আমাদের বিশেষ সহায়ক। সত্তার শিখর থেকে এমন মহোত্তম বাণী পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত খুব কমই উচ্চারিত হয়েছে।

কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল (১৮৬৭-১৯১১) বিদুষী ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-শালিনী নারী ছিলেন। স্বাধীন প্রকৃতি ও সর্বসংস্কারমুক্ত। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ কলকাতায় ওকাকুরার অভ্যর্থনা-সভায় আমেরিকান কনসালের বাড়ীতে প্রথম যখন এই বিদেশিনীকে দেখেন তখন তাঁর মনের ভাব তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করেছেন: "কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন নিবেদিতা। ...গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে শাদা খাগড়া, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা; ঠিক যেন শাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্ত্তি একটি। ...সে যে কি দেখলুম কি করে বুঝাই। নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাঁদের সৌন্দর্য-ফ্যাশানে চারদিকে ঝলমল করছে। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হোল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। ...আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল। নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা"।

শুধু সৌন্দর্যের নয়, গুণেরও পরাকাষ্ঠা ছিলেন এই ভারত-দুহিতা। তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ-বিষয়ে এবং এই দেশের নর-নারীর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আন্তরিকতা সবই অতুলনীয় ছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতের নিকটে গুরুর মৃত্যুর পর, সকল বিষয়ে তিনিই ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা মুখপাত্রী। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র চার বছর নয় মাস। এই মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের গতি এমনভাবেই পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন যার ফলে নিবেদিতা তাঁর গুরুর চিন্তায় একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সমগ্র জীবন এই দেশের মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। আত্ম-উৎসর্গের এমন মহিমময় ইতিহাস আর কখনো দেখা যায় নি। এই আশ্চর্য চরিত্রের নারীর জীবনেতিহাস আমি যতই আলোচনা করেছি, ততই আমার মনে হয়েছে যে, তাঁর স্বাধীন

প্রকৃতি ও আইরিশ মনোভাবের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর গুরুর স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বদেশ-প্রীতি। পরবর্তীকালে এই কুমারী মার্গারেটের ভিতর থেকে যখন নিবেদিতা-সত্তার আবির্ভাব হোল, তখন দেখা গেল যে, বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি শিষ্যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামিজীর নতুন জীবনদর্শনের মধ্যে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যার ফলে এই আইরিশ-তনয়ার জীবনপ্রবাহ এক নতুন পথে প্রবাহিত হয়। কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল হলেন ভারত-দুহিতা নিবেদিতা। এই নামের মধ্যেই তাঁর নবজন্ম। ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসে এ ছিল একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে আর কোনো বিদেশী মহিলা এমনভাবে গোত্রান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসিনী সাজেন নি।

সেদিন এই বিদেশিনী শিষ্যার কাছে বিবেকানন্দের এই প্রত্যাশা ছিল: "ভবিষ্যৎ ভারত যেন তোমা মাঝে পায়, একাধারে শিক্ষাগুরু-সেবক-সবায়"। স্বামিজীর এই আকাঙ্খা ব্যর্থ হয়নি। বাংলা ও ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাসে, এর রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজ, সংস্কৃতি ও শিল্প, এমন কি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিবেদিতার প্রভাব অনস্বীকার্য। এই মহীয়সী মহিলার জীবনেতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরাই দেখেছেন নিবেদিতার সমগ্র জীবনই ছিল তাঁর গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনা। তাঁর আত্ম-বিলোপ গুরুর আদর্শের মধ্যেই আত্মবিলোপ। নিবেদিতা নিজেই বলেছেন: "ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তা আমি প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলাম এবং তাঁর স্বজাতি-প্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার, এ শুধু তাঁর চরিত্রের নিকটেই। আচার্যদেবের চরিত্র-মাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হয়েই আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম"। ব্যক্তিত্বসম্পর্কহীন এক মহাপ্রেমই সেদিন এই বিদেশিনীকে কন্যারূপে, কল্যাণীরূপে এই দেশের প্রতি আকর্ষণ করেছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ, ৪ঠা জুলাই। বিবেকানন্দের মহাসমাধি হোল। গুরুর তিরোধানের পর নিবেদিতা প্রথমেই বিবেকানন্দ-প্রচারে অগ্রসর হোলেন। তাঁর জীবনের 'মিশন' ছিলেন বিবেকানন্দ, অন্য কিছু নয়। তাঁর গুরু বিশ্ববিজয়ী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, কিম্বা তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত, এই গতানুগতিকভাবে গুরুর মহিমা-প্রচারের কথা নিবেদিতার আদৌ মনে হয়নি। তিনি তাঁর গুরুকে চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন সত্য করে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ ছিল তারই সাম্যঘন আগ্নেয়রূপ তিনি বাঙালীর নিকট, ভারতবাসীর

নিকট এইবার তুলে ধরতে চাইলেন। সেই বিপ্লবী বিবেকানন্দ স্বদেশীযুগের উষার আহ্বানমাত্র করে গিয়েছেন, এখন তাঁর স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত ভাবধারা তাঁর স্বজাতির নিকট বিশেষ করে প্রচারিত হওয়া দরকার, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে নিবেদিতার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নি। বিবেকানন্দের তিরোধানের অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার এক জনসভায় নিবেদিতা স্বামিজী-সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি বিবেকানন্দকে একেবারে মিশনের গণ্ডীর বাইরে এনে ঘোষণা করলেন: "স্বামিজীই আমার ধর্ম, আমার দেশ-হিতৈষণা, সব ......স্বামিজী আমাদের মহান্ জাতীয় নেতা"। ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়েই সেদিন তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন। এর সেদিন প্রয়োজনও ছিল।

গুরুর তিরোধানের পর দেখা গেল তাঁর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নিবেদিতা গুরুপূজা করে সময় কাটান নি, অথবা নিভৃতে শোকের বিলাপ করে কালহরণ করেন নি। এই মহাপুরুষের অকালতিরোধানে সারা ভারতের সংবাদপত্রে শোকের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্লাবন বয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু যে উদ্দীপনা, যে উৎসাহ নিয়ে স্বামিজী নিদ্রিত ভারতকে জাগাতে চেয়েছিলেন, নিবেদিতা অত্যন্ত বেদনাহতচিত্তে লক্ষ্য করলেন, তা' যেন তাঁর তিরোধানের পরে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তিনি আরো অনুভব করলেন যে, ভারতের প্রাণের কথা যাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলতো, যাঁর জীবনদর্শন জীবনের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে গিয়েছে, সেই বীর্যবান্ ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসীর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা যেন শূন্যে বিলীন হোতে চলেছে। রামকৃষ্ণ-মিশন নীরব—তাঁরা স্বামিজীর সমাজতন্ত্রবাদ বা স্বদেশপ্রেম কোনোটাকেই স্বীকার করলেন না; এমন কি, বিবেকানন্দ-প্রচারে মিশনের কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের কোনো আগ্রহ পর্যন্ত দেখা গেল না। বিবেকানন্দ দেশব্যাপী যে আলোড়নের সৃষ্টি করে গেছেন, দৃশ্যতঃ তা' ভিন্নমুখী হোতে চলেছে। সর্বোপরি, এই সন্ন্যাসী-সম্পর্কে দেশের মধ্যে তখনো নানা লোকের নানা মত। সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম-প্রচারকের উপর কেউ তাঁকে যেন স্থান দিতেই চায় না। নিবেদিতা এসবই লক্ষ্য করলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলেন—কিছুটা বিচলিতও হোলেন। তখনই তিনি বুঝলেন, এখন দরকার বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচার।

বিবেকানন্দের জীবনব্রতের উত্তরাধিকারিণী নিবেদিতা গ্রহণ করলেন এই গুরুদায়িত্ব। জনসভায় বক্তৃতা করে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে আর দেশের বিভিন্ন স্থানে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' গঠন করে নিবেদিতা কিভাবে বিবেকানন্দ-প্রচারের দুরূহ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন সে-ইতিহাস জানবার মতোন। গুরুর

দেহত্যাগের সপ্তাহকাল পরে তাঁর সম্পর্কে ইংরেজিতে প্রথম যে প্রবন্ধটি তিনি রচনা করেন সেটির নাম: *The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work* অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মের জাতীয় বৈশিষ্ট্য'। প্রবন্ধটি মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁর গুরুকে কতখানি সত্য করে চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন তার পরিচয় আছে এই প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে। এই প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখেছেন:

"Man-making was his own stern brief summary of the work that was worth-doing. Burning renunciation was chief of all inspirations that spoke to us through him.... Vivekananda was at once a sublime expression of superconscious religion and one of the greatest patriots ever born. In him the national destiny fulfilled itself. To him his country's hope was in herself. Never in the alien. To him nothing Indian required apology. To Vivekananda, again, everything Indian was absolutely and equally sacred."

বিবেকানন্দ সম্পর্কে এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী, সেদিনও যেমন, আজো তেমনি বিরল। এইভাবেই নিবেদিতা জাতির নিকট বিবেকানন্দকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এ কাজ তিনি ভিন্ন আর কেউ করতে পারত না। জাতীয়তার যে অগ্নিমন্ত্রে স্বীয় আত্মসৃষ্ট কন্যাকে বিবেকানন্দ দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, নিবেদিতা তাঁর অন্তর দিয়ে তার সবটুকু গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন ভারতের জনসমাজের দ্বারে দ্বারে অক্লান্তভাবে বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। কথিত আছে, একদিন গভীর রাত্রে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই জীর্ণ বাড়ীতে একটি স্বল্পালোকিত কক্ষে বসে নিবেদিতা যখন 'হিন্দু' পত্রিকার জন্য এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন, তখন প্রবন্ধটি শেষ করে টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত স্বামিজীর ফটোখানির দিকে তিনি একবার তাকালেন। একদা এই ফটোখানি স্বহস্তে শিষ্যার হাতে দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন: "ভারতের পুনরুত্থানকল্পে তোমার সেবা যেন সার্থক হয়"। গুরুর ছবিখানির দিকে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে সেই কথাটি দ্বিতীয়বার নিবেদিতার মনে পড়েছিল নিশ্চয়ই। বিবেকানন্দকে তাই তিনি বিস্মৃত হোতে দেন নি। আমরা, তাঁর স্বদেশবাসী, বিবেকানন্দকে কিন্তু বিস্মৃত হয়েছি, এই কঠিন সত্যটি আমরা যেন অকুণ্ঠচিত্তেই স্বীকার করি।
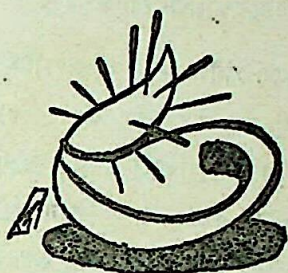
॥ অষ্টাদশ অবদান ॥

॥ ধর্মের স্বরূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥

আত্মাই ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মের লক্ষ্য আত্মানুভূতিলাভ। ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত একটি পত্রে স্বামিজী ধর্মের লক্ষ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ধর্মের লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ, কিন্তু সেই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ কি তা' জানা দরকার। ঈশ্বর অধ্যাত্মতত্ত্বেরই জ্বলন্তস্বরূপ। "যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপমাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে। এরূপে এখনও যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে। ধর্ম এ ছাড়া আর কিছুই নয়; এই একত্ব অনুভব বা প্রেমই এর সাধন"।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়ভাবেই বলেছেন: ধর্ম অর্থে এ নয় যে, আচার, বাদ-বিচার ও আড়ম্বর আয়োজন অথবা বাহ্যিক ঐশ্বর্যের বিকাশসাধন। এ-সব ধর্মের বাইরের বস্তু—আচরণ মাত্র। তবে আচার-বিচার, উপচার একেবারে নিরর্থক নয়. আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হবার জন্য তারা সাহায্য করে। এজন্য বলা যেতে পারে যাগ-যজ্ঞ, আচার-বিচার সকল ধর্মেরই গৌণবস্তু এবং মুখ্যবস্তু ঈশ্বরলাভ।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সকল জিনিসের গতানুগতির ধারার আমূল পরিবর্তন করার ঘোরতর পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ পুরাতন যাহা-কিছু ভাল, তাদের কোনটা ত্যাগ করতে বলেন নি। সংস্কারকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে ঈশ্বর-লাভের উপায়স্বরূপ তাদের ব্যবহার করতে বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাইরের আচার ব্যবহার, আড়ম্বর জাঁকজমককেই অনেকে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ

বলে মনে করেন এবং তার ফলে গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি অকল্যাণকর সংস্কার সৃষ্টি হয়ে মানুষের মনে অহংকারের ভাব আনে—যার ফলে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হয়। স্বামিজী এরূপ সংকীর্ণতার আশ্রয় নিতে সকল দেশের সকল নরনারীকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "ধর্মের আচরণে যখনি মনে গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসের উদয় হবে তখনই বুঝতে হবে ধর্মাচরণ যথার্থভাবে হচ্ছে না। হিন্দুধর্ম উদার ধর্ম। এই ধর্ম অপর কোন ধর্মের ওপর আক্রমণ চালায় না বা কাউকে নিন্দা করে না, বরং সকল ধর্মাবলম্বীকেই সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ করে ও তাদের মধ্যে যথার্থ স্বরূপের প্রতি চেতনা আনিয়ে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করে। ভাবপ্রবণতার স্পর্শ হিন্দুধর্মের আদর্শের মধ্যে নাই এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় সে কখনও দেয় না"।

উদারদৃষ্টিসম্পন্ন না হলে মানুষের মনে যথার্থ প্রীতি-ভালবাসা ও প্রেমের সঞ্চার হতে পারে না। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, নির্দিষ্ট ধর্মমত প্রভৃতির সীমায়িত বুদ্ধির আরোপ করেই মানুষ সমষ্টি-সমাজের মানুষকে ব্যষ্টি বলে দেখে ও সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড় জ্ঞানের তারতম্য এনে নিজের মনকেই সংকীর্ণ করে। উদার ধর্মের আদর্শ অনুভব করলে মানুষকে একই ভারতবাসী অথবা বিশ্ববাসী বলে অনুভব হয় ও তখনই ঠিক ঠিক মনের সীমায়িত ভাব অন্তর্হিত হয় এবং বিরাটের ধারণা হৃদয়ে প্রসারতা আনায়ন করে। মনের প্রসারতার অর্থই মনের পরিশুদ্ধি সাধন, আর মন পরিশুদ্ধ হলে অজ্ঞানতা সব দূরীভূত হয়।

স্বামিজী বলেছেন তা' হলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতের ধর্মেতিহাসে এত রক্তক্ষয়ী বিবাদ বিসম্বাদ কেন? সত্যই এই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু এর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিই এর কারণ। স্বামিজী পাতকুয়ায় পতিত দুটি ব্যাঙের উদাহরণ দিয়ে এ' বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন একটি ব্যাঙ সমুদ্র হতে এসে এক পাতকুয়ায় পড়ে যায়। আর একটি ব্যাঙ পূর্ব হতেই ঐ পাতকুয়ায় ছিল। সমুদ্রাগত ব্যাঙটি বিশাল সমুদ্রে বাস করায় তাহার মনের প্রসারতা হবারই কথা। পাতকুয়ার ব্যাঙ সমুদ্রের ব্যাঙটিকে দেখে ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোথা থেকে আসছো? সমুদ্রের ব্যাঙটি বললো 'সমুদ্র হতে'। পাতকুয়ার ব্যাঙ তখন বলে: 'কি সমুদ্র? তোমার সমুদ্র আমার এই পাতকুয়ার চেয়েও কি বড়?' তারপর সে পাতকুয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে লাফিয়ে পড়লো। সমুদ্রের ব্যাঙ হেসে হেসে বলে: 'ভাই তুমি ভুল করছো, আমার সমুদ্র তোমার এই পাতকুয়ার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়'। একথা

শুনে পাতকুয়ার ব্যাঙ খুসী হতে পারলো না, বরং ভীষণভাবে রেগে উঠলো। রাগ তো হবারই কথা। সে চিরদিন সঙ্কীর্ণ পাতকুয়ার মধ্যে জীবনযাপন করছে, সুতরাং তার মন ও ধারণাও ছোট হয়েছে, আর তারই জন্যে 'বড়'-র ধারণা সে করবে ক্যামন করে।

স্বামী বিবেকানন্দের মত এই যে, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির লোক যারা, তারা পাতকুয়ার ব্যাঙের মত। তারা বিশালতার ধারণা করতে পারে না। এরূপ ধারণা না করার একমাত্র কারণ 'অজ্ঞান'। অজ্ঞানতার জন্যই মানুষও ধর্ম নিয়ে মারামারি করে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে কুট তর্ক-বিতর্ক করে ও কত অনর্থ ঘটায়। কিন্তু ভাবে না প্রকৃত ধর্মের পরিধি বিশ্বব্যাপী। তার মধ্যে জাতি সম্প্রদায় অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির স্থান নাই। সত্যকারের ধর্ম চিরদিনই উদার, কারণ ঈশ্বরলাভ করানোই তার স্বভাব।

স্বামিজী আরও বলেছেন, প্রকৃত ধর্মের লক্ষ্য আত্মানুভূতি—Religion is Realization। তাই বাইরের আচার-বিচার, প্রকৃত ধর্ম নয়। ধর্মের আসল রূপ দেদীপ্যমান দিবাসূর্যের মতো; তাহা কোন আবরণের অপেক্ষা রাখে না, সে সদাই প্রকাশিত। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষ ভাবে কেবল তার সম্প্রদায়ের ধর্মই যথার্থ ও মহৎ, আর অপরের ধর্ম ক্ষুদ্র। এ' প্রকার মনোভাবের জন্যই শাক্তর সঙ্গে বৈষ্ণবের, ভক্তের সঙ্গে জ্ঞানীর, অথবা কর্মীর সঙ্গে যোগীর বাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা ভাবে না যে, এক ঈশ্বরই কালী ও কৃষ্ণ হয়েছেন এবং ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি এক ঈশ্বরকেই লাভ করার ভিন্ন ভিন্ন পথ বা উপায় মাত্র। কল্যাণবুদ্ধির উপায় হলে মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি বিদুরিত হয়। আর এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দূর করার জন্যই সর্বসংস্কারমুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন মহামানবরূপে। আমাদের সকলেরই কর্তব্য সেই উদার-দৃষ্টি মহামানবের আদর্শ ও বাণীকে একান্তভাবে অনুসরণ করা। তিনি বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক। তাঁর পথানুসরণ করলেই আমরা গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি হতে নিশ্চয় পরিত্রাণ লাভ করে শাশ্বত আনন্দ ও পরমশক্তির অধিকারী হতে পারব।
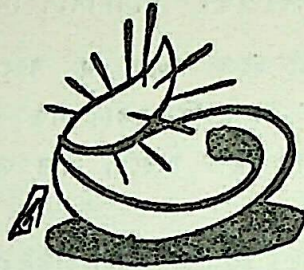
॥ উনবিংশ অবদান ॥

॥ ধর্মজগতে স্বামী বিবেকানন্দের দান ॥

আলোচ্য বিষয়টি যেমন ব্যাপক এবং চিত্তাকর্ষক, হয়তো তেমনি অস্পষ্ট ও বিতর্ক-মূলক। স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশ-প্রেমিক মহাপুরুষ নামে সম্মানিত হন। দৈনন্দিন আলোচনায় তাঁহাকে স্বদেশের উন্নতির অন্যতম প্রধান নেতার আসন দেওয়া হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকৃত হয় যে, তিনি একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী। কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে তাঁহার দান কতখানি, এ বিষয়ে কেহ কেহ আলোচনা করিয়া থাকিলেও সুবিশাল অধ্যাত্মজাগরণের ক্ষেত্রে সে কৃতিত্বের এখনও সম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয় নাই, অথবা গণচেতনায় উহা এখনও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে নাই। আবার সে অবদান অপরিমিত এবং বহুমুখী হইলেও, উহার মৌলিকতা সম্বন্ধে অনেকেই হয়তো সন্দিহান। তিনি নিজেও অভিনবত্বের দাবী না করিয়া বলিতেন, তিনি যাহা কিছু উত্তম কথা বলিয়াছেন, তাহা সবই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশসম্ভূত। আমাদেরও শাশ্বত বিশ্বাস, অধ্যাত্মরাজ্যের সমস্ত সত্যই বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে; নূতন বলিবার মত অবশিষ্ট আর কিছুই নাই।

এত কথার পরেও কিন্তু বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সশ্রদ্ধ পাঠক বলিয়া থাকেন: "না, তবু ধর্মজগতে স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব কৃতিত্ব অবশ্যই আছে"। সে সাফল্যের স্বরূপ কি, কতদূর তাহার বিস্তার, কতখানি তাহার গভীরতা, কোথায় তাহার অভিনবত্ব এবং অধ্যাত্মজীবনকে নবীন পথে পরিচালনার কতটুকু সম্ভাবনা তাহার অন্তর্নিহিত—ইহাই বিচার্য বিষয়।

প্রথমেই ধরা যাউক, তাঁহার 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' বিষয়ক মতবাদ। ভাবটা নূতন নয় মোটেই। এক হিসাবে উহা গীতোক্ত কর্মযোগেরই নবীন সংস্করণ। ঠিক কথা। কিন্তু গীতার মূল, ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীতে কর্মের যে সংজ্ঞা পাই তাহা খুবই সঙ্কীর্ণ। তাহা শাস্ত্রীয় যাগ-যজ্ঞ, আচার-বিচারের গণ্ডী

অতিক্রম করে না। যেখানে এই শাস্ত্রীয় দৃষ্টি একটু প্রসারলাভ করে, সেখানেও উহা ধর্মপ্রাণ, সুবিবেচক ব্রাহ্মণদের অনুমোদিত আচার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া থামিয়া যায়। গীতায় 'সহজ কর্ম', 'স্বধর্ম' প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও উহাও পূর্বোক্ত বিধি-নিষেধের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। অথচ এদিকে সমাজের পরিবর্তনের ফলে কর্মরাশি আজ এমন এক স্তরে উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে উহাকে বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিভাগাদি প্রণালীর সাহায্যে যদিও বা কোনও প্রকারে আচারমূলক প্রাচীন শাস্ত্রের আওতায় আনিয়া ফেলা যায়, তথাপি সে-প্রচেষ্টা সাধারণের নিকট একটা কিম্ভূত-কিমাকার কসরতের মতই দেখায়, এবং জনসাধারণ তাহাতে অবাক হইলেও কর্মপ্রেরণা পায় না। তাহার ফলে দৈনন্দিন জীবন ও ধর্মসাধনা দুই বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। কর্ম ও ধর্ম একসঙ্গে চলে না বলিয়া, যাহারা কর্ম চায়, তাহারা ধর্ম ছাড়ে। আর যাহারা ধর্ম চায়, তাহারা কর্ম ছাড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে লোক-ঠকানো সামঞ্জস্যসাধনের জন্য ঐরূপ কোন বক্রপথে না চলিয়া সোজা সাদা ভাষায় বলিলেন: "কাজই তো পূজা"। ইহাতে "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"—গীতার এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি থাকিলেও, ইহা তদপেক্ষা উদার, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং অনুপ্রেরণাপ্রদ। ইহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নাই, ধার্মিকের চিরানুসৃত অতিসাবধানতার সঙ্কোচ নাই, কিংবা অধুনাসুলভ বিদ্রোহাত্মক দম্ভাবলম্বনে ধার্মিক কোন কিছুকে নস্যাৎ করিবার ধৃষ্টতাও নাই। এখানে পাই এক সরল, সরস ধর্মের জন্য উদাত্ত আহ্বান—যাহা সকলের প্রতি সমভাবে উচ্চারিত এবং সকলেরই নিকট সমভাবে সাদরে গ্রহণীয়। "জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ" পর্যন্ত সব কাজই এখানে ধর্মের উচ্চাসনে বসিবার উপযুক্ত—যদি শুধু সারল্যমণ্ডিত ভাবশুদ্ধি থাকে। ইহা পৌরহিত্যমুক্ত স্বাধীন মানুষের সার্বভৌম অধ্যাত্ম অভিযান।

মন্দিরে আমরা দেবতাকে পূজা করিয়াছি প্রতিমার মধ্যে। পূজামণ্ডপে কুমারীরাও আমাদের অর্ঘ্য পাইয়াছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের দেবতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অবস্থিত। "ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়"; অতএব "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" সে ভগবানের পূজা বহুরূপে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিচিত্র উপচারে, বিবিধ মন্ত্রে সম্ভবপর। প্রতি কর্মক্ষেত্র এখানে পূজামণ্ডপ, প্রতি অঙ্গচালনা এখানে পূজা, প্রতি ব্যক্তি এখানে প্রতিমা, এবং প্রতি কথা এখানে মন্ত্র। বনের বেদান্ত এখানে প্রতি গৃহে রূপ পরিগ্রহ করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র এখন নারায়ণ, শিক্ষক তাঁহার পূজারী; হাসপাতালের রোগীও নারায়ণ, ডাক্তার তাঁহার সেবক। সমাজ এখন "বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র"।

দেশসেবা এখন "সর্বতঃ পাণিপাদ" বিরাটের অভ্যর্থনা। প্রতি নারীমূর্তি এখন দেবী—মা জগদম্বা ; প্রত্যেক নর এখন স্বয়ং শিব। স্বামীজী আদর্শকে অবনত না করিয়া বাস্তবকে আদর্শে পৌছাইবার অবলম্বনে পরিণত করিয়াছেন।

প্রাচীনের দৃষ্টিতে কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয় ; শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান প্রকটিত হয়। নবীন সংজ্ঞানুসারে ধর্মের প্রসার হয় ক্ষুদ্রতার বিনাশের দ্বারা এবং সর্বত্র নিজের সহিত সকলের অভেদানুভূতির দ্বারা। সাধক যখন ক্রমে পূজায় পরিণত নিঃস্বার্থ কর্ম ও সেবায় ডুবিয়া গিয়া ক্ষুদ্র "অহংতা ও মমতা"-র উর্ধ্বে চলিয়া গেলেন, তখন মুক্তি তো করতলায়তে। জগতের সঙ্গে যে একটা স্বার্থের সম্পর্ক 'আমি ও আমার'-কে ঘেরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাই তো 'হৃদয়ের গ্রন্থি'। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের ফলে সে 'আমি' যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল, তখনই তো মানুষের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল, সকল সংশয় দূর হইল, এবং বহু জন্মের সঞ্চিত কর্মফল নিমেষে লীন হইল। সসীমতাকে ছাড়াইয়া অসীমের মধ্যে আত্মবিসর্জনই তো মুক্তি। মুক্তি অর্জনীয় বস্তু নহে ; আত্মার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠাই মুক্তি ; আর ইহা আসে অনুভূতির মধ্যদিয়া—আচারমাত্র সম্বল প্রাণহীন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ কাহারও মাধ্যমে নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পর্যন্ত স্বার্থপরতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; সকলের মঙ্গলের জন্য আত্মাহুতিকেই তিনি শ্রেষ্ঠতম আসন দিয়াছেন। স্বামীজীর "কার্যে পরিণত বেদান্ত" শুধু গীতার কর্মযোগ নহে, ইহার মধ্যে আছে কর্মীর কর্ম, ভক্তের প্রেম ও ভালবাসা, যোগীর সমাহিত-চিত্ততা, এবং জ্ঞানীর বিচারপূর্বক সর্বস্ব ত্যাগ ও আত্মনিষ্ঠা। উপনিষদের রাজর্ষি জনক, অশ্বপতি কেকয়, এবং প্রবাহণ জৈবলির জীবনে হয়তো ইহার আভাস আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বীকৃতি নাই। তাঁহাদের বাণীতে পাই শুধু জন্ম-মৃত্যু ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাশ্বত সমস্যাবলীর প্রতিধ্বনি ও তাহার সমাধান ; দৈনন্দিন ভাগবত জীবনের নিবিড় পরিচয় সেখানে নাই।

বোধিসত্ত্ব নিজমুক্তি বিসর্জন দিয়া সর্বমুক্তির জন্য লালায়িত ; তাই অর্হতের অপেক্ষাও তিনি আদরণীয়। বেদান্তী অপ্পয় দীক্ষিতও সর্বমুক্তির কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বেদান্তসমাজে উহা স্বীকৃতি লাভ করে নাই। মানুষ ব্যক্তিগত মুক্তিরই জন্য আগ্রহান্বিত। সব জানিয়া শুনিয়াও স্বামীজী নূতন করিয়া এই বোধিসত্ত্বদের স্বীকৃত সর্বমুক্তির কথা শুনাইলেন এবং বলিলেন, তিনি নিজে জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে মুক্তির জন্য ততটা আগ্রহান্বিত নহেন, যতটা আগ্রহবান তিনি সকলের মুক্তির জন্য। বুদ্ধের হৃদয়বত্তার সহিত তিনি শঙ্করের বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়

ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন; আর তাহার বিগ্রহরূপে পাইয়াছিলেন তাঁহারই শ্রীগুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে। ইহাতে নিজের মুক্তিও স্বতঃই আসিয়া পড়ে। তাই স্বামীজীর বাণী এই—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"।

স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মপ্রয়াসে সাধারণসুলভ হীনতা-দীনতা, সঙ্কোচ-সরম, অশ্রু-ক্রন্দন, বিহ্বলতা-উচ্ছ্বাসের স্থান অতি অল্প বা মোটেই নাই; কারণ, উহারা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে। ধর্মের এই গতানুগতিক, আত্মবিস্মৃত নেতির ধারা ছাড়িয়া তিনি ধার্মিককে দাঁড় করাইতে চাহিলেন এক আত্মসমাহিত, আত্ম-শ্রদ্ধাবান, সবল ইতির প্রশান্ত রাজপথে, যেখানে আছে শ্রদ্ধা ও বীর্য, বিকাশ ও অগ্রগতি, অভয় ও উদ্যম, প্রতিজ্ঞা ও তাহার পূর্তি, হাস্য ও উৎসাহ, বিরামহীন কার্যপ্রবাহ ও প্রেমপূর্ণ আত্মাহুতি। পাপের ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া, ভুলের ভয়ে জড়ত্বে পরিণত হওয়া বিবেকানন্দের ধর্ম নহে। গরু মিথ্যাকথা বলে না, কিন্তু সে চিরকাল গরুই থাকিয়া যায়; মানুষেরই জীবনে ভুলচুক আছে, আর তেমনি উদ্বর্তনও আছে। ধর্ম অচলায়তন নহে; উহা ক্রমবর্ধমান, সচল, জীবন্ত জিনিস। পাপী এবং দুর্বল মানবও তাই দেবতায় পরিণত হয়; ইহাই ধর্মের সার্থকতা। অতএব ধার্মিককে পাপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া, স্খলনে বিহ্বল না হইয়া আশার উজ্জ্বল জ্যোতিঃসহায়ে পুণ্যের প্রতি অভিযান করিতে হইবে। সে অমৃতের সন্তান; অমৃত সে পাইবে, পাইতেই হইবে। পথে পাপ আসে আসুক। তাহার চরম মর্যাদা স্থিরীকৃত হইবে সে কতখানি পাপ করিয়াছে তাহার মাপকাঠিতে নহে; কিন্তু সে কত পুণ্য করিয়াছে তাহারই কষ্টিপাথরে। অগ্রগতির পথে ভুলভ্রান্তি অনিবার্য। বিশেষতঃ সাধারণ মানুষ ডুবিয়া আছে তমোগুণে, আর মনে করিতেছে সে সাত্ত্বিক। এই মহামোহ হইতে জাগিবার প্রথম উপায় হইতেছে রজোগুণের আশ্রয়। অতএব এক অর্থে মানুষ গীতা অপেক্ষা ফুটবলের সাহায্যে মুক্তির অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারে। স্বামীজী আনিয়াছিলেন, আগাইয়া যাইবার বার্তা। পাপের ভয়ে ভীত না হইয়া আগাইয়া চল; দেখিবে পুণ্যের দিকে যতটা আগাইবে, পাপ ততখানি আপনা হইতে পিছাইয়া পড়িবে। সাধনার ইহা এক অভিনব দৃষ্টিকোন, ধর্মের ইহা এক প্রাণপ্রদ সংজ্ঞা।

গতানুগতিক, প্রাণহীন, অনুভূতিশূন্য আচারমাত্রকে ধর্ম বলা চলে না। অনুভূতির ভূমিতে কাহার কতখানি প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহারই নিকষে ধার্মিকের মর্যাদা স্থিরীকৃত হইবে। আর তাহাতেও যদি ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে তবে এই অনুভূতিসম্পন্ন ধর্মকে আর ধর্ম না বলিয়া নূতন নামে আধ্যাত্মিকতা বলাই ভাল। ভাবের সহিত সংজ্ঞার পরিবর্তনও আবশ্যক। আচার নামধেয় ধর্ম পরিবর্তনশীল,

বা তাহাই হওয়া উচিত। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অর্থ, মানবের অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তার ক্রমবিকাশ, আর এই বিকাশ সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায়ই সম্ভব, অন্ততঃ নবযুগে ইহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যযুগে সকলে ব্রাহ্মণ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অবির্ভাব দিবস হইতে যে নূতন সত্যযুগের আরম্ভ হইয়াছে, উহাতে সকলকে ব্রাহ্মণত্বে পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে। যে আধ্যাত্মিক প্রকাশ এ যাবৎ শুধু আত্মিক বা বৌদ্ধিক উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাকে মানসিক ও দৈহিকাদি স্তরেও সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

ধর্মের এই উদার সংজ্ঞার মধ্যে জগতের সব ধর্মই স্থান পাইতে পারে। কারণ, সব ধর্মই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: "যত মত, তত পথ"। মত মানে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক মত নহে, এই সমন্বয়ের সূত্র সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম ও ব্যক্তিগত সাধক জীবন, ব্যষ্টি ও সমষ্টি—প্রত্যেকের মধ্যে অনুস্যূত ধর্মস্পৃহার দৃষ্টিতে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা ভাবী মানবসভ্যতার একটি মৌলিক তথ্য ও ভিত্তি। গীতাতেও সমন্বয়ের বার্তা আছে কিন্তু সে সমন্বয় তাৎকালিক ধর্মমতসমূহের প্রতি একটি উদার দৃষ্টিমাত্রে পর্যবসিত। ইহাকে ভাবগত সমন্বয় বলা চলে। স্বামীজীর জীবন ও বাণীতে যে সার্বভৌম বাস্তব সমন্বয়ের মূর্তি পাই, গীতায় তাহা অজ্ঞাত। খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহিত তিনি যেরূপ নিঃসঙ্কোচে আত্মীয়তার দাবী লইয়া মিশিয়াছেন, যে-ভাবে মনেপ্রাণে তাঁহাদের ধর্মনেতাদিগকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সম্মান দিয়াছেন, এবং যে উদার ও প্রেমের দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে স্বধর্মে অধিকতর নিষ্ঠাবান ও আস্থাবান হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সব ধর্মকে সমভাবে গ্রহণ করিতে ও সম্মান দিতে আহ্বান জানাইয়াছেন এবং শিক্ষা দিয়াছেন, ঐরূপ উদাত্ত আহ্বান, নির্বিচার স্বীকৃতি, প্রাণঢালা প্রোৎসাহ ও অবাধ সহায়তা তাঁহার পুর্বে কয়জনের জীবন ও বাণীতে পাই? আবার সন্ন্যাসী হইয়াও খোলা-মনে সর্বস্তরের সহিত এমন আত্মীয়তা স্থাপনের দৃষ্টান্তই বা কয়টি আছে। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর জীবন ও বাণীতে সমন্বয় কথার কথারূপে না থাকিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ মানবের মিলনের পথ সুগম করিয়াছে। সকল মানবের বাধাহীন প্রেমপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই সমন্বয় স্থাপিত হইবে। এই সর্বমানবের অভ্যুত্থান ও মিলনের আদর্শকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: "এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল, ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে ভূষিত হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়া-

শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগ শোক আর মনুষ্যশরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ...যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্বকার্যের প্রেরয়িতা হইবে"।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সমস্ত ধর্মের মৌলিক সাধনপ্রণালীগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা গেল—জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম। সনাতন ভাগবত বাণীকে বিচারপূর্বক বুঝিয়া লইয়া মানুষ মিথ্যাকে ছাড়ে ও সত্যকে ধরে। অবশেষে একমাত্র সত্যই থাকিয়া যায়; সে সত্যে সে আপনার ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে, ইহাই জ্ঞানমার্গ। সে ধ্যান-সহায়ে মনের সর্বপ্রকার বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া পরমার্থকে নিজহৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে, ইহাই যোগমার্গ। পূজাজ্ঞানে নিষ্কাম কর্মে ভুলিয়া গিয়া স্বার্থ বিসর্জনপূর্বক "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" চিরনিমজ্জিত হয় ইহাই কর্মযোগ। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরকে জগতের সর্বত্র দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হয় এবং সেই প্রেমের আকর্ষণে সব ভুলিয়া সেই সর্বগুণাধরের শ্রীপাদপদ্মে আপনাকে চিরতরে সমর্পণ করে—ইহাই ভক্তিযোগ। এই সবই পরম সত্যলাভের অমোঘ উপায়। অতীতে ইহাদের এক বা দুয়ের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ত্যাগে স্বীকৃত হয় নাই। পারিভাষিক ভাষায় বলিতে গেলে স্থানবিশেষে ক্রমসমুচ্চয়। অর্থাৎ একই জীবনে একের পর একের আগমন, স্বীকৃত হইলেও সহসমুচ্চয় বা একই জীবনে একই কালে সকলের উপস্থিতি স্বীকৃত হয় নাই। মানুষের বাস্তব জীবন যাহাই হউক, দর্শনশাস্ত্র ইহার বিরুদ্ধে খড়্গোদ্যতকর; পুরাণকাররাও ঐ বিবাদের পথই বরণ করিয়াছেন। যোগীরা জীবনক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক বলিয়া মানেন নাই। জ্ঞানীরা ভক্তিকে নিম্নস্তরে বসাইয়াছেন; ভক্তরা জ্ঞানকে ভক্তির পরিচায়ক বা পথ পরিষ্কারকের স্থান দিয়াছেন। বেদান্তবাদী মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি জ্ঞানী হইয়াও ভক্তিকে হৃদয়ে স্থান দিতে গিয়া অদ্বৈত সমাজে দুর্বলচিত্ততার আখ্যা পাইয়াছেন। তন্ত্রে বিভিন্ন মার্গের সমন্বয়ের চেষ্টা থাকলেও তাহা পূজাস্থলের বাহিরে কর্মভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই। স্বামীজী কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বা দার্শনিক দিক হইতে দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের সমন্বয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিলেন না। বরং শ্রীগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকসম্পাতে ইহাদের সম্মেলনের মধ্যেই মানবজীবনের স্বাভাবিক মূর্তি দেখিতে পাইলেন। বিচার, হৃদয়বত্তা, আপনমনে নিষ্ক্রিয় অবস্থান এবং পরার্থে কর্মব্যস্ততা এই সমস্ত লইয়াই তো মানবের মানবতা। কোন একটাকে জোর করিয়া জীবন হইতে বাদ দিতে গেলে সে শুধু সুযোগ বুঝিয়া এবং গা ঢাকা দিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে

অস্বাভাবিক হাস্যকররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধককে বঞ্চিত করে এবং ধর্মক্ষেত্রে বিবাদ-বিচ্ছেদ বাড়াইয়া তোলে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে ভাববিশেষের আধিক্য থাকা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু উহাকেই প্রাধান্য দিয়া, একমাত্র সত্যের মর্যাদা দিয়া আর ভাবগুলিকে গলা টিপিয়া মারা বা শুধু নিজেরটুকু লইয়া গর্বে স্ফীত হওয়া ও অপর ধর্মগুলিকে নিন্দা করা মারাত্মক ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সব পথই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দেয়, ইহা মানিয়া লইলেও, সেই লক্ষ্যের স্বরূপ কি? স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করেন যে, সে লক্ষ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে দেখিলে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় এবং ঐ দৃষ্টিগুলির আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার্য। কিন্তু দার্শনিক বিচারের দৃষ্টিতে অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের চরম আদর্শ এবং বেদান্তই সর্বধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বা মুকুটমণি হইবার উপযুক্ত। এই বেদান্তমত অবলম্বনেই প্রকৃত ধর্মসমন্বয় সম্ভবপর। কারণ, বেদান্তমত ব্যাবহারিক, আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কাহাকেও অস্বীকার করে না, সকলকে লইয়া। সকল পথের সার্থকতা মানিয়াই তাহার ভূমার দিকে অভিযান। সকলকে বাদ দিয়া শুধু নিজে বাঁচিয়া থাকার স্বার্থচিন্তার উহা বহু উচ্চে। ধর্মের মধ্যে যত মৌলিক কথা আছে—মানবের স্বরূপ, বিশ্বের প্রকৃত তথ্য, সকলের পশ্চাদ্‌বর্তী মূল সত্য, সে সত্যের সহিত প্রতিটি অঙ্গে সম্বন্ধ, জন্মমৃত্যুর রহস্য—ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে বেদান্তে নিরপেক্ষ, গভীর আলোচনা হইয়াছে এবং উহাতে এমন কতকগুলি স্তরবিন্যস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যাহা সকল অনুসন্ধিৎসুকেই পথ দেখাইতে পারে। ধর্মান্ধতা ইহাতে নাই, আছে শুধু বৈজ্ঞানিকসুলভ সত্যান্বেষণ এবং সত্যের অকপট স্বীকৃতি; আর সেই সঙ্গে আছে সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করার মত মহা ঔদার্য ও সহানুভূতি। আরও একটি কথা এই সঙ্গে জানিতে হইবে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক ধর্মকেই বিজ্ঞানের যুক্তিজালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বমতকে রক্ষা করিতে হইবে, এখন শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। দেখা গিয়াছে, ইহাতে অনেক ধর্মই অক্ষম। এই দুর্বলতাকে ঢাকিতে গিয়া তাহারা ভাবুকতা ও গোঁড়ামীর আশ্রয় লইয়াছে এবং বলিয়াছে, ধর্ম বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ধর্মবিষয়ে যুক্তির দাবী করা হঠকারিতা মাত্র। স্বামীজী এইরূপ অন্ধপরম্পরা মানিয়া লইতে অপারগ। কারণ, ইহাতে ধর্ম বাঁচে না, ধার্মিকও বাঁচিতে পারে না। তিনি দেখিয়াছেন, ইহার ফলে ধর্মের নামে সর্বত্র আচার ও অন্ধবিশ্বাস আসন পাতিয়াছে এবং আধ্যাত্মিকতা বিদায় লইয়াছে। স্বামীজীর মতে ধর্মানুভূতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের

অতীত হইলেও, ধর্মলাভের পথ জগতের সাধারণ ভূমিতেই প্রসারিত, আর ধার্মিক সিদ্ধান্তগুলিও অন্যপথে লব্ধ সত্যের পরিপন্থী হইতে পারে না। মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তাকে বাদ দিয়া ধর্ম শুধু গতানুগতিকতা বা মহাপুরুষের বাণী-মাত্রকে অবলম্বন করিয়া মানবজীবনে প্রকৃত সাফল্য আনিতে পারে না। কারণ, গতানুগতিকতারও তাৎপর্য থাকা আবশ্যক এবং মহাপুরুষের বাণীও বুদ্ধিপূর্বক বুঝিয়া লইতে হইবে। বুদ্ধিমত্তাই মানবের মানবতার পরিচায়ক, উহাকে ছাড়িয়া শুধু অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয় লইলে মানুষ পশুত্বে অবনত হইবে। ধর্ম-মার্গের জন্য এই যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আবশ্যক তাহা পাই যোগশাস্ত্রে। আর তাহার যুক্তিসম্মত দার্শনিক ভিত্তি পাই অদ্বৈত বেদান্তে। অতএব এই উভয় শাস্ত্রের প্রতি তিনি জগতের নিখিল ধর্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আর এই দুই ভিত্তি অবলম্বনে ধর্মসমন্বয়ে এবং ধর্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন। বস্তুতঃ নিজে হিন্দু বলিয়াই তিনি বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রে আকৃষ্ট হন নাই। জগতের ধর্মসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া, মানবপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া এবং স্বানুভূতির সহিত মিলাইয়া তিনি এই উভয় শাস্ত্রকে তাহাদের প্রকৃত মর্যাদা দিতে সকলকে আহ্বান জানাইয়াছেন। আর সম্মুখে রাখিয়াছেন স্বীয় গুরুর বাণী—"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর"।

বেদান্তের কথা উঠিলেই লোকে বলে: "তোমাদের মতে তো 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; অতএব এই দর্শন অবলম্বনে জগতের ধর্মসমস্যা মিটাইতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার"। এই সহজ সমালোচনা স্বামীজীর অবিদিত ছিল না; আর তিনি জানিতেন, ইহার মূলে রহিয়াছে মায়াবাদ সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক ধারণা। মায়া বলিতে মিথ্যাকে বুঝায় বটে; কিন্তু সে 'মিথ্যা' 'শূন্য' শব্দের সমার্থক নহে। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ধারণা আছে, যাহা হয়তো আর অনেকের মতের সহিত মিলে না, যাহা ঠিক বস্তুর অনুরূপ নিছক সত্য নহে, এবং যাহার অনেকখানি স্বকপোলকল্পিত। এক হিসাবে আমরা সকলেই ভাবুক, সকলেই কল্পনাবিলাসী কবি, এবং সকলেই নিজের উপর একটা হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বা মায়াজাল বিস্তার করিয়া জগতের দুঃখ-কষ্টময় বাস্তব রূপকে ভুলিতে অভ্যস্ত। জগৎকে অবিমিশ্র সত্যদৃষ্টিতে না দেখিয়া এই যে মায়িকদৃষ্টিতে দেখা, ইহাই মায়া। এই মায়িকদৃষ্টি সরাইয়া জগতের স্বরূপটিকে যে-দৃষ্টিতে খুলিয়া ধরা হয়, লোকে তাহাকেই বলে 'মায়াবাদ'। প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদ মানে মায়াসৃষ্টি না করিয়া সত্যের স্বরূপ খুলিয়া ধরা, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করা। খোলা চোখে দেখিলে যদিও জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই

থাকে না, তথাপি এই ব্রহ্মবাদে পূর্ববর্তী দৃষ্টিগুলিকেও তাৎকালিক আপেক্ষিক মর্যাদা দেওয়া হয়। বেদান্তদর্শন জানে, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের সহিত এই দৃষ্টিগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; অতএব অধ্যাত্মবিকাশও এই দৃষ্টির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে বাধ্য। কোনটিই নিন্দনীয় নহে, কোনটিই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নহে। অসীমের এক অদম্য আকর্ষণে সমগ্র বিশ্ব ঐ এক ভূমা ব্রহ্মের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর সকলেই একদিন না একদিন সেখানে অবশ্য পৌছিবে—কেহ দুইদিন আগে, কেহ দুইদিন পরে; সকলেই অধ্যাত্মপথের যাত্রী, এমন কি পাপী, পথভ্রান্ত পর্যন্ত। কেহ নিন্দনীয়, কেহ বর্জনীয় নহে। হইতে পারে, কেহ কেহ এই আবর্তনচক্রের গতিবেগের অভিমুখে ধাবিত, কেহ বা ভুলে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেই অনুপাতে আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য ব্রহ্ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে; কিন্তু চক্রের ঘূর্ণনের ফলে এই ভ্রান্তব্যক্তিরও একদা ঊর্ধ্বগতি হইবে এবং অবশেষে সে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবে। অতএব পাপীও ক্ষমার্হ এবং সহানুভূতির ও সমবেদনার পাত্র। বস্তুতঃ "সর্বভূতে সেই প্রেমময়", "দস্যু হরে, প্রেমের প্রেরণ"। এই প্রেমেরই আকর্ষণে জীবজগৎ সচেতন, সক্রিয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ভুল হইতে জ্ঞানে যায় না, নিম্নতর জ্ঞান হইতে উচ্চতর জ্ঞানে উপস্থিত হয়; সে মন্দ হইতে ভাল হয় না; ভাল হইতে আরও ভাল হয়। এই দৃষ্টি অবলম্বনেই জগতে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হইতে পারে; আর সমন্বয়ের সূত্রও এখানেই নিহিত।

এই দৃষ্টিতে অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদে সাধনের সার্থকতা, প্রেম-প্রীতিরও নিজস্ব মূল্য আছে। কারণ, এই সংসার মায়াময় হইলেও ইহাতে ভাল-মন্দ দুই আছে; এবং ভালর সাহায্যে মানুষ সহজে ব্রহ্মোপলব্ধিতে উপনীত হয়। ইহা একটি ব্যায়াম-ক্ষেত্র—যেখানে মানবাত্মা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে নিজের পূর্ণ মহিমা বিকাশের সুযোগ পায়। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা চলে। তেমনি আবার সমাজ-জীবনের অপরিপূর্ণতাসমষ্টির সাহায্যে তাহার অপরিপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করা চলে। এক হিসাবে "আমি জগতের হিত করিব" এইরূপ ধারণা অহঙ্কারপ্রসূত। প্রকৃত সত্য এই যে, জগতের মঙ্গল করিতে গিয়া আমরা নিজেরই মঙ্গলসাধন করি। এই আত্মমঙ্গলপ্রচেষ্টার ফলে অপরের যেটুকু উপকার হয়, সেজন্য আমার কোন দাবী-দাওয়া থাকিতে পারে না; কোন আত্মম্ভরিতার স্থান সেখানে নাই। যে বিরাট আত্মা আমার মধ্যে এবং অন্যত্র ছড়াইয়া আছেন, সেই আত্মার সেবা বা পুজা করা আমার অবশ্যকর্তব্য, "অপরের মঙ্গল হইবে" এই বিশ্বাসে নহে, বরং "আমিই ধন্য হইতেছি" এই বিশ্বাসে। তেমনি আবার অপরের প্রতি অভিশাপ বর্ষণও

নিরর্থক অথবা নিজেরই অমঙ্গলজনক। ধরিয়া লইতে হইবে, জগতের যিনি বিধাতা, জগৎ-পরিচালনের বিধান ও কর্মশক্তি তাঁহার নিকট যথেষ্টই আছে। তিনি ঐজন্য আমার মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া নাই। অতএব অপরকে সংশোধন করিবার বৃথা আস্ফালন ছাড়িয়া অপরে যে পথে চলিয়া নিজ মঙ্গলসাধন করিতে চায়, যথাসম্ভব সেই পথে তাহাকে সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। ইহার ফলে দেখিতে পাইব, অপরের উপর হইতে যেমন যেমন শাসন তুলিয়া নিজের উপর প্রয়োগ করিব, জগতে সুশৃঙ্খলা তেমনি দ্রুত সংস্থাপিত হইবে। কারণ, অপরের গতির ধারা পরিবর্তিত করিয়া স্বধারায় প্রবাহিত করাইবার চেষ্টায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছিলাম, তাহা তখন থাকিবে না। ফলতঃ বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ, ধর্মোন্মাদপূর্ণ সমাজসংস্কারস্পৃহা ইত্যাদিকে একটা রোগবিশেষ বলা চলে। ইহা প্রকৃত ধর্মের বিরোধী।

সকলকে এই স্বাধীনতা প্রদান, তাহাদের প্রত্যেকের নিজের উপর এই শ্রদ্ধার উদ্বোধন ধর্মসংস্কারের প্রথম কথা। এইজন্যই চাই আপ্রাণ প্রচেষ্টা। ধর্ম শুধু একটা জগদ্বিমুখ নেতিবাদ নহে। সে প্রত্যেকের মঙ্গলসাধনচেষ্টা ও সেবা, এবং প্রত্যেকের প্রতি প্রেমপ্রকাশ ও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনপূর্বক উহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সমগ্র বিশ্বে নবীন আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাইবার এবং নবসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করে। অতএব ধর্মের ক্ষেত্র আজ গিরিগুহা ছাড়িয়া সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। ধর্মকে সমাজবিমুখ কিংবা সংগঠনবিমুখ হইলে চলিবে না। ধর্মকে আজ ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে হইবে। দুঃখিতের মুখে হাসি ফুটাইতে হইবে। মূর্খের মুখে বেদান্তের ধ্বনি উঠাইতে হইবে। আর ধর্ম তাহা অবশ্যই পারে। স্বামীজীর মতে, যে ধর্ম মানুষকে মুক্তি পর্যন্ত দিতে পারে, সে সামান্য দুটি অন্নের সংস্থান করিতে পারে না—এ কেমন কথা? ধর্ম তাঁহার মতে একটা সক্রিয়, সবল ও প্রগতিশীল শক্তি; ইহা শুধু মতবাদ নহে, কিংবা নিভৃত ব্যক্তিগত জীবনে ফুটাইয়া তোলার মত কল্পনা-বিলাস মাত্র নহে। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। বিশেষতঃ, ধর্ম হইতেছে অনুভূতিসাপেক্ষ বা অনুভূতিস্বরূপ। আচার-বিচার ও সাধনাদি তো শুধু সেই অনুভূতিকে জাগাইবার অবলম্বনমাত্র। যতক্ষণ অনুভূতি জাগে নাই, ততক্ষণ ধর্মজগতে আমাদের প্রবেশ হয় নাই, বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি মাত্র।

এই অনুভূতির বিষয়বস্তু কে? তিনি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। কোথায় তিনি? তিনি সর্বত্র। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অতএব স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই ধর্ম মানব-সভ্যতার

মৌলিক বস্তু, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ দাঁড়াইয়া আছে। ইহাকে নিষ্প্রয়োজন বলা চলে না, অথবা সমাজ-জীবনে ইহা বিশৃঙ্খলাও আনে না। ধর্মের নামে আমরা যে অধর্মের আশ্রয় লই, তাহাই যত দুঃখের কারণ; প্রকৃত ধর্ম ভগবানেরই মত সর্বত্র সর্বদা মঙ্গলময়। ধর্মের স্কন্ধে স্বামীজী জাগতিক অভ্যুদয়ের এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন; আর ধর্মকে বাঁচিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এত কথার পরও স্বামীজী আবার বলেন: "প্রয়োজনের মাপকাঠিতে ধর্মের যাচাই চলিবে না"। ধর্মের জন্যই ধর্মকে বাঁচিতে হইবে এবং বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। কারণ, ধর্ম তো মানবাত্মার ভগবদভিমুখে, সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে স্বাভাবিক অভিযান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে সমাজসেবার স্তরে নামিয়া আসে এইজন্য যে, সাধারণ ব্যক্তির পথের বিঘ্ন অপসারিত না হইলে সে ধর্মকে চিনিতেই পারে না। "কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন। কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকারে যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে"।

পরলোকে মুক্তি কবে কিভাবে হইবে জানি না, কিন্তু ধর্মের এই নবীন ধারণা মানবাত্মাকে এই জীবনে পূর্ণতা লাভের জন্য পূর্ণ মুক্তি দিয়াছে।
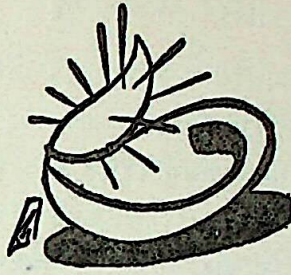
। বিংশ অবদান ।

॥ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদৃষ্টি ও ধর্ম্মদৃষ্টি ॥

আমাদের জীবন আছে, কিন্তু অধিকাংশেরই জীবনের ধ্যান নেই। কিন্তু যাঁরা এই বিশ্ব-পৃথিবীর লোকোত্তর পুরুষ, তাঁরা যেমন শ্রেষ্ঠ জীবনের অধিকারী, তেমনি তাঁদের জীবনেরও একটি মহত্তর ধ্যান আছে। ধ্যানের আলোকরশ্মি দিয়েই তাঁরা জীবনকে দেখেন, জীবনকে গড়ে তোলেন, জীবনের বিচারও করেন। জীবন-জিজ্ঞাসাই জাগ্রত করে তাঁদের আত্মাকে। সেই জাগ্রত আত্মার উজ্জ্বল দীপালোককে মূলধন করে নিয়ে তাঁরা জীবনকে উপলব্ধি করেন, জীবনধর্ম বুঝাতে চান সকলকে; জীবন-তপস্যার আনন্দ-সঞ্চার করেন সকলের হৃদয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লোকোত্তর পুরুষ।

তিনি এই জীবন-জিজ্ঞাসারই অত্যুগ্র প্রেরণায় জীবনের প্রথমভাগে ছুটে গিয়েছিলেন পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন ধর্মের গভীরতর কথাকে। জন্মসিদ্ধ পুরুষের অমৃতবাণীতে চমকে উঠেছিলেন সেদিন; তাঁর জিজ্ঞাসার দিগন্তদেশে প্রত্যাশার সাফল্যকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষও করেছিলেন। জীবনের মহত্তর দিকটি তাঁর চিন্তার জগতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে, এবং সেইদিনের পুণ্যলগ্নটিতেই তার প্রথম আত্মদর্শন ঘটতে আরম্ভ করেছিল। এ ছিল যেন নবযুগের নচিকেতার জীবন-জিজ্ঞাসা, এবং আত্মোপলব্ধির পথ-সন্ধান। জাগ্রত আত্মার একাগ্র সাধনার সার্থক ফলশ্রুতিই আত্মোপলব্ধি, এবং এই আত্মোপলব্ধিতেই আমরা জানি জীবনকে, জানি ধর্মকে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পরম-আত্মোপলব্ধির দ্বারাই আমাদের আত্মোপলব্ধির পথ-নির্দেশ করে দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর নিজের জীবনদৃষ্টি ও ধর্মদৃষ্টির দ্বারা আমাদের জীবনপথকেও নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি একবার জীবনের দিক-নির্দেশ দিয়ে উদাত্তকণ্ঠে

বলে উঠেছিলেন: "একটি আদর্শের জন্যই বেঁচে থাকতে হবে এবং আর কোন শক্তির জন্যে মনের কোণে স্থান রাখলে চলবে না। আমাদের সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে সেই জিনিসটি অর্জন করবার জন্যে, যা' আমাদের কাছ থেকে কোনোদিন দূরে সরে যাবে না; এবং সেটি হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা"।[১] কারণ, সত্যের প্রতি যে-বিশ্বাসের আদর্শ, তাই আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ ও অমঙ্গলকে দূর করার সাহায্য করে সব চেয়ে বেশি। এই আদর্শময় বিশ্বাসই আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে একটি সুগভীর আত্মপ্রত্যয় এবং এই আত্মপ্রত্যয়ের বলেই আমরা বৃহৎ ও মহৎ হয়ে উঠতে পারি, আত্মিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠি আমরা। আমাদের জীবনের গভীরে রয়েছে যে একটি অপরিমেয় অসীমের ঢেউ, সেই অসীমের বোধশক্তি যখন আমাদের মধ্যে জাগে, তখন আমরা আর নিজের জীবনের ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর গণ্ডীর মধ্যে নিজেদেরকে বেঁধে রাখতে পারি না, একটি বৃহত্তর আত্মোপলব্ধির মধ্যে আমরা জেগে উঠি; এবং বুঝতে পারি অসীমের এক অনির্ণেয় উৎস থেকে এক অপরিসীম শক্তি এসে আমাদেরকে শক্তিমান করে তুলছে, যেমন সূর্যরশ্মি ফুলকে তার দলগুলিকে মেলে ধরবার শক্তিদান করে। এই শক্তির প্রত্যয়েই বুঝতে পারি নিজের জীবনকে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই। এই জীবনের চিন্তা থেকেই বুঝা যায় আত্মা এবং ধর্মকে। জীবনের গভীরে যে আত্মা, তার উপলব্ধিতেই জীবনের সামগ্রিক সত্য এসে ধরা দেয়। ব্যবহারিক জীবনের দিকে আমরা ক্ষুদ্রত্বের দ্বারা পীড়িত ও অনেক সময় নীচতার দাসত্বে জড়িত, সেইজন্যই নিজেদেরকে আমরা ভাবি ছোট এবং সীমিত, আর সেইজন্যই আসে আমাদের মধ্যে বহুবিধ দুঃখ ও যন্ত্রণা। এই দুঃখ ও ঝঞ্ঝার মাঝখানে থেকেও আমাদের মানসিক ভারসাম্যকে রক্ষা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যে, আমরা অসীমের দ্বারা বিধৃত; পরম অসীমের শান্ত চেতনায় আমাদের সত্তা পরিপূর্ণ। তাই জীবনের সম্বন্ধে স্বামিজীর বাণী জাগে,—'আমরা সকলেই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে-জিনিসটির সন্ধানে বের হয়ে পড়েছি, সে এমন একটা কিছু যার মধ্যে অসীমের রং আছে; যা' মুক্ত আমরা কেবল তাকেই চাই'।[২] অসীমের চিন্তাতেই যে মুক্তি! শুধু তাই নয়,

---

(১) Live for an ideal, and leave no place in the mind for anything else. Let us put forth all our energies to acquire that which never fails—our spiritual perfection. (—*Hints on Practical Spirituality*,—Complete Vol. II)

(২) And the fact is that we are, and that consciously or unconciously we are all searching after that something which is infinite; we are always seeking for something that is free. (*The Open Secret*—Com. Vol. II)

স্বামিজীর মতে জীবন একটি ক্রীড়াক্ষেত্র ; এখানকার খেলা যত স্থূল এবং এখানে যত আঘাত ও সংঘর্ষই আসুক না কেন, এখানে সর্বদাই আছে একটি আত্মার উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং সে কখনও পীড়িত হয় না। কারণ তার উৎসমূল যে সেই পরম শান্ত অসীমে। সেজন্যই তার মধ্যে নেই কোনো ভীতি, নেই সংশয় বা মৃত্যু। ক্রোধ, হিংসা, অন্যায়, মৃত্যু কোন কিছুই তার কাছে আসতে পারে না ; কারণ, সে যে অসীম কিংবা ভূমারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই জীবনের সর্ববিধ দুঃখ বা গ্লানির গভীরেও এই আত্মাই পাঠিয়ে দেয় অভয়ের স্নিগ্ধরশ্মি, মানুষকে জাগিয়ে তোলে নিজস্ব সত্তার বিপুল প্রত্যয়ে, অনন্ত সত্যের অপরূপ এক আনন্দময় উপলব্ধিতে। এইখানেই জীবনের গভীরে আছে অনন্ত সৌন্দর্য ও জ্ঞানের আধার। এইভাবেই জীবনের চিন্তা থেকে আসে আত্মা ও ধর্মের কথা। সত্য আমাদের ভেতরে জন্মগত অধিকারের মতোই আছে, আমাদের শুধু একে প্রকাশ করতে হবে, উপলব্ধির সঙ্গে সকলের করে তুলতে হবে। তা' না হলে জীবনের কোন অর্থই হয় না।

এইজন্য জীবনে ও মনে চাই অপরিসীম শক্তি। শক্তি যদি না লাভ করা যায়, তবে এ যে মৃত্যুরই তুল্য। দুর্বলতার মধ্যেই অন্তহীন দুঃখের প্রবাহ। তাই তাঁর বাণীতে ধ্বনিত হয়: 'শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তি, আনন্দ, জীবন শাশ্বতকালের, অমর ; দুর্বলতা একটি বিরামহীন বেদনা ও দুঃখ'।[৩] এ যেন সেই মুণ্ডকোপনিষদের ঋষিবাণী:

> নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
> ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

স্বামিজীর মতে জীবনের সঙ্গে একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে ; কারণ, এই প্রত্যয়ই মানুষকে একটি আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। তাই নিজের উপর অর্থাৎ নিজের আত্মার উপর যদি বিশ্বাস রাখা না যায়, তবে তা' নাস্তিকতারই পর্যায়ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছেন: "সেই-ই নাস্তিক, যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখে না"।[৪] জীবনে অভ্যাস করতে হবে সেই সাহসিকতা, যা জানতে চাইবে সত্যকে, দেখাতে চাইবে জীবনের সত্যকে, মৃত্যু-ভীতিতে কম্পিত হবে না হৃদয় বরং মৃত্যুকে স্বাগত জানাবে। জীবনের অকৃতকার্যতাকে মনে

---

(৩) **Strength is life ; weakness is death. Strength is felicity, life eternal, immortal ; weakness is constant strain and misery : Weakness is death.**

(৪) **He is an atheist who does not believe in himself. (—*Practical Vedanta*)**

ঠাঁই দেওয়া যাবে না, বরং এর মধ্যেই যে জীবনের সৌন্দর্য তাই উপলব্ধি করতে হবে। কোনরূপ ব্যর্থতাকে বাদ দিয়ে তো জীবন বলে কিছু গড়ে ওঠে না, সংগ্রামহীনতার মধ্যে জীবন হয়ে ওঠে নিষ্প্রভ। জীবনের কাব্যধর্মই যেন ওই সংগ্রামের মধ্যে। তাই জীবনে কোন ভুল বা সংগ্রামকে ঠাঁই দিলে চলবে না। ভুল তো মানুষের জীবনে আছেই, একে বাদ দিয়ে তো জীবন হয় না। মিথ্যে কথা তো মানুষেই বলে, গোজাতির মুখ দিয়ে তো উচ্চারিত হয় না। কাজেই জীবনের কোন ব্যর্থতা কিংবা পেছনের কোন নিন্দাবাদকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কেবল সামনে ধরে রাখতে হবে একটি মহত্তর আদর্শ, আর সহস্র ব্যর্থতার মাঝখানে থেকেও উচ্চারণ করতে হবে পুনঃ প্রচেষ্টার শপথ-বাণী। সেই মহত্তর আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সব-কিছুর মধ্যেই দেখতে হবে ভগবানকে। নিজের প্রতি বিশ্বাসের অভাব থাকলে সকল দিকের নিষ্ফলতার অন্ধকার তাকে ঘিরে থাকে, না পায় কোন জীবনের সন্ধান, না লাভ করে পূর্ণতম আনন্দের অমৃত-আস্বাদ। তাই বিবেকানন্দের বাণীতে জাগে,—প্রাচীনকালের ধর্ম তাকেই নাস্তিক বলে, যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী; আর আধুনিককালের নূতন ধর্ম নিজের উপর অবিশ্বাসীকেই বলে নাস্তিক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ঠিক এমন কথাই বলেছেন: "মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে অন্যকে এবং ঈশ্বরকেও চিনতে পারে"। সত্যধর্মের শাশ্বত-বার্তাই ধ্বনিত হয়েছে দু'জনের এই কথাগুলিতে।

জীবনের গভীরতর বোধের সঙ্গে চিরদিন সংযুক্ত রয়েছে ধর্মবোধ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচিন্তা তাঁর ধর্মাদর্শের মধ্যে এসে নূতনতম এক আনন্দলোক সৃষ্টি করেছে; সেই উপলব্ধির আনন্দলোক থেকে তিনি স্পষ্টভাবে বলতে পেরেছেন: "যদি ভগবান বলে কেউ থাকেন তাঁকে আমাদের দেখতে হবে, আত্মাকে অনুভব করতে হবে আমাদের মধ্যে। যদি তা' না হয়, তবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করাও ভালো। কারণ, ঈশ্বরকে পূজো করার মধ্য দিয়ে আমরা নিজের সংগোপন সত্তাকেই তো পূজো করি"।[৫] আমার মধ্যেও যে সেই অনন্ত অসীম! ধর্ম একটি সত্যের প্রশ্ন, কথা নয়। আমাদের আত্মাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে তার ভেতরে কি আছে; উপলব্ধি করতে হবে, যা' উপলব্ধ হয়েছে। সেইটিই কেবল ধর্ম। শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যার দ্বারা কখনো ধর্মকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মার গভীরে যথার্থ উপলব্ধির মধ্য থেকেই ধর্মের উদ্ভব; এবং সেই প্রাথমিক ধর্ম-বুদ্ধির উৎসমূল থেকেই সত্যকার নৈতিক আদর্শ গড়ে ওঠে এবং ভগবানকে

---

(৫) In worshipping God, we have been always worshipping our hidden-Self.

লাভ করি আমাদের অন্তরে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় তাই ধ্বনিত হয়: "যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে তিনি আমাদের অন্তরের গভীরেই আছেন"।[৬] বেদান্তও তাই বলেন: 'ধর্মকে উপলব্ধি কর, কেবল কথায় কিছু হয় না'। গভীরতম উপলব্ধিই তো ধর্ম, কোন নীতিবাক্য বা রাজনীতির মধ্যে ধর্ম নিহিত নয়। সকল ধর্মের পূর্ণতাই ঘটে আত্মার গভীরে ভগবানের উপলব্ধিতে। এই উপলব্ধির পথে রীতি বা ভাবের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ঐটিই হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। তাই জীবনকে একটি পবিত্র আধার মনে করে আমাদের প্রতিমুহূর্তে কাজ করে যেতে হবে, ভগবান আমাদেরই মধ্যে আছেন এই চিন্তায় নিজেদেরকে প্রবুদ্ধ করতে হবে; আমাদের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি অনুভবে তিনি আছেন, এ আমাদের একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের মধ্যে যে বিরাট এক অসীমের আনন্দবোধ আছে, সেটিকে উপলব্ধি না করলে চলবে কি করে? বেদান্ত বলেন, অজ্ঞানতাই এ আমাদের বুঝতে দেয় না। বিরাট নদীর তটভূমিতে বসে আমরা পিপাসার্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি, বিপুল খাদ্যস্তূপের মাঝখান থেকে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে মরছি; কিন্তু আমরা কিছুতেই দেখি না, এই পৃথিবীর বুকে কি অপরূপ কল্যাণ-আশীর্বাদ পুষ্পের মত পরিস্ফুট হয়ে আছে। ধর্মই আমাদের সাহায্য করে এই অসীম আনন্দস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে এবং এই আনন্দময়তার উপলব্ধির জন্য প্রতিটি অন্তরেই রয়েছে এক অপরিসীম ব্যাকুলতা। এই প্রসঙ্গেই স্বামিজী বলেন: 'এর জন্যই সমস্ত জাতির অনুসন্ধান, এই হচ্ছে ধর্মের একমাত্র গন্তব্যস্থল এবং এই আদর্শই বিভিন্ন ধর্মের বিবিধ ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে'।[৭] উপলব্ধির অমৃতকান্তিতেই ধর্মের আনন্দরশ্মির উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ, আমাদের আত্মাকে স্বামিজী ঐখানেই ডাক দিয়েছেন।

কিন্তু দুর্বলের দ্বারা এই ধর্ম কখনই অর্জিত হয় না, আমাদের সকলকে আত্মিক শক্তিতে দৃঢ় হতে হবে। স্বামিজীর কথায় ভগবানের কাছে দুর্বল কখনও পৌঁছাতে পারে না, কাজেই দুর্বল হওয়া কিছুতেই চলবে না।[৮] আমাদের মধ্যে যে অনন্ত শক্তির উৎস আছে, এটুকু বুঝতে পারলেই অসীম শক্তিতে

---

(৬) If there is a god, He is in our own hearts.

(৭) If has been the search of all nations, it is the goal of religion, and this ideal is expressed in various languages in different religions. (*—God in Everything—Complete Works* vol. II)

(৮) God is not to be reached by the weak. (*—Religion of Love*)

শক্তিমান হয়ে উঠবো আমরা। ঠিক সেজন্যেই আমাদের মধ্যে যে পাপ আছে তার চিন্তা দূর করতে হবে, কারণ বেদান্ত কখনও কোনরূপ পাপকে স্বীকৃতি দেয় না, তা কেবল স্বীকার করে জীবনের ভুলকে। কিন্তু নিজেকে দুর্বল কিংবা পাপী ভাবাই সবচেয়ে মারাত্মক ভুল; কারণ এই ভ্রান্তিই সমস্ত কাজ করার স্পৃহাকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, যেমন নষ্ট করে কোন অদৃশ্য কীট গাছের নিগূঢ়তম জীবনীশক্তিকে। তাই দুর্বল হলে যেমন ধর্ম হয় না, তেমনি ধর্ম হয় না পেটের চিন্তাতে অস্থির থাকলে। স্বামিজী তাই বলেছেন: 'ধর্মকথা শুনাতে হলে আগে এ-দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না। * * কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি, আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে, প্রথম অন্ন-সংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা'। এখানেই দেখি বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দকে,—দেখি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিধ সমস্যা ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে ধর্মকে জীবনোপযোগী ও বিশ্বজনীন করে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে। বতমান জগতে ধর্মের যে একটি জাতীয় রূপ (national form) গড়ে উঠেছে, তাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি; এবং এজন্যই তাঁকে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে শুনি: 'যদি কোন ধর্ম যে কোন অবস্থার যে কোন মানুষকে সাহায্য করতে না পারে, সে-ধর্ম বিশেষ কোন কাজে আসে না; সে শুধু থেকে যায় কয়েকজন নির্দিষ্ট লোকের ভাবকল্পনার মধ্যে'।[৯] সেজন্যই ধর্মকে প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে সকল অবস্থাতেই মানুষকে সাহায্য করার জন্য; সে-মানুষ দুঃখে থাক, সুখে থাক, পাপ কিংবা পবিত্রতার মধ্যে থাক, সে যা' কিছুই হোক না কেন, কোন কিছু বিচার না করে তাকে কেবল অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা আনন্দিত করে তুলতে হবে। উচ্চতর জীবনচিন্তার দিক দিয়ে পথ করে নিলে সমস্ত বিভেদবুদ্ধিই যে চলে যায়! এই মহৎ কাজের মধ্যদিয়েই মূর্ত হয়ে উঠবে বেদান্তের সমুচ্চ আদর্শ ও ধর্মের যথার্থ মহত্ত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের যে আদর্শ, সেই আদর্শ বাস্তবায়িত হয় বাস্তব সাধনার মাধ্যমে। ভাবসাধনার কল্পলোকে এর ভিত্তিভূমি নয়, এর সুকঠিন ভিত্তি হচ্ছে আত্মোপলব্ধিতে

---

(৯) If a religion cannot help man wherever he may be, wherever it stands, it is not of much use; it will remain only a theory for the chosen few. *(—Practical Vedania)*

এবং তার উৎস জাগে সেই শক্তি-সাধনার মধ্যে। তাই এই জীবনসাধনা নিজের ব্যষ্টিসীমাকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে সুবিপুল সমাজ তথা মানবসেবার মহত্তর আদর্শের দিকে। এই উপলব্ধির আলোকরশ্মিতেই ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের মাটিতে। বিবেকানন্দের জীবনে এই উপলব্ধিতেই মানুষ হয়ে উঠেছেন ভগবান। তাই বিবেকানন্দের ভাষায় এই কথাই জেগে ওঠে: 'প্রত্যেকটি মানব মানবী স্পর্শযোগ্য, আনন্দময় জীবন্ত ঈশ্বর। কে বলে যে ভগবান অজ্ঞাত? কে বলে তাঁকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে'?[১০] ঘরের এবং বাইরের মানুষকে বেদান্তের নির্দেশে যখন ভগবান বলে গ্রহণ করা যায়, তখনই যেন সত্যকার ভগবানকে লাভ করা হয়; আর এই ভগবদ্ উপলব্ধিতেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এসেছিল মানবসেবাধর্মের বৃহত্তর আদর্শ। সেজন্যই তাঁর ধর্ম মানবধর্ম। যে ধর্ম মানুষের জীবনে কোন প্রত্যক্ষ কাজে আসে না, কেবল পুঁথিতে আবদ্ধ থাকে, তাকে তিনি ধর্মই বলতে চান নি। নিজের উপলব্ধির জগতে সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে মানবসেবার এক অপরূপ রূপ দিয়ে বিশ্বের কাছে তিনি মানবতার ধর্মকে উপস্থাপিত করেছেন; এবং এই সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাবেত্তাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদনও করেছেন। শ্রদ্ধামাধুর্যের মর্মনিষেকে সবকিছুকেই তিনি মধুময় করে তুলতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে এও তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশের পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, তবে ধর্ম কখনো নিজের রূপ নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে না। তাই অনুভব করেছিলেন, আগে দেশকে ধর্মের উপযুক্ত করে নিতে হবে। ঠিক সেই কারণেও অর্থাৎ দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্মেরও একটি মহত্তর দিককে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে তাই একটি কর্মেরও দিক আছে। যে-শক্তি আসে আত্মিক উপলব্ধিতে, বিবেকানন্দ তাঁর জীবনসত্যে সেই অমৃত শক্তিকেই গ্রহণ করেছিলেন। এই শক্তির দৈন্য ব্যক্তি এবং সমাজের অভিশাপস্বরূপ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও তিনি বুঝেছিলেন যে, আত্মিক শক্তির সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও প্রয়োজন আছে, কারণ দেহের দুর্বলতায় আত্মিক শক্তিরও অপচয় ঘটে। তাই বিবেকানন্দ আত্মিক মুক্তির সাধনার চেয়ে কখনো কখনো দেহের উন্নয়নকারী ফুটবল খেলাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ধর্ম এবং মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে গেলে এই দুটি শক্তিরই একান্ত প্রয়োজন।

---

(১০) Every man and woman is the palpable. blissful, living God. Who says God is unknown? Who says He is to be searched after? (—*Practical Vedanta*)

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসের ত্যাগমহিমার আলোকমণ্ডলে জীবন তাঁর উদ্ভাসিত। কিন্তু ধর্মচারণার পথে আমাদের দেশের চিরাচরিত সন্ন্যাসের চেয়ে তাঁর সন্ন্যাসের পার্থক্য আছে। তিনি সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী; অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয়কারী সন্ন্যাসী। সেইজন্য একদিকে তিনি ব্রহ্মবাদী, আর একদিকে কর্মবাদী। বৈদান্তিক বা ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দ প্রতিটি জীবের মধ্যে যেমন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি ছিলেন তিনি সুতীক্ষ্ণ মননশীলতার অধিকারী; এই মননশীলতাই তাঁর মৌলিক চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ করে জীবনকে বুঝতে শিখিয়েছে, দেশের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিময় করে তুলেছে, দেশের মঙ্গলভাবনায় তাঁর চিত্তকে নিমগ্ন করে রেখেছে। তাই তিনি সংসারত্যাগী গেরুয়াবসনধারী সন্ন্যাসী হয়েও কর্মযোগী। ধ্যানের গহনলোকে নিমগ্ন থেকে যেমন তাঁর আত্মানুভূতির গভীরতা এসেছে, যেমন এসেছে জ্ঞানের পরিপূর্ণতার রশ্মি, ঠিক তেমনি এসেছে কর্মস্পৃহা; স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মকে জগতের কাছে তুলে ধরবার অপরিসীম আকুতি। স্বধর্মের মধ্যে মানবতাবোধের একটি স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারকে তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই চিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের উদারতর দিকগুলির উজ্জ্বল প্রতিপাদনে উদাত্ত কণ্ঠের বাণীকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আর কর্মবাদী বিবেকানন্দ সুগভীর মানবতা-বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরের হিতের জন্য জীবনের সমস্ত কর্মকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মতে জীবন কোনরূপ কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না; কাজেই কর্ম যা হবে, তা' মানবহিত কর্ম। এই সুন্দর উদারতর কর্মের মধ্যেই তাঁর ধর্মবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশীয় ধর্মাচরণের আর একটি দিকের উপর দৃষ্টি পড়ে এবং সেটি হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক প্রতিমা-পূজার দিক। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সত্যসন্ধানী ধর্মবুদ্ধির মঙ্গলজ্যোতিকে অন্তরে জ্বালিয়ে নিয়ে এই দিকটিকে তুচ্ছ করে দেখতে পারেন নি। তিনি তাঁর উপলব্ধির দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন: "ধর্মাচরণের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ এই স্থূল দিকটিও কোনরূপ ভ্রান্তির দ্বারা ঘেরা নয়। এও একটি সত্যের থেকে সত্যের অভিমুখে যাত্রা,—নিম্নতর সত্যের থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে অভিযাত্রা। অন্ধকারকে শুধু অন্ধকার বললে চলবে না, বলতে হবে কম আলো; তেমনি মন্দকে বলতে হবে কম ভালো, অপবিত্রতাকে কম পবিত্রতা"।[১১] সব কিছুকেই আমাদের একটি সহনশীলতা এবং সহানুভূতির

(১১) This is one of the great points to be remembered, that those who worship God though ceremonials and forms, however crude we may think

দৃষ্টিতে দেখতে হবে, তবেই আমাদের মর্মলোক আলোকিত হয়ে উঠবে সত্যের নির্মল আলোতে, জীবনের তটভূমিতে আসবে নূতন সমুদ্রের আনন্দিত কলগান।

তিনি ধর্মবোধের এই গভীরতাকে বুকে নিয়েই ভাবীকালের মানবধর্মকেও একটি বিশালতর পটভূমিকায় রূপময় করতে চেয়েছেন। যেহেতু ধর্ম অসীমকে উপলব্ধি করার একটি প্রবলতর শক্তি, চরিত্রকে গড়ে তোলা ও প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই মহৎকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি বিপুল প্রেরণা, নিজের অন্তরে এবং অপরের মনে শক্তিসঞ্চারের একটি অমোঘ সত্য, ঠিক সেই হেতুই ধর্মকে আমাদের মূল-শক্তি এবং ভাবীকালেরও নিয়ামক বলে' গ্রহণ করতে হবে। ধর্মের ক্ষেত্র থেকে সমস্ত সংকীর্ণ মনোভাব বিসর্জন দিতে হবে, পূর্বে যা' ছিল, তার থেকে আরও প্রশস্ত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দিতে হবে তাকে। কারণ ধর্মই যে অনন্ত জীবনের অধিকারী করে মানুষকে পশুত্বের নিম্নস্তর থেকে ঈশ্বরত্বের পর্যায়ে নিয়ে তাকে ঠাঁই দেয়। সেইজন্য সমস্ত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত ধর্মভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে মনের আকাশ থেকে মুছে ফেলতে হবে। মানব-মনের ভাবাকাশ যতই প্রশস্ত হবে. তাঁর আধ্যাত্মিক পদক্ষেপও সেই অনুপাতে হ'য়ে উঠবে প্রশস্ততর। স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, আজ এমন একটি সময় এসেছে, যে সময়ে কেউ পৃথিবীর সব কয়টি দিগন্তকে স্পর্শ না করে কোন একটি চিন্তারেখাও আঁকতে পারবেন না ইতিহাসের পৃষ্ঠায়; তাই ভাবীকালের সবগুলি ধর্মেই একটি বিশ্ব-জনীনতা আসবে, আসবে ভুবনস্পর্শী ব্যাপকতা। ঠিক সেজন্যই ভাবীকালের ধর্মীয় আদর্শ পৃথিবীর সব কিছু মহৎ আদর্শকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে সমস্ত কিছুর বিকাশ সাধনের জন্য দেবে অপরিসীম সুযোগ ও প্রেরণা। এই সঙ্গে এ'কথাও মনে রাখতে হবে যে, অতীতের যা কিছু ভালো তা' সংরক্ষণ করে ভাবীকালের দরজাকে খুলে রাখতে হবে আরও যথার্থ সত্যকে গ্রহণ করার জন্য।[১২] বিবেকানন্দ তাঁর জীবনে দেখেছেন, অনেক অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি

---

them, are not in error. It is the journey from truth to truth, from lower truth to higher truth. Darkness is less light, evil is less good ; impurity less purity. (—*Practical Vedanta*, II)

(১২) The religious ideals of the future must embrance all that exists in the world and is good and great, at the same time, have infinite scope for future development. All that was good in the past must be preserved; and the doors must be kept open for future additions to the already existing store.

(—*The Necessity of Religion—Complete Works*, vol-II)

আছেন যাঁরা সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁরাই সাধারণের চেয়ে আরও অনেক বেশি ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন; কারণ তাঁদের ধর্মভাবনা ব্যক্তিগত ঈশ্বর-ভাবনাকে ত্যাগ করে এক নৈর্ব্যক্তিক এবং অসীমের নৈতিক ভাবনার মধ্যে আশ্রয় লাভ করে সমস্ত সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। ধর্ম যখন এরূপ এক উদারতর বিপুল পটভূমিকায় এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করে, তখন তার মঙ্গলসাধনের শক্তিও অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এই ধর্মই সংকীর্ণতা ও সীমিত বুদ্ধির দ্বারা পৃথিবীর যে ক্ষতিসাধন করে, সেই ক্ষতিপূরণের শক্তি অনেক দিনই এই পৃথিবীর বুকে আর ফিরে আসে না। স্বামিজী এটুকুও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্ম আবার নূতনভাবে গড়ে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করছে। ধর্মের প্রশস্ততর এবং সুমার্জিত রূপ নব শক্তি নিয়ে মানবজীবনের প্রতিটি অংশেই নিজের প্রভাবকে সঞ্চারিত করছে।[১৩] যতদিন এই ধর্ম কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি লোক কিংবা ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়ের হাতে ছিল, ততদিন এ' কেবল নিবদ্ধ ছিল মন্দিরে, গির্জায়, পুঁথি-পুস্তকে এবং গোঁড়ামিপূর্ণ আনুষ্ঠানিক সমারোহের মধ্যে; আর যখন আমরা যথার্থ আধ্যাত্মিক এবং বিশ্বজনীন ভাবাদর্শকে ধর্মের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে শিখেছি, তখনই তা হয়ে উঠেছে যেন জীবন্ত এবং প্রকৃত ধর্ম। তিনি অন্তরের গভীরে এই বিশ্বাসই পোষণ করে গিয়েছেন যে, এই ধর্মই আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মিশে যাবে, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিচালিত করবে কল্যাণের পথে, সমাজকে উন্নীত করবে সার্বজনীন মাঙ্গল্য রচনার শ্রীক্ষেত্রে। এরজন্য চাই কেবল আমাদের আন্তরিক সাধনা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ এবং সশ্রদ্ধ মানসিকতা।

এই বিপুল ব্যাপ্ত মানবধর্মই স্বামিজীকে যেমন বিশ্বপ্রেমিক করেছে, তেমনি করেছে স্বদেশপ্রেমিক; আর এজন্যই তিনি সন্ন্যাসী হয়েও কর্মযোগী। এইজন্যই তিনি আমেরিকায় ধর্মের চিরন্তন সত্যকে প্রচার করতে যেয়েও নিভৃত রাত্রির নির্জন প্রহরে চোখের জলের ধারা ফেলে স্মরণ করেন দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে, যারা বুভুক্ষু হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য। আবার এজন্যই তিনি বলেন, যে ধর্ম বা ঈশ্বর সর্বহারা বিধবার বেদনাশ্রু মুছে দেয় না, এক টুকরো রুটি দেয় না অন্নহীন অনাথের মুখে, সেই ধর্ম বা ঈশ্বরকে তিনি

(১৩) To me it seems that they have just begun to grow. The power of religion, broadened and purified, is going to penetrate every part of human life. (—*The Necessity of Religion*, vol-II)

বিশ্বাস করেন না। কারণ, ধর্ম যে দেবে শান্তি, দেবে সকলের কাছে সমানাধিকার, দেবে অমৃতের পুত্রত্বের উত্তরাধিকার; আর নিজের আত্মার গভীরে যে ঈশ্বর তিনি দেবেন কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা। আত্মিক চেতনার বলিষ্ঠ নির্দেশেই যে মানুষ হয়ে উঠবে শক্তিমান, আর সেই শক্তিতেই বুঝে নেবে নিজের সত্যকে। সেই সত্যোপলব্ধিতেই একজন শান্ত করবে অন্যের বেদনাহত হৃদয়ের আর্তক্রন্দনকে, অন্ন দেবে নিরন্নকে, অসীম বা ভূমাকে প্রত্যক্ষ করবে প্রতিটি মানুষের মুখাকৃতিতে। এর মধ্যেই তো সত্য, এর মধ্যেই তো সত্যকার জীবন, এর মধ্যেই শাশ্বতকালের ধর্ম। এই ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বামিজী উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উদাত্তকণ্ঠে বলেন: 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'। স্বামিজীর ধর্মবাণীর সঙ্গে এইখানেই জীবনের জ্ঞানযোগের গঙ্গোত্রী-সম্মেলন। আবার তাঁর ধর্মচিন্তার সঙ্গে জীবনের জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ যেন এক হয়ে মিশে গিয়েছে। এইজন্যই স্বামিজী জীবনের ধর্মসাধনার পথে শ্রীগীতার পুণ্য বাণীরও উচ্চারণ করেছেন অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে। স্বামিজী তাই নূতন জীবন ও ধর্মবাণীর অবিস্মরণীয় যুগপুরুষ।
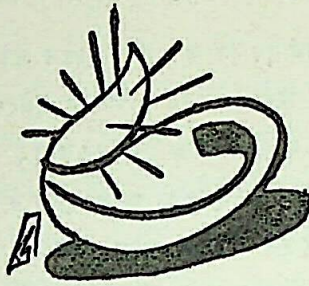
॥ একবিংশতি অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তা ॥

স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে মনে হয় তাঁর দর্শনখানি গড়ে উঠেছে দুটি মূল উপাদান হতে। তার একটি হল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং অপরটি হল বুদ্ধের সার্বজনীন প্রেম। প্রাচীন ভারতের এই দুই মনীষীর চিন্তাধারা যে তাঁর উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শঙ্করাচার্যের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, দক্ষ বিশ্লেষণনৈপুণ্য এবং যুক্তি-সম্মত চিন্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁর মনে হয়েছিল শঙ্করাচার্য-প্রচারিত বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত।

অপরপক্ষে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা নীতি তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। ঠিক বলতে গেলে বলা উচিত বুদ্ধকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। বুদ্ধের চিন্তায় আত্মার স্বীকৃতি নেই, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই। এগুলির তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বুদ্ধ জীবন-যন্ত্রণা হতে মুক্তির জন্য সকল মানুষকে ভিক্ষুর ব্রতে আহ্বান করেছিলেন। তাতেও তাঁর অনুমোদন ছিল না। এই কারণে তিনি একস্থলে তাঁকে গয়াসুর বলে অপবাদ দিয়েছেন। তা' সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধের চরিত্রের একটি গুণ তাঁর শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তা' হল তাঁর সকল জীবের প্রতি সুগভীর প্রেম। তাঁর কারুণিকত্ব বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

এই দুই মহামনীষীর প্রভাব তাঁর ওপর কত অধিক ছিল তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হতে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন: "তারপর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহৃগুণ; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই

প্রখর জ্ঞানসূর্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূর্ণ হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চহৃদয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হইবে"। (জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৫)

এই মণিকাঞ্চনযোগ যেন বিবেকানন্দ-দর্শনেই ঘটেছে! দর্শনের যে আদর্শ তিনি মানসপটে স্থাপন করেছিলেন, তা' নিশ্চিত তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে আমরা দেখি তাঁর দর্শনে দুটি ভাগ আছে: তাদের প্রথমটিকে জ্ঞানকাণ্ড বলতে পারি এবং দ্বিতীয়টিকে কর্মকাণ্ড বলতে পারি। প্রথমটির আলোচনার বিষয় হল বিশ্বের স্বরূপ কি, তা' জ্ঞানসম্পর্কিত সমস্যার উত্তর দেয়। দ্বিতীয়টির আলোচনার বিষয় সংসারজীবনে মানুষের কর্তব্য কি, তা' কর্তব্য কর্মসম্পর্কিত সমস্যার উত্তর দেয়। জ্ঞানকাণ্ডে যে দর্শনরূপ নিয়েছে, তার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের কোন ভেদ নেই। ঠিক বলতে গেলে এ' বিষয় বিবেকানন্দ কোন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেন নি। তিনি শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাত বেদান্তকে গ্রহণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এখানে তিনি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ভাষ্যকার।

অপরপক্ষে কর্মকাণ্ডে তাঁর যে দার্শনিক চিন্তাধারা বিকাশলাভ করেছে, তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মত স্থান পেয়েছে। এখানে তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তাঁর নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত প্রপঞ্চময়, স্বপ্নের মত তা' অসার। তাঁর সবথেকে বড় আকর্ষণ হল আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। সাধারণত সেক্ষেত্রে দয়া, মায়া, মমতা বা করুণাবোধ প্রণোদিত হয়ে সমাজসেবার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। এইখানেই কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়বৃত্তিও যে খুবই প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে-জন্যই বোধহয় তার দাবীকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিকূলতা সত্বেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ফলে আমরা তাঁর দর্শনে পাই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ। এই ভাবেই তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের রূপসম্বন্ধে বিবেকানন্দের দার্শনিক মতের সহিত পরিচিত হতে হলে আমাদের শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করতে হবে। তাঁর অদ্বৈতবাদের সহিত আমাদের দেশের মানুষ অল্প-বিস্তর পরিচিত।

এমন কি সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও তাঁর সম্বন্ধে একটি ধারণা আছে। শঙ্করাচার্য-প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্ব মায়াবাদ নামেই বেশী পরিচিত। মায়াবাদ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে, এ' হল সেই দার্শনিক তত্ত্ব যা বলে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'।

কিন্তু শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার করেছেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তিনি ঠিক এমন কথা বলেন নি যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বহুবিশ্লিষ্ট বস্তুসমন্বিত জগৎ সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বরং বলেন যে তা'ও সত্য, তা'ও ব্রহ্মতেই অধিষ্ঠিত। তবে তাকে দেখার ভুলে আমরা বহু ও বিচিত্র রূপে দেখি। জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও জগৎ একই ; তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগৎ সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় এনে দেয় না।

কথাটা অন্যভাবে বুঝাতে চেষ্টা করা যাক্। বিশ্ব কি বহুবিশ্লিষ্ট সম্পর্ক-বিহীন বস্তুর সমষ্টি, না একই সত্তার প্রকাশ? এটি হল দর্শনের একটি মূল সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিশ্ব অসংখ্য-বিশ্লিষ্ট, বিক্ষিপ্ত বস্তুর সমষ্টিমাত্র। আমাদের দেশে বৈশেষিকদর্শন এই ভাবেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিমক্রাইটাসও এক অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বহুবিশ্লিষ্ট অণুর সমষ্টি নিয়ে বিশ্ব রচিত।

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, বিশ্বে ঠিক বিশ্লিষ্ট নানা বস্তুর সমাবেশ নেই। যাকে বহু ও বিচিত্র রূপে আপাতদৃষ্টিতে দেখি তার বিভিন্ন অংশের মধ্যেও সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্য-ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক চিন্তাধারা এক নূতন পথে যায়। ফলে একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম হয়, যাকে বলে বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক। বিশ্ব সরলভাবে একক বস্তু নয়, তা' জটিলভাবে এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে, কিন্তু সেই বিভাগগুলির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গীসম্পর্ক বর্তমান। তাদের বহুত্বকে ব্যাপ্ত ক'রে একত্ব প্রকট।

শঙ্করাচার্য এই দুই শ্রেণীর দার্শনিক মতের কোনটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বহুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তো বটেই, এমন কি বহুবিশ্লিষ্ট জটিল একবাদকেও তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। তার মধ্যে বহুর স্থান নেই, বিভাগের অবকাশ নেই। তাকে তিনি ব্রহ্মন্ বা আত্মন্ বলেছেন। তার প্রকৃতি হল চেতনা-রূপ। তাই তাকে তিনি নির্বিশেষ চিন্মাত্রম্ বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাঁর প্রকৃতি চিন্ময়, যেমন লবণ খণ্ডের প্রকৃতি লবণের আস্বাদময়। সাধারণক্ষেত্রে চিৎশক্তিবিশিষ্ট সত্তার চিৎ-

শক্তি প্রকাশ হয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে। জানবার বস্তু একটা থাকা চাই, তবেই তো জ্ঞাতার জানবার শক্তি প্রকট হবে। জানবার বস্তু কিছু না থাকলে মানুষের মন জানবে কি? কিন্তু তাঁর মতে ব্রহ্মসম্পর্কে একথা খাটে না। জ্ঞেয় বস্তু থাক বা না থাক এই চিৎশক্তি নিত্য-বিরাজমান। তিনি বলেন, মহাশূন্যে কিরণ গ্রহণ করবার জন্য বস্তু থাক বা নাই থাক, সূর্য যেমন কিরণ বর্ষণ করে, ব্রহ্মের সেইরূপ জ্ঞাতৃরূপ জানবার বস্তু না থাকলেও নিত্য প্রকট থাকে। ব্রহ্ম জ্ঞেয়বিহীন জ্ঞাতৃগুণবিশিষ্ট সত্তা।

যিনি চিন্ময় ও অবিভাজ্যরূপে একক সত্তা, তাঁকে তবে কেন আমরা বহু ও বিচিত্র রূপে দেখি? তিনি বলেন, তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খানিক পরিমাণে দায়ী। তারা তাঁর যে পরিচয় আমাদের এনে দেয় তা' ভুল পরিচয়। যার বাস্তব কোন ভিত্তি নেই, যা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি, তাকে আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে অথচ আমরা যাকে তার প্রকৃত রূপ হতে বিচ্ছিন্ন দেখি, তাকে মায়া বলতে পারি। স্বপ্নে যা দেখি তা' হল প্রথমটির উদাহরণ, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির তপ্ত বায়ুস্তরে আমরা জল দেখি, তাকে আমরা মরীচিকা বলি। এটি মতিভ্রমের উদাহরণ। তপ্ত বায়ুস্তরের উপরের বায়ু কাঁপে আর তার সেই কম্পনকে আমরা জলের রূপে দেখি। তা' ভ্রান্তি নয়, তা' সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা' হলে তাকে কেবল তপ্ত বায়ুর ওপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। শঙ্করাচার্যের মতে যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুরূপে দেখি তাও এই ধরণের অনুভূতি। তা' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা' মিথ্যা নয়, তা' সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন তপ্ত বায়ুস্তরের কম্পনকে আমরা মরীচিকা বলে ভুল করি।

কেন এমন দেখি? তারও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখানে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে। তা' যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক তাকে আমাদের নিকট বহুরূপে বিকৃত বা বিবর্তিত করে দেখায়। বায়ুর তাপ যেমন বায়ুস্তরের কম্পনকে বিবর্তিত ক'রে মরীচিকার রূপ দেয়, বা একটা সোজা কাঠির খানিক অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে তাকে যেমন বাঁকা দেখায়। এখানে জলের সূর্যকিরণকে আংশিকভাবে বিক্ষিপ্ত করার শক্তি কাঠির রূপকে বিকৃত করে। জলের বিক্ষিপ্ত করার শক্তি এখানে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায়। অপব্যাখ্যাই এই ভ্রান্ত উপলব্ধির কারণ। যে শক্তি এক ব্রহ্মকে বহুরূপে বিকৃত করে তাকে তিনি মায়া বলেছেন।

বিবেকানন্দ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে বেদান্তের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা' শঙ্করাচার্যপ্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যা। বেদান্তের মূলগ্রন্থ

ব্রহ্মসূত্র। মহর্ষি বদরায়ণ তা' রচনা করেন উপনিষদে যে তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে তার সার মর্ম নিয়ে। কিন্তু তা' সূত্রের আকারে রচিত বলে সোজা বোধগম্য হয় না। তাই তার ভাষ্যের প্রয়োজন। তার উপর ভাষ্য একাধিক মনীষী লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মতের এত পার্থক্য যে কোনটি ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। তাদের পার্থক্য এত গভীর যে, তাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বের স্বরূপ কি, এ' প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হতে পারে। একটি উত্তর হতে পারে যে, তা' বহু বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমষ্টি। তাকে আমরা বহুবাদ বলতে পারি। আর এক ব্যাখ্যা হতে পারে যে, বহুকে জড়িয়ে নিয়ে জটিলভাবে একই শক্তির ব্যাপক বিকাশ হল বিশ্ব। তাকে পারিভাষিক ভাষায় সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। আর এক ব্যাখ্যা হতে পারে, বিশ্ব একই শক্তির রচনা, তিনি ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র। তাকে একেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্য এদের কোনটিকেই গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন বিশ্ব অবিচ্ছিন্নভাবে এক বস্তু। তাঁর মতকে অবিমিশ্র একবাদ বলা যেতে পারে। ব্রহ্মসূত্রের ওপর যে পাঁচ জন মনীষী ব্যাখ্যা লিখেছেন তাঁদের মত এই চার শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। মাধ্বাচার্যের ভাষ্য বহুবাদকে গ্রহণ করেছে। বল্লভাচার্যের ভাষ্য গ্রহণ করেছে সর্বেশ্বরবাদকে। আবার দেখি নিম্বার্কের ভাষ্য প্রচার করেছে একেশ্বরবাদকে। সবগুলিই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে বলে সবই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত। এই ভাষ্যগুলি হতে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাকে পৃথক করবার জন্য তাকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়ে থাকে। তাকেই বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন।

এই অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি। তা' বলে যে, বিশ্ব অবিমিশ্রভাবে এক। তাতে একটি মাত্র সত্তা থাকেন এবং তিনি হলেন ব্রহ্মন্ বা আত্মন্। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহু ও নানা বস্তুসমন্বিত যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয় তা' ভ্রান্ত, সে জগৎ ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু দেখার ভুলে তাকে বহুরূপে দেখি। তৃতীয়ত এই ব্রহ্মন্ চিৎশক্তিবিশিষ্ট। বিবেকানন্দের দার্শনিক রচনায় এই ব্যাখ্যাটির প্রচারিত হয়েছে। তার দু' একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর 'সন্ন্যাসীর গীতিতে' তিনি কবিতায় বিশ্বের স্বরূপসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা' অদ্বৈতবাদের সারমর্ম সংক্ষেপে বলে। কবিতার সে অংশটি এই :

একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয় ;

তাঁহার আশ্রয়ে এ' মোহিনী মায়া
দেখিছে এ' সব স্বপনের ছায়া।

—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ৪)

এই উক্তিটির মধ্যে অদ্বৈতবাদের তিনটি মূল তত্ত্বই পাওয়া যায়। বিশ্বে আছেন একটি মাত্র সত্তা, তিনি হলেন আত্মা। তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তাঁর নাম নেই, রূপ নেই, তিনি জ্ঞাতারূপী। বহু ও নানারূপে যাকে দেখি তা' তাঁরই উপর আশ্রিত, কিন্তু তা' মায়ার রচনা, তা' স্বপ্নের মত অলীক। এই কথাগুলিই তিনি সংক্ষেপে অন্যত্র এই ভাবে বলেছেন :

"অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন ; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে"।

—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ৮৪)

এই আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতি যে চৈতন্য-রূপ, তার সমর্থনে তিনি একটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে, যা জড় বস্তু তা' নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, একটি স্বতন্ত্র চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তুর সহিত সংযোগ স্থাপিত হলেই তা' প্রকাশ পায়। সুতরাং যিনি স্বপ্রকাশ সেই ব্রহ্ম কখনো জড় ধর্মী হতে পারেন না। তিনি তাই বলেছেন : "স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ। জড় ভূত কখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না"।

—(জ্ঞানযোগ সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ১৯৩)

মায়াবাদকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ব সত্যই। যদি অবিমিশ্রভাবে একটি মাত্র সত্তা নিয়ে গঠিত হয় তা' হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুর জগতের সবথেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হল মায়াবাদ। তার জন্যই তার গলায় তিনি বরমাল্য দিয়েছেন। এই সম্পর্কে মায়াবাদের তিনি যে প্রশস্তি রচনা করেছেন, তা' এই : "কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল? আর উহার উত্তর—সর্বোত্তম উত্তর—ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর মায়াবাদ ; বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এ বহুত্ব কেবল আপাত-প্রতীয়মান মাত্র"।

—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ৩১৮)

এই হল তাঁর দর্শনের জ্ঞানকাণ্ড। অপরপক্ষে কর্মকাণ্ডে দেখি একটি স্বতন্ত্র সুর। আপাতদৃষ্টিতে যিনি ত্যাগী, যিনি সন্ন্যাসী, সংসারের মানুষের ব্যাপারে তাঁর কোন রকম মনঃসংযোগ আশা করা যায় না। বিশেষ ক'রে যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, যাঁর উপলব্ধিতে বহু ও নানার বিচিত্র জগৎ স্বপ্নের মতো অলীক, তিনি যে সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের ভার নেবার প্রেরণা পাবেন, তা' ভাবা আরও দুষ্কর। কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শনে এই দুই বিপরীত ধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এ যেন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা কেমন করে ঘটল সেইটিই ভাববার কথা। যাকে স্বপ্নবৎ প্রপঞ্চ বলে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাকে কি যুক্তিপ্রয়োগ করে কল্যাণ কর্মের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তা' ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তবে যেন মনে হয়, তাঁর মনে বুদ্ধিশক্তি যেমন প্রবল ছিল, অনুভূতি-শক্তিও তেমন গভীর ছিল। তাই বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে যাকে মায়া বলে গ্রহণ করেছেন তাকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুভূতিশক্তির প্রেরণায় তারই জন্য তাঁর হৃদয়ে করুণা প্রবাহিত হয়েছে এবং তাই কর্মকাণ্ডে সমাজসেবার এক উচ্চ আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন। তিনি সত্যই একটা দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন।

দর্শনের ইতিহাসে এইরূপ দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার দোটানার দৃষ্টান্ত আরও একটি পাওয়া যায়। তা' পাওয়া যায় পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে। তাঁর মনেও দুটি বিভিন্নধর্মী ভাবধারা সমানভাবে শক্তিমান ছিল। এক পক্ষে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদী। যুক্তির প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত পাবেন তাকে তিনি বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করবেন। অপরপক্ষে তাঁর নীতিবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা, এটি ছিল সেখানে একটি মূল দার্শনিক প্রশ্ন। তাঁর যুক্তিবাদী মন এ' প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে দেখল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যতগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের কোনটিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। তিনি তখন বললেন এই যুক্তিগুলি অসার; সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তখন ওদিকে তাঁর নীতিবোধ এসে বাধা দিল। ঈশ্বর না থাকলে ন্যায়দণ্ডের ভার কে নেবেন? কাজেই এই নৈতিক যুক্তির দাবীতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করে নিলেন।

বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেও যেন অনুরূপ একটি দোটানার ইতিহাস আত্মবিকাশ লাভ করেছে। বহু বিভিন্ন মানুষ তাদের দৈন্য, তাদের

কষ্ট এ সবইত বিশ্বপ্রপঞ্চের অংশ। তাঁর যুক্তিবাদী মন বলবে তারা অলীক, তারা মায়ার রচনা। সুতরাং অকাট্য সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, তাদের সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়ার কোন অর্থ হয় না। স্বপ্নে যদি কোন দুঃখ বা দুর্দশা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তা' দূর করবার জন্য কি কেউ মাথা ঘামায়? কিন্তু বিবেকানন্দ তা' পারলেন না। তাঁর হৃদয়ে ছিল করুণা। যুক্তির নিষেধকে অগ্রাহ্য করে তিনি এই সংসারের মানুষের দুঃখ-দুর্দশামোচনের আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি প্রচার করলেন বিশ্বজনীন কল্যাণধর্ম।

এ' সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি মোটামুটি প্রয়োগ করেছেন তা' বলে প্রপঞ্চময় জগৎ যেন ব্রহ্মেরই প্রকট রূপ। এই যে নানা জীব, নানা মানুষ, এরা সবাই ঈশ্বরের প্রকাশ। সুতরাং সকলেই আমার আপন জন। সেক্ষেত্রে তাদের সেবা করব না তো কার করব? এই ধরণেরই একটা যুক্তি যেন তাঁর মনে ক্রমশ বল সঞ্চয় করেছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সন্তানসন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয়, তিনিই মন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে বর্তমান"।—(জ্ঞানযোগ সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ২৬৩)

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব আর ঠিক প্রপঞ্চময় মনে হয় না, বিশ্ব তখন ব্রহ্মসত্তার অভিব্যক্তি বলে প্রতিভাত হয়। ফলে অবিমিশ্র একবাদ হতে মন বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এক সর্বব্যাপী সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। দার্শনিক অদ্বৈতবাদ হতে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ এসে পড়ে। তখন দার্শনিকের উপলব্ধিতে বিশ্বে যা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম বলে অনুভূত হয়। এ সেই উপনিষদেরই উপলব্ধি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই পথে বিবেকানন্দের সেই উপলব্ধি হয়েছিল। তিনি বলেছেন: "যাহা কিছু দেখ, শুন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—ঠিক বলিতে গেলে তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রভু স্বয়ং"।—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ১৮৭)

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। ঈশ্বরকে কোথায় সেবার জন্য পাব তাই হল প্রশ্ন। তাঁর ত একস্থানে কোথাও বিশিষ্ট আকারে প্রকাশ নেই। তাঁকে পেতে হলে যার মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান সেই বিশ্বের মধ্যেই পেতে হবে। তার বাহিরে পৃথকভাবে তাঁকে পাবার চেষ্টা করা বৃথা। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন: "বেদান্ত বলেন এইরূপে কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও

ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা—কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে" ?—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ২৬৯)

ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য হতে দুটি নীতি পাওয়া যায়। প্রথম, ঈশ্বর সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান এবং দ্বিতীয়, তাঁকে পেতে হলে তাদের মধ্যেই পেতে হবে, কারণ, তাঁর তো বিশ্লিষ্ট আকারে প্রকাশ নেই। এই পথেই তাঁর চিন্তাধারা আর একটু অগ্রসর হয়ে একটি নূতন নীতি উপলব্ধি করেছে দেখতে পাই, যা বলে যে মানুষের নিকট মানুষ রূপেই তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে প্রকট। এটি সমর্থিত হবে তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হতে, "ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরই প্রকাশিত" ।—(ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ১২৯)

এইভাবে আমরা দেখি তাঁর চিন্তাধারা উপনিষদের একটি মূল ভাবধারার অনুসরণ করেছে। নীতির রাজ্যে এক মূল সমস্যা হল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রতি ব্যক্তি নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে, কাজেই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট। স্বার্থের সহিত পরার্থের দ্বন্দ্বনীতির ক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যা।

উপনিষৎ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছে একটি নূতন পথে। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সংযুক্ত সাহায্যে উপনিষৎ তার সমাধান খুঁজেছে। উপনিষদ বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের ভিত্তিতেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্নেহ ও ভালবাসার বিস্তারে। এই পথেই মানুষের স্বার্থবোধ পরিশোধিত হতে পারে। ঠিক কথা বলতে কি মানুষ যে সর্বক্ষণই স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে কাজ করে ঠিক তা নয়। সাধারণ মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে স্বর্থত্যাগ করতে সক্ষম। প্রয়োজন হলে বন্ধুর জন্য বন্ধু আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্বত্যাগ করতে প্রস্তুত। যেখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, সেখানে এমন ত্যাগ নেই যা মা করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরার্থ বৃত্তি দুর্লভ নয়।

কেন এমন হয় ? উপনিষৎ বলেন এই যে জায়ার নিকট পতি প্রিয় হয়, তা পতির কারণে নয়, এই যে মায়ের নিকট সন্তান প্রিয় হয়, তা সন্তানের কারণে নয়, তার কারণ তাদের মধ্যে আত্মন্ বা ব্রহ্মন্ আছেন বলে। "আত্মনস্তু কামায়

সর্বং প্রিয়ং ভবতি"।—আত্মার কারণেই এরা সকলে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, সাধারণ মানুষ সকলকে ব্যাপ্ত ক'রে আত্মা বিরাজমান, সেই কারণেই মানুষের নিকট মানুষ প্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বব্রহ্মবাদের ভিত্তিই হল এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাই আনে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতাবোধ এবং সেই ঘনিষ্ঠতাবোধ ভালবাসার বিস্তারকে সম্ভব করে। এই কারণে উপনিষদের ঋষি ঘনিষ্ঠতাবোধের ভিত্তিতে আত্মীয়তাবোধের উদ্রেক এবং আত্মীযতাবোধের ভিত্তিতে স্বার্থে সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের বাণীতেও অনুরূপ ভাব পাই। তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায় 'স্ব'-এর এই 'অহং'-এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক অহং একটা লোক বিবাহিত হইলে দুইটা হইল, ছেলেপুলে হইলে অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার অহং-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে, অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্বজনীন প্রেম—অনন্তপ্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।—(ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ১৪৭)

এইভাবে ঘনিষ্ঠতাবোধহেতু প্রীতির বিস্তার ঘটলে সার্বজনীন কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করবার প্রবৃত্তি আপনিই আসে। বিবেকানন্দের সমাজ-কল্যাণের প্রেরণা এই পথেই এসেছিল। তাঁর মতে যুগপৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ও করুণার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। প্রথম কারণে তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর দ্বিতীয় কারণে ভগবান বুদ্ধের করুণা তাঁকে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল। তিনি বলেছেন: "আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি স্বগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐ সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল"।—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৪)

এইভাবে আমরা দেখি, বিবেকানন্দের দর্শনের মধ্যে সত্যই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অদ্বৈতবাদের অবিমিশ্র একত্বকে আশ্রয় ক'রে সর্বজনে প্রীতি ও সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগের একটি আদর্শ গড়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ নিজেই তাকে 'মণি-কাঞ্চনযোগ' বলেছেন। একপক্ষে মণি-কাঞ্চনযোগ ঘটে বৈকি। অবিমিশ্র অদ্বৈতবাদে যিনি দীক্ষিত তাঁর তো স্বার্থবোধ পুড়ে ছাই হয়ে আছে। তারপর সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ ত সে মানুষের পক্ষে সহজ কর্তব্য।
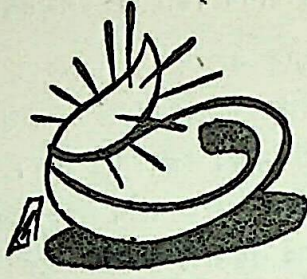
॥ দ্বাবিংশ অবদান ॥

॥ বিবেকানন্দ-দর্শনচিন্তায় মন্ত্ররহস্য ॥

স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন ধর্মবক্তা, সমাজসংস্কারক, প্রচারক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা ও আরো কত-কিছু। সমুদ্রগামী বহুধারা-স্রোতস্বিনীর মতো ছিল তাঁর প্রতিভা বহুমুখী এবং দেদীপ্যমান সহস্র কিরণবাহী অংশুমালীর মতো ছিল তাঁর মনীষার দীপ্তি। তাঁর মধ্যে বিচিত্র শক্তির প্রসুপ্ত রূপ দিব্যনেত্রে দর্শন করেই দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন: 'নরেনের মধ্যে আঠারটা শক্তির বিকাশ'।

অন্তর্নিহিত অনভিব্যক্ত শক্তির ব্যক্ত রূপের নামই শক্তির বিকাশ; শুধুই তা জৈবশক্তির প্রতিফলন বা পরিণতি নয়। অন্তর্লীন বীজশক্তিই অভিব্যক্ত প্রকৃতিরূপে মানুষের জীবনসত্তার বিকাশসাধন করে। সুতরাং একটি অখণ্ড মানবসত্তার সৃষ্টিকারণ সাধারণভাবে জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বরূপ বোলে স্বীকৃত হোলেও আসলে শাশ্বত চৈতন্যসত্তার স্ফুরণই মানুষের প্রাণসত্তার রূপদান করে ও পার্থিব মানবসত্তাকে অপার্থিব ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাই বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি জড়-চৈতন্যসম্পৃক্ত আন্তর-বাহ্য রূপদুটির লীলায়ণরূপে গৃহীত হোলেও প্রকৃতপক্ষে নির্মীয়-মান চৈতন্যধর্মী আত্মসত্তাই আদর্শ মানুষের জীবনপ্রবাহকে করে সচল ও আনন্দ-মুখর এবং তার প্রতিষ্ঠাকে করে সার্থকতা দিয়ে পূর্ণ। ক্রমপ্রস্ফুটিত সহস্রদলকমলের মতো নরেন্দ্রনাথ বাল্য ও কৈশোর কাল অতিক্রম কোরে যৌবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে নিয়ে ধীরে ধীরে স্বামী বিবেকানন্দে রূপায়িত হয়েছিলেন এবং সে রূপায়ণও ছিল প্রসুপ্তির নবজাগরণ,—অনভিব্যক্তেরই ব্যক্ত রূপ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সন্দেহতরঙ্গায়িত নরেন্দ্রনাথ তখন কেন্দ্রায়িত জীবনচিন্তা ও জীবনসাধনা নিয়ে শান্ত সমাহিত সমুদ্রে পরিণত ও প্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং এই অভিনব বিবর্তনের কারণকেন্দ্র ছিলেন উনবিংশ শতকের যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম, সমাজসমস্যা, শিক্ষা, দেশসেবা এ'ধরনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যেমন স্বামী বিবেকানন্দ সকল ক্ষেত্রে নবজাগরণের সঞ্চার কোরে, তেমনি করেছিলেন মন্ত্ররহস্য, প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা, অধ্যাত্মসাধনা প্রভৃতির নির্দিষ্ট তত্ত্ব ও উপায়সম্বন্ধে আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণী মন নিয়ে। ভক্তিযোগেরই প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিচিত্র প্রশ্নের অবতারণা করেছেন : ঈশ্বরতত্ত্ব কি, অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বরূপ কি, ধর্মাচার্য ও দীক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা কি, অনুভূতিদীপ্ত ধর্মগুরু কারা, প্রভৃতি ; আবার এঁদেরই আলোচনাসূত্রে আলোকপাত করেছেন তিনি ভারতীয় সাধনার প্রাণবস্তু ওঙ্কার-তত্ত্বের নিগূঢ়রহস্যের ওপর। তাঁর বিশ্লেষণী নীতির মধ্যে ক্ষুরধার বুদ্ধি-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আস্তিক্য বিশ্বাস ও নিবিড় প্রেমনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বলেছেন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার ও অবতারকল্প পুরুষদের প্রসঙ্গ না হয় এখানে নাই কর্ল্‌াম জীবনসিদ্ধিপথের পরমসহায়করূপে, কিন্তু সাধনক্ষেত্রের দিশারীরূপে জ্ঞানদীপ্ত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা আচার্যের উপযোগিতাকে তো কেউ কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না! কেননা তারাই আসলে শক্তির উদ্বোধন করেন সাধনকারীদের হৃদয়ে শাশ্বত পথের সন্ধান দিয়ে। সিদ্ধগুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্রের সাধনা ও জাগ্রতচেতনাই নিয়ে যায় একনিষ্ঠ সাধককে তার অভিলষিত লক্ষ্যের পাদপীঠে এবং অপসারিত করে বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ অজ্ঞান-অন্ধকার পরমবোধিসত্তায় তাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত কোরে। স্বামীজী এ'প্রসঙ্গেই বলেছেন : "But we are now considering not these *Mahâ-purushas,* the great Incarnations, but only the *Siddha-Gurus* (teachers who have attained the goal) ; they, as a rule, have to convey the germs of spiritual wisdom to the disciple by means of words (*Mantras*) to be meditated upon. What are these *Mantras* ?"

স্বামীজী নিজেই প্রশ্ন করেছেন—তাহোলে মন্ত্র কাকে বলে ? ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণে দেখা যায়, বিশ্বচরাচর নিছক নাম-রূপেরই পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয়, নাম-রূপই দিয়েছে তার বিরাট বিকাশরূপকে সার্থকতা ও করেছে রূপ, রস, গন্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে তাকে পূর্ণ। উপনিষদ্‌কার সৃষ্টির এই রহস্যকথার মর্ম উদ্‌ঘাটন কোরে বলেছেন : "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত, অসৌনামায়মিদং রূপ ইতি ; তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে, অসৌনামায়মিদং রূপ ইতি" ;—অব্যাকৃত অখণ্ড

আত্মসত্তাই ছিল প্রতিষ্ঠ বিশ্ববিকাশের পূর্বে এবং পরে নাম-রূপের আবরণে প্রকাশ করলেন তিনি নিজেকে বহুধাবিচ্ছিন্ন কোরে। এই নাম-রূপই করেছে রস-সৌন্দর্যপূর্ণ ভোগভূমি-বিশ্বের প্রাণসঞ্চার।

আবার মানব-মনের মধ্যে দেখি ঐ একই নাম-রূপের সচঞ্চল বিলাস। বিশাল চিত্তসমুদ্রের বুকে নিত্য-নূতন ওঠে কত তরঙ্গ এবং ঐ তরঙ্গের আলোড়নে মানব-মন সততই চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ। বাহ্য ও অন্তরদেশব্যাপী বিশ্বচরাচরের বুকে অহরহঃ ঐ নাম-রূপ-তরঙ্গেরই চলেছে খেলা এবং ঐ লীলাবলোকনই আনে মানুষের মনে বিস্ময় এবং আনে বিবেকের জাগরণ। বৈচিত্র্যাভিমুখী মানুষের মন তখন স্বতঃই কেন্দ্রাম্বিত হোয়ে অনুসন্ধান করে মিলন কোথা,—ঐক্যকেন্দ্র কোথা! বিদ্যুৎচমকের মতো বুদ্ধিপ্রকাশে তখন মাঝে মাঝে জাগে বোধির আলোক-দীপ্তি এবং তখনি সে বোঝে 'যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ',—একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের স্বরূপজ্ঞানে যেমন যাবতীয় মৃত্তিকার স্বরূপাবধারণ সম্ভব, তেমনি নাম-রূপের পরিণতি মন বা চিত্তবৃত্তির স্বরূপজ্ঞান হোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর নির্মাণরহস্যের অনুভব করাও সম্ভব। ছান্দোগ্য-উপনিষদে মহর্ষি আরুণি তাঁর ব্রহ্মচারী-পুত্র শ্বেতকেতুকে ঠিক এ'তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন: 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' (১।৬।৩-৪); —অর্থাৎ যে তত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করলে অশ্রুত, অচিন্তিত ও অবিজ্ঞাত বিষয় শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হয়, হে সৌম্য, সেই বিষয় হোল এক সত্য পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব। সেটি ক্যামন জানো?—একটিমাত্র মৃত্তিকাপিণ্ডকে জানলে যেমন বিশ্বের সকল পার্থিব বিষয়ের রহস্যতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ও তখন মনে হয় এক মৃত্তিকাই সত্য, আর সমস্ত বিকাশ শব্দাত্মক ও নাম মাত্র, তেমনি মানবসত্তা বা মানুষের চিত্তকে জানলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যই অবগত হওয়া সম্ভব। বাহ্য আকার বা রূপ অন্তরসত্তারই বহিরাবরণ। মানুষ ও প্রাণীমাত্রের পার্থিব শরীর আবরণ বা রূপ, আর মন বা অন্তঃকরণ নাম মাত্র এবং বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শব্দপ্রতীক ঐ নাম ও মনের প্রকাশক। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, একটি মানুষের চিত্তবিক্ষেপের ফলে যে অজস্র চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেই চিন্তাতরঙ্গমালাই প্রথমে শব্দাকারে ও পরে বাস্তব আকারে স্থূলমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বতরঙ্গ তাই মনঃসমুদ্রেরই বিক্ষুব্ধি বা পরিণতি।

অন্তরদর্শী স্বামীজী মন্ত্র তথা নিত্যশব্দতত্ত্বের বিশ্লেষণ আরো নিবিড়ভাবে উপস্থাপন করেছেন বিশ্বসৃষ্টির মূল-রহস্যকথার অবতারণা কোরে। তিনি বলেছেন, হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা অথবা স্থূলরূপধারী মহৎই বিশ্বসৃষ্টির প্রভাতে 'নাম' বা শব্দাকারে এবং রূপ বা পার্থিব আকারে নিজেকে প্রকাশ করেন: "In the universe, Brahmâ or Hiranyagarbha or the cosmic Mahat first manifested himself as name, and then as form, i. e. as the universe"। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এক ও অদ্বিতীয় শাশ্বত ব্রহ্মচৈতন্যেরই রূপভেদ হোলেও শ্রুতি ও স্মৃতিকারেরা তাদের উল্লেখ করেছেন মনুষ্যবুদ্ধিতে সুগম ও স্বচ্ছন্দভাবে ব্রহ্মবোধকে প্রতিভাত করার জন্য। বুদ্ধি ও বোধির সমৃদ্ধিলাভের পথে এই কল্পিত চৈতন্যগুলি স্তররূপে প্রতিভাত,—যেমন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ বা জ্ঞানানুভূতির স্তরগুলি কল্পিত ও প্রতিভাত। নাম ও রূপের বিচিত্র বিকাশ ছাড়া ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট চৈতন্যস্তরগুলির আর কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না। নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রমানুভূতির এরা সোপান এবং এই সোপানাশ্রয়ী সাধকেরা ধীরে ধীরে পরমসত্য-লাভের পথে অগ্রসর হোয়ে কৃতকৃতার্থ হন। সুতরাং ঈশ্বরাদি চৈতন্যসত্তাগুলি সাধকের ক্রমাগ্রগতি বা ক্রমানুভূতির পথে সহায় মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ আরো বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের জগতে যত-কিছু রূপ বা আকার তাদের পিছনে বিকাশমান শব্দব্রহ্মরূপী অনির্বাচ্য স্ফোটের প্রকাশ থাকে। নিত্য ও অবিনাশী স্ফোটই বিশ্বচরাচরের কারণ এবং এই স্ফোটের মাধ্যমেই স্রষ্টা ঈশ্বর স্থূলবিশ্বরূপ সৃষ্টি করেন। অথবা উপনিষদের ভাষায় বলা যায়, ঈশ্বর সৃষ্টিসূচনার পূর্বে স্ফোটরূপ ধারণ করেন ও পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। স্ফোটপ্রকাশক শব্দই 'ওম্' বা ওঙ্কার: "All this expressed sensible universe is the form, behind which stands the eternal inexpressible Sphota, the manifester as *Logos* or Word. This eternal Sphota, the essential eternal material of all ideas or names, is the power through which the Lord creates the universe; nay, the Lord first becomes conditioned as the Sphota, and then evolves Himself out as the yet more concrete sensible universe. This Sphota has one word as its only possible symbol, and this is the OM'। এই স্ফোটই সামগ্রীক সৃষ্টিচিন্তার বীজ এবং এর স্থূলরূপ বিশ্ববৈচিত্র্য।

নিত্যশব্দের ধারণা শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সকল দেশেই দেখা যায়। গ্রীকভাষায় এই অবিনাশী নিত্যশব্দকে 'লোগাস' বলে এবং লোগাসের অর্থ নিত্যচিন্তা বা ভাবনাসমষ্টি। কিংবা বলা যায় নিত্যচিন্তার বিষয়ীভূত শাশ্বত বস্তু। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস লোগাসকে বলেছেন বিশ্বানুস্যূত ব্যাপক সত্তা, ষ্টোয়িক বা জ্ঞানবাদীরা বলেছেন 'ওয়ার্ল্ড সোল' বা বিশ্বাত্মা, প্লেটো বলেছেন 'অতীন্দ্রিয় লোগাস' বা চিন্তাকেন্দ্র এবং আলেকজান্দ্রিয় ফাইলো বলেছেন ঈশ্বর ও বিশ্বের মধ্যবর্তী নিত্যবস্তু যা লোগাসেরই পর্যায়ভুক্ত। চতুর্থ গস্‌পেলে এদেরই প্রতিধ্বনি করে বলা বলা হয়েছে: 'In the beginning was the Word and the Word was with God, and Word was God'। এই ওয়ার্ড বা নিত্যশব্দই অবিনাশী শব্দব্রহ্ম। সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও একথা স্বীকার করেন। বেদে ও উপনিষদে নিত্যশব্দকে বলা হয়েছে 'বাক্'। বাক্‌ই বাগ্‌দেবী সরস্বতীতে রূপায়িত। বাক্ বা নিত্যশব্দ স্ফোট পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে ত্রিমূর্তি বা ট্রিনিটি। বাক্ থেকে কামের, সৃষ্টি এবং কামই প্রকাশ পায় সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির দিব্যইচ্ছা রূপে। কঠোপনিষদে কামকে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে: 'কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্'। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো কামকেই আদি-ইচ্ছারূপ 'এরোস' (Eros) বা প্রেমাকর্ষণ (Love) বলেছেন। অথর্ববেদে কাম বাকের দুহিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ বাক্‌কে অবিনাশী স্ফোট বলেছেন এবং স্ফোটই সমগ্র চিন্তা ও নামের প্রতিষ্ঠা বা আধারবস্তু। একে তন্ত্রকার ও শাস্ত্রকারেরা বলেছেন সৃজনীশক্তি এবং এই শক্তিসহায়েই হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। উপনিষদের ভাষায় এ' সৃষ্টির অর্থ হোল ঈশ্বরচৈতন্য ব্যক্ত করেন নিজেকে দেশ-কালপরিচ্ছিন্ন জীবজগতে। সুতরাং স্বামীজীর বাণী ঔপনিষদিক সত্যেরই প্রতিধ্বনি। বাক্-রূপ শব্দের আকার পরিগ্রহ কোরে পরব্রহ্ম বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: 'সোঽকাময়ত, ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেতেতি। সোঽশ্রাম্যৎ, স তপোঽতপ্যত। বাগেবাস্য সা সৃজ্যত'। কঠোপনিষদে আছে: 'প্রজাপতির্বৈ ইদম্ আসীৎ'। 'তস্য বাগ দ্বিতীয়া আসীৎ'। 'তম্ মিথুনম্ সমভবৎ'। 'সা গর্ভং আধত্ত'। 'সা অস্মাৎ অপাক্রামৎ, সা ইমা প্রজাঃ প্রাবিশৎ'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুনরায় বলা হয়েছে: 'সা তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বং অসৃজত যদ্ ইদং কিঞ্চ ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্'। বাক্ এখানে শব্দব্রহ্মের বাচক বা দ্যোতক ও নিত্যশব্দ স্ফোটেরই অভিন্ন রূপ। ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন, বেদাত্মিকা বাক্ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ
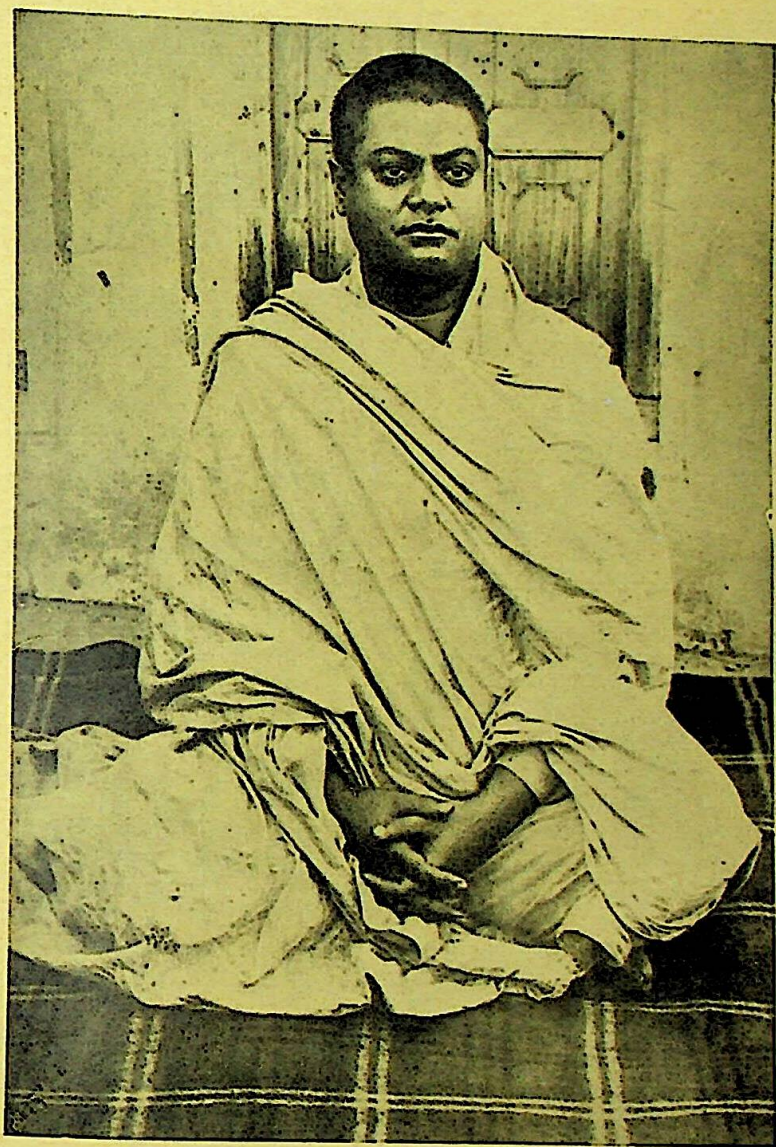
বাঙ্ময়। মহাভারতকার বলেছেন: 'বাচৈব সম্রাড় ব্রহ্ম জ্ঞায়তে, বাগ্বৈ সম্রাট পরমং ব্রহ্ম'। পূর্বেই বলেছি যে, এই বাক্ই বেদমাতা সরস্বতী: 'বেদানাম্ মাতরং পশ্য মৎস্থাম্ দেবীং সরস্বতীম্'। ঋক্ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে সায়ণ স্বীকার করেছেন: 'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ। নির্মমে তং অহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরম্'। তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে মাধবাচার্যের স্বীকৃতিও তাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে আছে: 'বাগ্ অক্ষরং প্রথমং যা ঋতস্য বেদনাং মাতা অমৃতস্য নাভিঃ'। শতপথব্রাহ্মণের উক্তিও অনুরূপ: 'বাগ্বৈ অজো বাচো বৈ প্রজাঃ বিশ্বক্রমা জনান'। এভাবে বাক্ বা স্ফোটকে বিশ্বপ্রসবিনী বোলে অভিহিত করা হয়েছে।

শাস্ত্রকারেরা শব্দকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছেন: অতীন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়িক। অতীন্দ্রিয় শব্দই নিত্যশব্দ স্ফোট এবং তার স্পন্দন ও পরিবর্তন নাই। ঐন্দ্রিয়িক শব্দ বিকাশধর্মী,—যদিও সে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। মহাভাষ্যে ঋষি পতঞ্জলি শব্দানুশাসনপ্রসঙ্গে শব্দ কিভাবে পদার্থ, কর্ম, গুণ ও জাতি থেকে ভিন্ন তার বিবরণ দিয়েছেন। শব্দকে তিনি সাধারণভাবে বলেছেন ভাবপ্রকাশক, অর্থাৎ যা ভাবের দ্যোতক তাই শব্দ। সুতরাং ধ্বনিও শব্দ। অনেকে শব্দকে ধ্বনি ও বর্ণ এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক এই দু'রকম শব্দ। কোন বাদ্যযন্ত্রে বা কোন ধাতববস্তুতে আঘাত করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তা' ধ্বন্যাত্মক শব্দ, আর অক্ষরাদির উচ্চারণে বর্ণাত্মক শব্দের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন আচার্য উপবর্ষ ও তাঁর অনুসারী আচার্য শবর ও শঙ্কর শব্দ অর্থে বলেছেন অক্ষর। শবর বলেছেন: 'গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? গকারৌকার-বিসর্জনীয়া ইতি ভগবদুপবর্ষঃ'। ভাষ্যকার শবর বলেছেন: 'তস্মাদক্ষারাণ্যেব পদম্' এবং শঙ্কর বলেছেন: 'বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবদুপবর্ষঃ'। তারপর শব্দের সৃষ্টি কিভাবে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন সকল দার্শনিকই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা তো বটেই। ভর্তৃহরি ও পুণ্যরাজ দু'জনে বায়ুই শব্দের কারণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। যোগদর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্রের মতে প্রাণবায়ু ও তেজের সংমিশ্রণে শব্দের সৃষ্টি। তন্ত্রশাস্ত্রের মতেও তাই, তবে সামান্য-কিছু পৃথক। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, মূলাধারে যে চিচ্ছক্তিরূপিনী কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তা থেকে মাতৃকাবর্ণের সৃষ্টি। দেবী কালিকার গলায় মুণ্ডমালা মাতৃকা-বর্ণেরই প্রতীক। মাতৃকাবর্ণ অক্ষররূপী। রামপ্রসাদ মাতৃকাবর্ণরূপী মুণ্ডমালাকে তাই বলেছেন: 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণ'। পঞ্চাশৎ বর্ণই কালিকা তথা শক্তি।

২১

অবশ্য ন্যায় অর্থাৎ নব্যন্যায়ের সিদ্ধান্ত অনেকটা ভর্তৃহরি ও পুণ্যরাজের মতানুযায়ী। শব্দকে তাঁরা বলেছেন নিত্য ও আকাশের গুণ।

মন্ত্রশাস্ত্রের মতে শব্দই ধ্বনি এবং শব্দসমষ্টির সমাহারে বর্ণের সৃষ্টি। তবে ধ্বনি কি বস্তু তার উত্তর দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।৩।২৮) বলেছেন: "কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি, প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি",—অর্থাৎ যা সুদূরস্থিত শ্রোতার বর্ণবিবেক সৃষ্টি করে না, অথচ কর্ণে প্রবেশ কোরে শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মায় তাই ধ্বনি। ধ্বনি অর্থের প্রকাশক ও বর্ণের স্রষ্টা। মন্ত্র বা বীজমন্ত্রও বর্ণেরই সমষ্টি। বর্ণ শক্তিধারক ও তা অভীষ্ট বস্তুর নির্দেশক। পূর্বেই বলেছি, শক্তিসাধক রামপ্রসাদ যে 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, তুমি বর্ণে বর্ণে নাম ধর' বোলে দেবী কালিকার মহিমা কীর্তন করেছেন তা থেকে বোঝা যায়, শক্তি ও বর্ণ অভিন্ন—অন্ততঃ শাক্ততন্ত্রমতে। বর্ণ তথা আদিবর্ণ স্ফোটকে স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসহায়ে সৃষ্টিকারী বোলে বর্ণনা করেছেন: "This eternal Sphota, * *, is the *power* through which the Lord creates the universe ; nay, the Lord first becomes conditioned as the Sphota, and then evolves Himself out......"। এখানে আদিবর্ণ শক্তিরূপিনী ও পরমেশ্বর-শিবের সঙ্গিনী, শিব বা ঈশ্বর স্ফোটশক্তির সাহায্যে বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকার পাণিনি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি (ইনি যোগদর্শনকার পতঞ্জলি কিনা এ'নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে) বর্ণে অন্তর ও বাহ্য প্রযত্নের কথা স্বীকার করেছেন। বর্ণোচ্চারণেই প্রযত্নের সার্থকতা। প্রযত্ন ক্রিয়াশক্তি, সুতরাং বর্ণোচ্চারণে শক্তির প্রয়োজন স্বীকার্য। তন্ত্রশাস্ত্রেও বর্ণোচ্চারণরীতির কথা আছে। বর্ণবীজ বা মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই সিদ্ধি বা সার্থকতা লাভ করে,—যদিও সেই উচ্চারণে অভিনিবেশ ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। পাণিনি ও পতঞ্জলি অন্তরপ্রযত্নকে আবার স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সম্বৃত এই চারভাগে এবং বাহ্যপ্রযত্নকে বিবর, সম্বাদ, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই এগারটি ভাগে ভাগ করেছেন। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই স্পৃষ্ট এবং য র ল ব বর্ণগুলি ঈষৎস্পৃষ্ট। বর্ণের উচ্চারণে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং সে শব্দ অনাদি একথা ব্যাকরণশাস্ত্র স্বীকার করে।

ভর্তৃহরিও পাণিনি এবং পতঞ্জলিকে অনুসরণ কোরে শব্দকে নিত্য বলেছেন। তারি জন্য এমন কি শব্দশাস্ত্র-রূপ ব্যাকরণস্মৃতিকে বলেছেন নিত্য ও মুক্তিদায়ী। তিনি বলেছেন: 'তত্ত্বাববোধে শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে' (১।১৩),

'তদ্দ্বারমপবর্গস্য' ও 'তদ্ব্যাকরণমাগম্য পরংব্রহ্মাধিগম্যতে' (১।১৪, ২২)। স্ফোট বা নিত্যশব্দকে অখণ্ডব্রহ্ম-রূপে প্রতিপন্ন কোরেই আচার্য ভর্তৃহরি একথার উল্লেখ করেছেন, কেননা শব্দব্রহ্মের উপাসনায় জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব: 'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি'। নাদকারিকাকারের সিদ্ধান্তও তাই। তিনি বলেছেন: 'বাগ্‌ব্রহ্মণি নিষ্ণাতশ্চিদ্‌ব্রহ্মাপ্নোতি যেন কথয়ন্তি'। সঙ্গীত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ ওম্ বা ওঙ্কারকেই অনাদি নিত্যশব্দ 'স্ফোট' বলেছেন: "This Sphota has one word as its only possible symbol, and this is the Om. And as by no possible means of analysis can we separate the word from the idea, this Om and the eternal Sphota are inseparable; and, therefore, it is out of this holiest of all holy words, the mother of all names and forms, the eternal Om, that the whole universe may be supposed to have been created"। স্বামীজীর বক্তব্য হোল, শব্দের সঙ্গে অর্থের তথা চিন্তার বা ধারণার শিব-শক্তির মতো নিত্যসম্বন্ধ। শব্দ অর্থের বোধক, আর তারি জন্য অর্থ থেকে শব্দকে কোনদিন পৃথক করা যাবে না। নিত্যশব্দ স্ফোটের সম্বন্ধেও ঐ এককথা। বিশ্বচরাচর স্ফোটেরই অর্থ তথা স্থূলরূপে স্ফোটের অভিব্যক্তি বা বিকাশ। তন্ত্রশাস্ত্র তাই সগুণব্রহ্ম স্ফোট বা ওঙ্কারকে সর্ববর্ণের আধার ও স্রষ্টা বোলে বর্ণনা করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শব্দবীজ স্ফোটের যদিও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন, তবুও তা এত ব্যাপক, বিশ্লেষণাত্মক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাকে সুষ্ঠুভাবে বোঝা ও বোঝানোর জন্য কিছুটা টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন। তন্ত্রসাহিত্যের আলোকে দেখা যায়, শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় এ'তিনটির ভিতর এক পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত। পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি শব্দসম্পর্কের মধ্যে বাচ্য-বাচক, ভেদ-ভেদ্য, প্রকৃতি-প্রত্যয় বা প্রকৃতি-বিকৃতি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। জাতি-ব্যক্তি বা জেনাস-স্পিসিস-সম্পর্ক নিয়েই অবশ্য এই দ্বন্দ্বতত্ত্বগুলির সার্থকতা। তন্ত্রসাহিত্যে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সম্পর্কেও শাব্দিক ভেদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু তারা পরস্পরসম্পৃক্ত। শব্দের আলোচনায় চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির প্রসঙ্গ তুলে তন্ত্র বলেছে ঐ শক্তি-দুটির বিকাশে এক ও অভিন্ন শক্তিই বিষয় ও বিষয়ী অথবা কর্তা ও কার্যের আকারে অভিব্যক্ত হয়। পরাসম্বিৎ বা সচ্চিদানন্দ-পরমশিব এ'দুটি শক্তির উপরে। অবশ্য এই উচ্চ ও নিম্ন ভেদ আসলে স্পন্দন বা স্পন্দনশক্তিকে নিয়ে সার্থক। স্পন্দন

থাকা ও না-থাকার জন্য একই চিদ্‌ঘনব্রহ্ম উত্তীর্ণ ও লীন বোলে প্রতীত হন। স্পন্দনের আর এক নাম বিমর্শশক্তি। নিস্পন্দ হোলে নিষ্ক্রিয় চিৎ, আর সম্পন্দ হোলে সক্রিয় চিৎ তথা শক্তি। শিব-শক্তির নিত্যবিলাসেই বিশ্ববৈচিত্র্যের সার্থকতা। শিব ও শক্তিকে শব্দতত্ত্বের দিক থেকে তাই নিঃশব্দ ও সশব্দ ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে একই মহাশক্তি চিতি তথা চৈতন্যরূপে ও শক্তিরূপে প্রকাশিত। শিব ও শক্তি অভিন্ন এবং অখণ্ড একথা অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যকে লক্ষ্য কোরেই বলা হয়। স্পন্দনপ্রকৃতিই নিষ্কল ব্রহ্মের স্বরূপপরিণাম। এরই নাম নিত্যশব্দ ওঙ্কার এবং সেজন্য ওঙ্কারকে বলা হয় নির্গুণব্রহ্মের বাচক। তন্ত্রে পরিণামবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের মতে বিবর্তবাদ। পরিণাম-বাদে বস্তু মূল-উপাদান থেকে পৃথক, কিন্তু বিবর্তবাদে বিবর্তিত উপাদান স্বরূপে অবিকৃতই থাকে, বিকৃতি যা তা ভ্রমমাত্র।

ব্রহ্মের প্রথম-স্পন্দনের নাম কারণশক্তি। তখন শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় 'স্পন্দ' নামে পরিচিত। স্পন্দ ও স্পন্দন একই কথা। শক্তিরই স্পন্দন হয়, ব্রহ্মের নয়। শক্তির স্পন্দনই আবার সৃষ্টির কম্পন এবং তাকে সৃষ্টির প্রস্তুতিও বলা যায়। শক্তি বা কম্পনের পরিণতিই বিশ্ববৈচিত্র্য। সায়েন্স তথা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাই। আলোক, বিদ্যুৎশক্তি, তাপ, শব্দ, বর্ণ ও এমন কি বিশ্বের সকল-কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ সমস্তই কম্পনের পরিণতি। কঠোপনিষদে একথাই বলা হয়েছে: 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' (২।৩।২)। প্রাণতত্ত্বের কম্পন থেকেই বিশ্বের বিকাশ। ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, জল ও আকাশ এই সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতের বিকাশে স্থূলপঞ্চভূতের সৃষ্টি। পঞ্চভূতের বিকাশই বিশ্ববৈচিত্র্যকে দিয়েছে নাম ও রূপ, কিন্তু এ'বিকাশ বা বিকৃতির মূলে নিত্য স্ফোটই চিরসমাসীন। মীমাংসাশাস্ত্রে জাতি-ব্যক্তিপর্যায়ে জাতিকে বলা হয়েছে সর্বানুস্যূত ও ব্যাপক, সুতরাং নিত্য এবং ব্যক্তি বিকৃত ও ব্যষ্টি, সুতরাং অনিত্য। ঘট-ব্যক্তির জাতি ঘটত্ব নিত্য ও সর্বানুস্যূত এবং এই ঘটত্বজাতির মাধ্যমেই ঘট-ব্যক্তির জ্ঞান সম্ভব, আর এর বিপর্যয়ে হয় মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি ও বিকার। স্ফোট নিত্যজাতির সমপর্যায়-ভুক্ত। মন্ত্রতত্ত্বের রহস্যভেদ করতে হোলে নিত্যশব্দ-রূপ সিদ্ধবীজ ওঙ্কারের স্বরূপজ্ঞান প্রয়োজন। বাচ্য ও বাচকের অভেদত্ব-প্রতিপাদনের নামই স্বরূপজ্ঞান।

মন্ত্ররহস্যের সমাধানে 'তত্ত্ব'-বস্তুসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ-কিছু না বল্লেও অধ্যাত্মজ্ঞানকামীদের তা জানার বিষয়। মন্ত্রশাস্ত্রে ছত্রিশটি শৈবতত্ত্বের সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শক্তি একটি তত্ত্ব। শক্তির বিকাশরূপ নাদ এবং নাদের অপর নাম সড়াখ্যতত্ত্ব। শক্তি ও নাদের উপরে বিন্দু এবং বিন্দুর

নাম ঈশ্বরতত্ত্ব। তাহোলে মোটামুটি বোঝা যায়, শক্তি, নাদ ও বিন্দুর তত্ত্বজ্ঞানে বা সম্যকজ্ঞানে শব্দরহস্য তথা মন্ত্ররহস্যের সমাধান সম্ভব। মন্ত্রশাস্ত্রে শক্তির নাম বিমর্শ সেকথা আগেই বলেছি। অদ্বৈতবেদান্তে বিমর্শশক্তি অবিদ্যা বা অজ্ঞান নামে পরিচিত। তবে বিমর্শ ও অবিদ্যা শক্তি-দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, মন্ত্রশাস্ত্র বা তন্ত্রের বিমর্শশক্তি নিত্য ও মহাশক্তিসঙ্গিনী, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের অবিদ্যাশক্তি অনিত্য, স্থতরাং মিথ্যা। শক্তির পরিবর্তনশীলতাই তাকে অনিত্য বা মিথ্যা বোলে প্রমাণ করে। অদ্বৈতবেদান্তমতে একমাত্র বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মই নিত্য ও অবিনাশী, তা ছাড়া আর সকল বস্তু অনিত্য ও বিনাশী।

শিব ও শক্তিকে নিয়েই মন্ত্রশাস্ত্রের পটভূমিকা রচিত এবং চরমসিদ্ধান্তও ঐ নিত্যবস্তু-দুটির অবিনাভাবসম্বন্ধে। তন্ত্রে শিবকে বলা হয়েছে অহংতত্ত্ব ও শক্তি ইদংতত্ত্ব। একটি গ্রাহক ও অপরটি গ্রাহ্য এবং এ'দুটি তত্ত্বের মিলনে বা সমন্বয়েই 'হংস' (হং—শিব+স—শক্তি=হংস)-শব্দ নিষ্পন্ন। তন্ত্রোক্ত হংসের অভিন্ন রূপই অদ্বৈতবেদান্তের 'সোঽহং'। হংস বা সোঽহং-তত্ত্বের নির্ধারণ ও সম্যক্-অবধারণের নামই মন্ত্রশুদ্ধি বা মন্ত্রচৈতন্য। মন্ত্রচৈতন্য সাধনার বস্তু। নিরঙ্কুশ একনিষ্ঠ সাধনায় এবং ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাসেই একমাত্র মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদন সম্ভব।

মন্ত্রতত্ত্ববেত্তা সূক্ষ্মদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ 'ওম্'-শব্দের সর্বব্যাপকত্ব ও নিত্যত্ব-সন্দেহী সাধকের পক্ষে একটি পূর্বপক্ষেরও অবতারণা কোরে বলেছেন: "But it may be said that although thought and word are inseparable, yet as there may be various word-symbols for the same thought, it is not necessary that this particular word Om should be the word representative of the thought, out of which the universe has become manifested. To this objection we reply that this Om is the only possible symbol which covers the whole ground, and there is none other like it";—অর্থাৎ যদি কেউ বলেন শব্দ ও অর্থ শিব-শক্তির মতো নিত্যসম্পৃক্ত ও অভিন্ন, তবুও একথা সত্য যে, একই চিন্তা বা ভাবের পরিবাহক হিসাবে অনেকগুলি শব্দের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, স্থতরাং নির্দিষ্ট ওঙ্কার-শব্দই যে বিশ্বসৃষ্টির যাবতীয় চিন্তা বা ভাবের একমাত্র বাচক বা জ্ঞাপক এমন কোন নিয়ম নাই, তাহোলে তার উত্তরে বলি, বাচক হিসাবে ওঙ্কার বা প্রণবই একমাত্র সর্বানুস্যূত শব্দ—যা বিশ্বান্তর্গত নিখিল ভাবের জ্ঞাপক এবং এর সমকক্ষ আর কোন ব্যাপক শব্দ নাই একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

ওম্-শব্দটির ভিতর পাই অ উ ম তিনটি অক্ষরের সমাবেশ এবং শব্দতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অ উ ম অক্ষর-তিনটিই বিশ্বের সকল শব্দের উৎস। এই তিনটি অক্ষর-রূপের সূক্ষ্মবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সর্ববর্ণের বিভাজক বর্ণ হিসাবে অ-কারই স্বীকৃত। অ-কারেই সকল উচ্চারিত বর্ণ ও শব্দের প্রথম প্রকাশ ও স্থিতি এবং তাদের সমাপ্তি ঘটে ম-কারে; কেননা ওষ্ঠদুটির উন্মিলনে শব্দের সূচনা বা আরম্ভ এবং নিমীলনে হয় সমাপ্তি। আর উ-কার অক্ষরটি দেয় শব্দোচ্চারণে প্রেরণা ও শক্তি এবং তা জিহ্বামূলে হয় সৃষ্ট, মুখাভ্যন্তরে পুষ্ট এবং সমাপ্ত হয় ওষ্ঠদ্বয়ের মিলনসাধনে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন: "All articulate sounds are produced in the space within the mouth beginning with the root of the tongue and ending in the lips—the throat sound is A, and M is the last lip sound, and the U exactly represents the rolling forward of the impulse which begins at the root of tongue till it ends in the lips"। অ-কারের সৃষ্টি হয় গলদেশে জিহ্বামূল থেকে, পুষ্ট হয় মুখে উ-কাররূপে ও সমাপ্ত হয় ম-কারের উচ্চারণে। সুতরাং অ-কার ও ম-কার অনন্ত শব্দপ্রবাহের দুটি দিক বা সীমা এবং উ-কার তাদের মধ্যে করে সমতা রক্ষা। তারি জন্য সর্বানুস্যূত শব্দ ওঙ্কার বা স্ফোট শব্দাত্মক ও বর্ণাত্মক সকল বিশ্বরূপের সৃষ্টিকারণ।

স্বামীজী ওম্ বা অ-উ-ম অক্ষর-তিনটির আরো সূক্ষ্মবিশ্লেষণ করেছেন রাজ-যোগের 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (১।২৭) সূত্রের ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন মানব-মনে প্রতিটি ভাব বা চিন্তার পিছনে এক একটি শব্দের থাকে সমাবেশ, কেননা শব্দ তার অর্থচিন্তাকে ছেড়ে কোনদিনই নিঃসঙ্গ হোয়ে থাকতে পারে না। কায়ার পাশে যেমন ছায়ার সমাবেশ থাকে, চিন্তার পাশে তেমনি থাকে শব্দ। আসলে চিন্তা বা ভাব সূক্ষ্ম এবং তার স্থূল রূপ শব্দ: একটি আন্তর ও অপরটি বাহ্য। আন্তরবস্তুটিকে আমরা বলি চিন্তা বা ভাব এবং বাহ্যবস্তুকে বলি শব্দ। যত প্রখর বুদ্ধিশক্তিই থাকুক না কেন মানুষের মধ্যে, সে কিন্তু কখনো শব্দের পিছনে চিন্তাকে বা চিন্তার ফলস্বরূপ শব্দকে ত্যাগ করতে পারে না।

এখন শব্দ ও অর্থের মধ্যে তাহলে সত্যকার সম্পর্ক কি? রাজযোগের ব্যাখ্যায়ও স্বামীজী পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেছেন পূর্বেকারই মতো এবং ভাষ্য ও টীকার উল্লেখ কোরে বলেছেন: "Although the relation between thought and word is perfectly natural, yet it does not mean a rigid connection between one sound and one idea'। ব্যাস তাঁর ভাষ্যে প্রায় এ' ধরনের

বক্তব্যেরই আভাস দিয়ে বলেছেন : 'স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ, * * সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে'। বাচস্পতি মিশ্র এ' সম্বন্ধে আরো একটু পরিচ্ছিন্ন আভাস দিয়ে বলেছেন : 'পরে হি পশ্যন্তি যদি স্বাভাবিকঃ শব্দার্থয়োঃ সংবন্ধঃ সংকেতেনাস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থঃ প্রত্যেতব্য ইত্যেবমাত্মকেনাভিব্যজ্যেত। ততো যত্র নাস্তি সঃ সংবন্ধস্তত্র সংকেতশতেনাপি ন ব্যজ্যেত'। স্বামী বিবেকানন্দ বাচস্পতি মিশ্রের এ' ইঙ্গিতেরই অনেকটা পরিচয় দিয়েছেন।

স্বামীজী ওঙ্কারের অ-উ-ম অক্ষর-তিনটির ব্যাখ্যা মন্ত্রপর্যায়ে (vide *The Mantra : OM: Word and Wisdom,*—SV's Works [1955], p. 58) দিলেও রাজযোগের ভাষণে (vide SV's Works [1955], p. 219) তা আরো সুপরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেছেন : "The first letter A, is the root sound, the key, pronounced without touching any part of the tongue or palate; M represents the last sound in the series, being produced by the closed lips, and the U rolls from the very root to the end of the sounding board of the mouth. Thus, Om represents the whole phenomena of sound-producing"।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের বিশ্লেষণপ্রণালীও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। স্বামী অভেদানন্দ অক্ষর-তিনটি বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে এবং স্বামী বিবেকানন্দ করেছেন শব্দব্যাপ্তি ও বিজ্ঞানের দিক থেকে, যদিও উভয়ের বিবৃতি একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে আক্ষরিক ব্যাপ্তি ও বিজ্ঞানের উল্লেখ কোরে তাঁর 'যোগ-সাইকোলজি' (*Yoga Psychology*) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৭৫) বলেছেন : "And this basic word came to the ancient seers of truth as a revelation, and they discovered this mystic syllable OM. It consists of three sounds, the sounds of A, U and M. * * When coalesced, they sound like two letters. The first basic sound is represented by the position of the mouth, when it is wide open. * * The gutteral sound A is the first sound. The last sound is, when you close your mouth completely, the M sound. The M sound is produced by the lips, and the A sound by throat. The lyrynx and the palate must be kept all wide open. Then between these

two sounds we get the whole gamut of sound. * * Thus A-U-M are the three sounds which include words that can be uttered by the human mouth. And naturally it (OM) includes all thoughts and ideas, which are represented by all such words"। এবং তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক থেকে স্বামী অভেদানন্দ আবার বলেছেন: "These three letters, that I have described, A. U. M not only include all thoughts in the waking state (*jâgrata*) but include also thoughts that are in the dream state (*svapna*) and that are in the causal state cr dreamless sleep state (*susupti*). The A sound represents everything in the waking state, and U sound represents everything in the dream state. In the dream state, ideas are real. They are the occasions, when all the thoughts become real for the time being. In the deamless sleep state (*susupti*), there are realisations, which are included in the sound M. As in the individual, so in the cosmic sense. If we can imagine that the waking state of all beings is taken collectively, that would be represented by the sound A. Then all the minds, that are dreaming, taken collectively, would be represented the U sound, and the M sound will represent all that is to be realised in the dreamless sleep state".

অধ্যাত্মতত্ত্বের দিক থেকে ওঙ্কারের অ-উ-ম অক্ষর-তিনটি গভীর অর্থপূর্ণ এবং তারা মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা-তিনটির জ্ঞাপক। শুধুই মানুষ কেন, প্রাণীমাত্রেই এ'তিনটি অবস্থার অধীন এবং এরাই মায়িক সংসারের প্রবৃত্তিজাল সৃষ্টি ও বিস্তার করে। এ'তিনটি অবস্থার অতীত মায়ানির্মুক্ত পরমাত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্য। এই ব্রহ্মচৈতন্যসত্তাকে অনুভব করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আদি-বীজমন্ত্র ওঙ্কার এই অবস্থা-তিনটির জ্ঞাপক এবং এরা চতুর্থ বা তুরীয় চৈতন্য বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মানুভূতিরই মুখ্যত দিকদর্শন করে। তারি জন্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "So these three sounds include everything, and the more we think of the meaning, the higher we rise in meditation, and eventually we enter into the state of superconsciousness or Godconscious-

ness"। স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। তিনিও পতঞ্জলির মতো ওঙ্কার বা আদিবীজমন্ত্র স্ফোট বা প্রণবকে সর্বগুণোত্তীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞাপক বা নির্দেশক বলেছেন, কিন্তু চরমলক্ষ্য বলেন নি। অদ্বৈতবেদান্তের পূজারী স্বামীজী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও প্রজ্ঞা-ঈশ্বরের অতীত চৈতন্য মায়ালেশনির্মুক্ত ব্রহ্মকেই ওঙ্কার ও সর্বমন্ত্রের লক্ষ্য বলেছেন। মাণ্ডুক্য-উপনিষদে ৮ম থেকে ১১শ শ্লোকগুলিতে ওঙ্কারের পাদ ও মন্ত্র সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ওঙ্কারতত্ত্ব-বিশ্লেষণের পটভূমিকায় তন্ত্র তথা শাক্তধারণার কিছুটা আভাস দিয়েছেন। তন্ত্রসাহিত্যের মতে ওম্ বা ওঙ্কার আদিশব্দ অ-উ-ম অক্ষর-তিনটিরই কেবলি সমষ্টি নয়, এতে সম্পৃক্ত আছে চন্দ্রবিন্দু তথা নাদ ও বিন্দু। নাদ ও বিন্দু মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশের দুটি প্রধানতম ধারা এবং এ'দুটি শক্তিই ওঙ্কারের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় তথা চতুর্থ চৈতন্যাবস্থার জ্ঞাপক বা নির্দেশক। মন্ত্রশাস্ত্রের মতে নাদ সূক্ষ্মতম শব্দ এবং ক্রিয়াশক্তির প্রথম অবস্থা। পরানাদ ও পরাবাক্যের সমষ্টি পরাশক্তি। পরাশক্তি মূলাধারশায়িনী চিতিরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি। মূলাধারশক্তি ও সহস্রার-শক্তি অনেকের মতে সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু পার্থক্যও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট—অন্ততঃ সাধনা ও ভাবনা-দৃষ্টির দিক থেকে। দুটির মধ্যে পার্থক্য হোল: একটিতে শক্তি বা মহাশক্তি সুপ্ত ও অপরটিতে থাকে চিরজাগ্রত তথা চিদ্ঘনরূপে। শারদাতিলকতন্ত্রের টীকাকার রাঘবভট্টের মতে শব্দব্রহ্মই সর্বজীবাশ্রয়ী চৈতন্য এবং প্রকৃতি—যা ব্যাপকশক্তি কুণ্ডলীরূপা কামকলা। সুতরাং নাদই বিন্দুর আকারে রূপায়িত হোয়ে সম্পরিষক্ত চৈতন্য ও শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নাদ প্রথম অবস্থায় বিকাশোন্মুখী শক্তি-রূপে, দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু বা শব্দব্রহ্ম-রূপে এবং তৃতীয় অবস্থায় ত্রিবিন্দু-রূপে তথা বিন্দু, নাদ বীজ-রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এই ত্রিবিন্দুও আসলে কামকলা কুণ্ডলিনী। বাক্যরূপী নাদ বীজ বা মন্ত্রের সাহায্যে সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নামই মন্ত্রচৈতন্য। ওম্ বা ওঙ্কার মহাবীজ, সুতরাং তার জাগরণে শব্দব্রহ্মচৈতন্যের জাগরণ কিনা প্রত্যক্ষ-অনুভূতি হয়।

ওঙ্কারের মতো নাদ ও বিন্দু বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ প্রভৃতি। এরা ওঙ্কারের অভিন্ন রূপ বা প্রকাশ, তবে ওঙ্কার সাধারণভাবে বৈদিক বীজমন্ত্র ও হ্রীঁ, শ্রীঁ প্রভৃতি তান্ত্রিক বীজমন্ত্র রূপে পরিচিত। এরা সাকার কিনা রূপধারী বা আকারবিশিষ্ট কিন্তু নিরাকার নির্গুণব্রহ্মের নির্দেশক ও প্রকাশক। পতঞ্জলি এরি জন্য ওঙ্কারকে বলেছেন বাচক: 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। বীজমন্ত্রের

২২

উচ্চারণকে উচ্চারণকলা বলে। উচ্চারণকলা নাম ও রূপধারী, আর তারি জন্য একে বলা হয় 'সমনি'। কিন্তু এই সমনি-রূপ উচ্চারণকলাই স্বরূপে বিশ্বোত্তীর্ণা নিরুচ্চারণকলা তথা 'উন্মনি'-রূপী পরাচৈতন্যের জ্ঞাপক ও প্রকাশক। অবশ্য নির্বিকার চৈতন্যে আসীন হোতে অর্থাৎ তার সম্যক-অনুভূতি লাভ করতে গেলে তত্ত্ববিকৃতির প্রয়োজন। তত্ত্ববিকৃতির অপর নাম শব্দবিকৃতি, যেমন বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত অবস্থা-চারটি ঐ চতুর্বিকৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এ'তত্ত্ব শুধু পাঠ বা উচ্চারণের বস্তু নয়, প্রত্যক্ষ-অনুভূতির সামগ্রী।

শারদাতিলকতন্ত্রকার লক্ষ্মণ-দেশিকেন্দ্র শব্দব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে কিভাবে অনুলোমরীতিতে নাদবিকাশগুলি রূপারিত হয় তার উল্লেখ কোরে বলেছেন (১।১০৮-১১১),

> সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।
> শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা॥
> ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ।
> পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দজন্মভূঃ।
> ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মাঽসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা
> ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্।
> আকারাদি-সকারান্তাং দ্বিচত্বারিংশদাত্মিকাম্॥
> পঞ্চাশদ্বারগুণিতা পঞ্চাশদ্বর্ণমালিকাম্।
> সূতে তদ্বর্ণতোঽভিন্না কলা রুদ্রাদিকান্ ক্রমাৎ॥

শব্দব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে শক্তি, ধ্বনি, নাদ, নিরোধিকা, অর্ধেন্দু, বিন্দু, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নাদের সৃষ্টি। টীকাকার রাঘবভট্ট এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—কুণ্ডলিনীশক্তি জ্যোতির্মাত্রাত্মরূপিণী। তিনি উর্ধগামিনী হন সহস্রারপদ্মে আসীন হবার জন্য। পরা মূলে তথা মূলাধারে, পশ্যন্তী স্বাধিষ্ঠানে, মধ্যমা হৃদয়ে ও বৈখরীনাদ মুখে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্যন্তী স্বয়ংপ্রকাশ ও সুষুম্নানাড়ীবাহী এবং ক্রমে হৃদয়পথে প্রকাশিত হোয়ে তা মধ্যমানাদ-রূপে রূপায়িত হয়। বৈখরী জিহ্বামূলে ও ওষ্ঠদেশে প্রকাশ পায় এবং তন্ত্রে তাকে শব্দপ্রপঞ্চজননী বলা হয়েছে। অবশ্য এই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী স্তর বা অবস্থাগুলির উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায়ও পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতার ৪।৫৮।৩ মন্ত্রে বলা হয়েছেঃ 'চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা' প্রভৃতি। পুনরায় আছেঃ 'চত্বারি বাক্-পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্বাহ্মণা যে মনীষিণঃ'।

হিন্দুতন্ত্রকার বলেছেন: 'পঞ্চাশদ্বর্ণমালিকাম্'। পঞ্চাশদ্বর্ণই নাদের বিচিত্র বিকাশ ও এগুলি কামকলা কুণ্ডলিনী তথা শব্দব্রহ্মরূপী স্ফোটেরই রূপায়ণ। স্ফোটকে সেজন্য বর্ণমাতৃকা বলা হয়। বর্ণমাতৃকাই আবার দেবী সরস্বতী যিনি বর্ণাধিষ্ঠাত্রী। এখানেও রামপ্রসাদের 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী' কথাটি আবার স্মরণ করতে বলি। প্রতিটি বীজমন্ত্রের ধ্যান করার সময় তাই ব্রহ্মকে ঋষি বলা হয়, গায়ত্রী ছন্দ ও দেবতা সরস্বতী। মাতৃকা বা মাতাই দেবতা তথা দেবী পদবাচ্যা। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে আচার্য শঙ্কর তাই দেবী সরস্বতীকে বর্ণমাতৃকা তথা 'বর্ণাধিষ্ঠাত্রী' ও 'বোধদীপিকা' বলে সম্বোধন করেছেন। বোধদীপিকার অর্থ বর্ণই ভাব ও রূপের স্রষ্টা এবং তাদের থেকে বস্তুসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান হয়। আবার সিদ্ধবীজমন্ত্রের যথার্থ বোধে বা মন্ত্রচৈতন্যে পরাজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। অক্ষরাধিষ্ঠাত্রী ও অক্ষররূপিণী দেবী সরস্বতীর প্রথম ও চতুর্থ হস্তে তাই জ্ঞানমুদ্রা ও পুস্তকমুদ্রার কল্পনা করা হয়েছে। তিনি প্রদীপ্ত জ্ঞানের প্রতীক বোলেই এই মুদ্রা-দুটি তাঁর হস্তে শোভা পায়।

বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায়ও ওঙ্কার এবং বীজমন্ত্রের উপযোগিতা দেখা যায়। কার্ণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমতে প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্মসাধনায় ঠিক 'ওম্' বা 'হুম্' প্রভৃতি নির্দিষ্ট বর্ণবীজের অন্তর্নিবেশ ছিল না, তখন প্রাচীন মহাসাঙ্ঘিকেরা ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক প্রভৃতি সাধন-নিয়মসূত্রের অনুসরণ করতেন। ধারণীর অর্থ কোন ভাব, চিন্তা বা ধারণায় মনকে কেন্দ্রায়িত করা ও তারি পরিণতিস্বরূপ ধ্যান ও জ্ঞান-দৃষ্টির বিকাশ সম্ভব। তেমনি বিদ্যাধরের অর্থ আধার বা প্রতিষ্ঠা। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে সম্রাট কণিষ্কের ধর্মমহাসভায় হীনযান ও মহাযান-ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা হোলে মহাযানীরা ও বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকেরা বোধিসত্ত্বের আদর্শসাধনায় বিশেষ কোরে 'ওম্' ও হুম্ বর্ণবীজ-দুটির সহায়তা গ্রহণ করেন মন্ত্র-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-সাধনার সিদ্ধিলাভ করার জন্য।

অবশ্য এখানে একটি জিজ্ঞাসারও সৃষ্টি হয় যে, হীনযান ও মহাযান এবং এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে বৈদিকযুগে সাধনমন্ত্রে যখন ওঙ্কারের বিশেষ প্রচলন ছিল তখন পূর্বপ্রবর্তিত বৈদিক বীজমন্ত্র পরবর্তীকালে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে ও বিভিন্ন ধর্মসাধনায় কেন গৃহীত হোল না। ঐতিহাসিকেরা হয়তো এ' জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে ওঙ্কারতত্ত্বের সাধনা কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করলো তার সামান্য নিদর্শন দিতে গেলে শ্রদ্ধেয় লামা আনাগারিক গোবিন্দের ভাষায়ই বলি: "In order to impress this universal attitude of the *Mahâyâna* upon the devotee or *Sâdhaka* with the suggestive power

of a concentrative symbol, the sacred syllable OM opens every solemn utterance, every formula of worship, every meditation. * * And so it happened that in the moment, in which Buddhism became conscious of its world-mission and entered the arena of world-religions, the sacred symbol OM became again the 'leitmotif' of religious life, the symbol of an all-embracing urge of liberation, in which the experience of oneness and solidarity are not the ultimate aim but the *precondition* of real liberation, which was no more anxiously concerned with one's own salvation and perfect enlightenmant".

সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় বৈদিক উপাসনা ও হিন্দুতন্ত্রসাধনার মতো ওঙ্কারের স্থান ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বৌদ্ধধর্মসাধনায় ওঙ্কারকে একেবারে চরমমন্ত্র বা বর্ণবীজ বোলে গ্রহণ করা হয়নি—অন্ততঃ এটাই বৌদ্ধাচার্যদের অভিমত। তারি জন্য বোধিসত্ত্বভূমি এবং মহাযান ও বজ্রযান-সাধনায় প্রতিটি মন্ত্র, সূত্র, পূজা ও ধ্যানের প্রারম্ভে থাকে 'ওম্' ও সমাপ্তিতে থাকে 'হূম্' বর্ণবীজ-দুটি। বৌদ্ধতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় 'ওম্' ও 'হূম্' বর্ণবীজ-দুটির মধ্যে অর্থের কিছুটা পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন 'ওম্'-এর গতিপথ হোল ঊর্ধ্বপ্রসারী বিশ্বজনীনতা বা সার্বভৌমিকতার আদর্শের দিকে, আর 'হূম্'-এর গতিপথ সার্বভৌমিকতার সঞ্চার নিয়ে নিম্নদিকে পার্থিবজগতে মনুষ্য-হৃদয়ের গভীরতম দেশে: একটি উন্মীলনধর্মী ও অপরটি নিমীলনধর্মী হোলেও উভয়ে কিন্তু বিনাশ বা নিষ্প্রভতার দিকদর্শন করে না, বরং করে মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও পূর্ণব্যাপ্তি সাধন। আবার 'ওম্'-বর্ণবীজ ব্যতীত 'হূম্'-বীজের কোন সার্থকতাই থাকে না। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় এজন্য এ'দুটির সামঞ্জস্য ও সহাবস্থানকে 'মধ্যমপন্থা' নাম দেওয়া হয়েছে। মধ্যমপন্থার অর্থ নিত্য অবিনশ্বর তত্ত্ব সান্ত অথবা অনন্তের গর্ভে লীন হয় না, কিংবা একটি অপরটির কাছে আত্মনিবেদন করে না, বরং করে উভয়ের মধ্যেই সমতা রক্ষা করে এবং তাঁর ফলে হয় সাম্যগুণসম্পন্ন পরমসত্তাবান শূন্যতার প্রতিষ্ঠা।

বৌদ্ধধর্মাচার্যগণ ওঙ্কারকে বলেছেন যেন সূর্য এবং হূংকার হলো সরস মৃত্তিকা—যাতে সূর্যের তাপ ও কিরণচ্ছটা নবজীবনের সঞ্চার করে। তারি জন্য ওঙ্কার-রূপ আদিবর্ণবীজকে চিন্তা করেছেন তাঁরা অনন্ত হূংকারকেও শান্তের মধ্যে প্রতিফলিত কোরে। সুতরাং হূংকারের প্রাণবন্ত সীমার মাঝে

অসীমের বিকাশ ও পূর্ণস্ফূর্তি। আবার তারি জন্য সূক্ষ্মদর্শী বৌদ্ধসাধকেরা ও বিশেষ কোরে বজ্রযানী মন্ত্রসাধকেরা শূন্যতার মধ্যে দেখেন ব্যাপকসত্তা—যাকে বলে শূন্যতা বা নথিঙ্‌নেসের মধ্যে সাচনেস বা অ্যাটনেস। শ্রদ্ধেয় লামা আনাগারিক গোবিন্দের ভাষায় বলা যায়: "We, therefore, must have passed through that experience of OM in order to reach and to understand that still deeper experience of HUM. This is why OM stands at the beginning and HUM at the end of *mantras*. In the OM, we open ourselves and in the HUM, we give ourselves. OM is the door of knowledge, HUM is the door of realization of this knowledge in life. HUM is a sacrificial sound".

কিন্তু উপরিউক্ত ক্রম বা ধারারও আমরা বিপর্যয় লক্ষ্য করি বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের মন্ত্রমালায়। যেমন,

(১) তারাদেবীর মন্ত্র—হ্রীঁ + স্ত্রী + হূঁ + ফট্।
(২) উগ্রার „ —স্ত্রীঁ + হ্রীঁ + হূঁ + ফট্।
(৩) বজ্রার „ —হূঁ + স্ত্রীঁ + হ্রী + ফট্।
(৪) ভদ্রকালীর „ —স্ত্রীঁ + হূঁ + হ্রীঁ + ফট্।
(৫) সরস্বতীর „ —স্ত্রীঁ + হ্রীঁ + ফট্ + হূঁ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, হ্রীঁ বা হূং-বর্ণবীজ সকলের ব্যাপ্তিশেষে নাই, বরং প্রথমে, মাঝে এবং শেষে আছে। বৈদিক মন্ত্রের প্রথমে ও শেষে 'ওম্'-বর্ণবীজ পুটিত করা হয়। বৈদিক 'ওম্'-বর্ণবীজের বিশ্লেষণ যেমন অ+উ+ম, তেমনি হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের 'হূং'-বর্ণবীজের বিশ্লেষণভঙ্গিও হ+উ+ম। তান্ত্রিক বর্ণবীজগুলির বিশ্লেষণভঙ্গি একই রকমের। তবে তিব্বতীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক 'ওঁ মণিপদ্মে হূম্' পরমমন্ত্রের সজ্জাপ্রণালী অবশ্য পূর্বসিদ্ধান্তের অনুযায়ী, অর্থাৎ ওম্ প্রথমে ও হূম্ মন্ত্রের শেষে থাকে। মোটকথা বৌদ্ধতন্ত্রে আদিবর্ণবীজ ওঙ্কার পরমবীজমন্ত্র-রূপে সাধকের বোধিচেতনার দ্বার উন্মুক্ত করে ও পরমশান্তি দান করে। বৌদ্ধতন্ত্রের মতো জৈনতন্ত্রসাধনায়ও আদিবর্ণবীজ ওঙ্কারের সার্থকতা যথেষ্ট।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ আদিবর্ণবীজ ওঙ্কারের ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে ভারতীয় মন্ত্রতত্ত্ব বা মন্ত্ররহস্যের আলোকদীপ্ত দ্বার আরো উন্মুক্ত করেছেন। তবে তাঁর অনুশীলনধারার ব্যাখ্যাতা আমরা হয়তো সে

সহজ সরল ধারাকে বিচিত্র শাস্ত্রপ্রমাণ ও ব্যাখ্যার অবতারণা কোরে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানের অবসরে রামায়ণ-রচনারই চেষ্টা করেছি এখানে, কিন্তু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মন্ত্রতত্ত্ববিদ্যা উপনিষদ্বিদ্যার মতোই দুরধিগম্য ও রহস্যময় চিরদিন, এবং তারি জন্য মন্ত্রবিদ্যাকে শাস্ত্রে রহস্যবিদ্যাও বলে। আবার প্রণব-রূপ বাচক, প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যেই সেই নিগূঢ় রহস্যেরও যথার্থ সমাধান করা সম্ভব। রূপের মধ্য দিয়েই আমাদের অরূপের স্পর্শানুভূতি লাভ করতে হবে এবং এই লাভই মনুষ্যজীবনে পরমপবিত্র ও দুর্লভ।

এবার মন্ত্ররহস্যের নিগূঢ় তত্ত্বকথার শেষসিদ্ধান্ত স্বামী বিবেকানন্দেরই নিজের কথায় নিবেদন কোরে নিবন্ধ শেষ করি। স্বামীজী বলেছেন: "Even as in the case of the least differentiated and the most universal symbol Om, thought and sound-symbol are seen to be inseparably associated with each other, so also this law of their inseparable associated applies to the many differentiated views of God and the universe : each of them, therefore, must have particular word-symbol to express it. These word-symbols, evolved out of the deepest spiritual perception of sages, symbolise and express as nearly as possible, the particular view of God and the universe stand for. And as the Om represents the *Akhanda*, the undifferentiated Brahman, the others represent the *Khanda* or the differentiated views of the same Being; and they are all helpful to divine meditation and the acquisition of true knowledge' ;—অর্থাৎ শব্দ-বাচকরূপ বীজমন্ত্রগুলি সিদ্ধসাধকের ধ্যাননেত্রে প্রতিভাত ও প্রতীকরূপে রূপায়িত—নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরমচৈতন্যরূপী ব্রহ্মের স্বরূপানুভূতি লাভ করার জন্য। লাভ এখানে অর্থবাদ বা প্রশংসামাত্র, কেননা স্বয়ংপ্রকাশ সেই পরমবস্তু ব্রহ্মচৈতন্য, অজ্ঞানতার অপসারণেই হয় তার প্রকাশ। ওম্ বা স্ফোট অখণ্ডব্রহ্মেরই প্রতীক বা প্রকাশক, তাছাড়া অন্য সকল বস্তু খণ্ডব্রহ্মের দিকদর্শন করে, সুতরাং তারা ধ্যান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্ররহস্য সহজ ও সরলভাবে প্রতিফলিত হোলেও পূর্বেই বলেছি তা সাধারণ সাধকের কাছে দুরধিগম্য, কিন্তু অবিশ্রান্ত সনিষ্ঠ সাধনায় সেই দুর্লভ সত্যের দ্বারও উদ্ঘাটিত হয় এবং এই সান্ত্বনা ও আশার দীপ্ত বাণীই শুনিয়েছেন স্বামীজী এ' যুগে। তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত সমস্ত

কল্যাণচিন্তায়। তত্ত্বচিন্তাই শুধু স্থান পেত না তাঁর বোধিপ্রদীপ্ত হৃদয়ে, তত্ত্বানুভূতিও তিনি করেছিলেন নিজের জীবনে বিশ্বের ব্যাপক প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে নিজ প্রাণের নিবিড় যোগসূত্র রচনা কোরে। পৃথিবীর সংঘাতময় জীবনপ্রবাহের মধ্যে সর্বদাই প্রদীপ্ত ছিল তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষু এবং সামগ্রীক ব্রহ্মানুভূতি করেছিল তাঁর অধ্যাত্মজীবন-সার্থকতাকে প্রতিষ্ঠিত। প্রণাম করি আমরা সেই বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দকে, আশীর্বাদ করুন তিনি সকলকে অধ্যাত্মজীবনের দ্বার চির-উন্মুক্ত কোরে। ভারতের পবিত্র মন্ত্রতত্ত্ব তাঁর পুণ্যপ্রেরণাস্পর্শে আবার নূতনভাবে হোক উজ্জীবিত! অধ্যাত্মসাধনার মঙ্গলদীপমালা প্রজ্জ্বলিত হোক আবার প্রতিটি মানুষের হৃদয়কন্দরে!
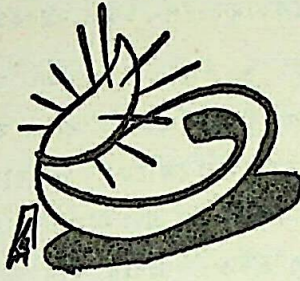
॥ ত্রয়োবিংশতি অবদান ॥

॥ অদ্বৈতবেদান্তের মূর্তপ্রতীক বিবেকানন্দ ॥

দুঃখদৈন্য ও আধিব্যাধিবিড়ম্বিত মোহমগ্ন মানবসমাজকে নূতন ভাবের সম্পদ ও কর্মের প্রেরণা দেওয়ার জন্যই যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হয়। বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে দিশাহারা হইয়া মানুষ যখন প্রকৃত কল্যাণের পথ অনুসন্ধান করিতে থাকে, পার্থিব সুখসম্ভোগের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াও যথার্থ শান্তির শীতলবারির স্পর্শ না পাইয়া মানবের অন্তরাত্মা যখন মর্মঘাতী যাতনায় হাহাকার আরম্ভ করে, ইতিহাসের অমোঘবিধানে তখনই শান্তির ললিতবাণী বহন করিয়া ধরাধামে লোকোত্তর মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। মানবসমাজের একান্ত দুঃসময়ে দুর্গত-পরিত্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া মহামানব স্বীয় অমোঘ প্রভাবে গতানুগতিক সামাজিক ধারাকে নূতন মহিমার অমৃতরসে সিঞ্চিত করেন, তার ফলে জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া সমাজদেহ নূতনত্ব লাভ করে। সুতরাং সমাজমৃত্তিকায় সম্ভাব্যতার বীজ নিহিত থাকে বলিয়াই অলৌকিক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং স্বকীয় বৃহৎ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দ্যোতনায় সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কাঠামো পরিবর্তন করিয়া মানুষকে নূতন পথে পরিচালনা করে, ইহাই যুগে যুগে দেশে মহাপুরুষের জীবন ইতিহাসের পটভূমিকা।

যুগাবতার পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য উত্তরসাধক বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁহার বহুমুখী কর্মপদ্ধতির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের তথা বাংলাদেশের এমনই এক মহাদুর্দিনে নিজের অসামান্য সাধনা ও কর্মের প্রভাবে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়া আত্মবিস্মৃতি ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে তিনি বলীয়ান্ ও গরীয়ান্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাৎকালিক সামাজিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেই এই তথ্য অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

দ্বিতলে স্বামিজীর পাঠগৃহ

নানা প্রতিকূল পরিবেশে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে হিন্দুসমাজের তখন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে তরণীর মতই চঞ্চল অবস্থা। একদিকে সদ্য সমাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজ তখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া আচার-ব্যবহারে সর্বত্র বিজাতীয় ব্যর্থ অনুকরণের নেশায় ভরপুর, অপরদিকে গর্বোদ্ধত বৈদেশিক রাজশক্তির নিষ্পেষণে এবং প্রলোভনে অনুন্নত শ্রেণী দরিদ্র অসহায় মানবগণ দলে দলে পাদ্রীসাহেবদিগের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের ধর্ম বিসর্জন দিতে উদ্যত। সমাজের উচ্চশিক্ষিত অভিজাতমহলে রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের তরঙ্গ প্রবহমান, অপরদিকে সনাতনী সমাজের উগ্র একাধিপত্য রক্ষার প্রয়াসের সহিত তাত্ত্বিকদৃষ্টিশূন্য ধর্মসংরক্ষণাভিমানী পণ্ডিতবর্গের জীবনসংস্পর্শশূন্য কূটবিচার ও যুক্তিহীন আচারের দাপট জাঁকাইয়া বসিয়াছে, যাহারা সাধারণ মানুষ তাহারা পুরাতনের মোহ ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতনতর কর্মপদ্ধতি গ্রহণে অনাসক্ত ও অনিচ্ছুক, অথচ পুরাতন ভারতীয় আদর্শের রূপদানকারী কোন শক্তিমান মহাপুরুষও তখন কল্যাণকর পথের সন্ধানদাতারূপে তাহাদের কাছে উপস্থিত নাই, পুরাতনের প্রতি চিরাচরিত সংস্কারের ফলে অনুপযোগী বুঝিয়াও তাহা বর্জন করিতে অক্ষম, অথচ নূতনকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবার সাহসশূন্য তখনকার হিন্দুসমাজ নানারূপ বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে দোলায়িত চিত্ত, অথচ পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি রচনা করিয়া সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করার মত কোন শক্তিমান নেতাই তখন ছিল না। সমাজের এই দুর্দিনে দেশের পরমকল্যাণসাধনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদের উদ্‌বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ভারত নূতন পথে যাত্রা করিয়াছিল এবং তাহারই পরিণামস্বরূপ গ্লাকির পরবশ্যতার লৌহশৃঙ্খল মুক্ত হইয়া জগৎসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজ ও দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে যথার্থপথে পরিচালনা করা সাধারণতঃ রাজনীতিকের কার্য। কিন্তু বিবেকানন্দ রাজনীতিক নহেন, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৈরিকবস্ত্র ও কৌপীনমাত্রই তাঁহার সম্বল, অথচ মহাবলীয়ান্ এই তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী রাষ্ট্রনেতা, ধর্মগুরু এবং সমাজপরিচালক হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দের এই অদ্ভুত প্রতিভামণ্ডিত সংগঠনীশক্তির বিকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হইল, সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি দেশ-দশের নেতা হইলেন কেমন করিয়া ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

রোগ দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও ক্ষয়িষ্ণু সমাজদেহের ব্যাধি নিরাকরণের জন্য প্রথমতঃ ব্যাধির কারণ নিরূপণ করিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অতুলনীয় মনীষার সাহায্যে বুঝিলেন যে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান্ করিতে না পারিলে এই মুমূর্ষু জাতির বাঁচিবার আর কোনই উপায় নাই। দুর্বলতাই জাতীয় জীবনে সকল অবনতির মূল। সুতরাং ক্লীবতা ও জড়ত্ব পরিহার করিয়া জাতি যদি নূতন বলে বলীয়ান্ না হয় তাহা হইলে জাতির পতন অনিবার্য। তাই তিনি আত্মবলে উদ্বুদ্ধ হইবার নবমন্ত্র শুনাইয়া জাতির জীবনে অমৃতরসের সিঞ্চন করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তের মূলতত্ত্ব। তিনি বুঝিয়াছিলেন বেদান্ত-জ্ঞানই ভারতের স্থিতির মূলভিত্তি। এই বেদান্তজ্ঞানের শতসূর্যসম প্রোজ্জ্বল আলোকে শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বই উদ্ভাসিত নূতন পথে জীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ করিবে—ইহাই ছিল বীর সন্ন্যাসীর স্থিরবিশ্বাস।

উপনিষদ্-উদ্ভাসিত বেদান্তজ্ঞান ভারতের অমূল্য অক্ষয় সম্পৎ। ভারতীয় চরিত্রের,—ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিই অদ্বৈতবেদান্তজ্ঞান। ইহা অনায়াসেই বলা চলে যে, বেদান্তই ভারতীয় জাতীয় আনন্দের মূল-উৎস, বেদান্তই জাতির আত্মা, বেদান্তই ভারতের জাতীয় প্রাণ। সুতরাং জাতির সকল উন্নতির চেষ্টা, সমস্ত রকমের হিতকর চিন্তা, সকল প্রাণস্পন্দন-ভাব বেদান্ত-জ্ঞানকেই কেন্দ্র করিয়া প্রবর্তিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই অদ্বৈতবেদান্তের মূলতত্ত্ব ব্যবহারিক জীবনে রূপায়িত করিয়া বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা চিরতরে বর্ধিত করিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ",—অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্রই পারমার্থিক সত্য, দৃশ্যমান এই জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে এবং জীব ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে কোনই ভেদ নাই—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মূল বক্তব্য। এই বক্তব্য বিষয় বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝায় যে, অদ্বৈতবেদান্ত বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে এক পরমসত্য বস্তুর সন্ধান দিয়াছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব বা স্বরূপ এক সত্যবস্তু, উহা অখণ্ড, শাশ্বত এবং প্রকাশশীল ও আনন্দময়। ঐ সত্যবস্তুকে যদি যথাযথ-ভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহা হইলে সেই সত্যবস্তুর অপেক্ষায় অন্য সমস্ত কিছুই অযথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জীবজগতের সমস্ত-কিছুই একটি বিশেষ নাম ও একটি বিলক্ষণ সাংগঠনিক আকার বা রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং ঐ নাম ও রূপ এই উভয়ের দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু নিজস্ব একটি পরিধির মধ্যে আবদ্ধ

হইয়া অন্য বস্তু হইতে নিজের পার্থক্য বজায় রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একই স্বর্ণনির্মিত বিবিধ অলঙ্কারসমূহের মৌলিক তত্ত্ব বা যথার্থ স্বরূপ কেবলমাত্র স্বর্ণ হইলেও গঠনবিন্যাস এবং ব্যবহারিক সৌকর্যসাধনের উপযোগী বিভিন্ন নামের সাহায্যে প্রত্যেকটি অলঙ্কারকে অপর অলঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অলঙ্কারসমূহ মূলতঃ এক স্বর্ণ স্বরূপমাত্র, স্বর্ণের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তাই সেখানে নাই। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাগতিক পদার্থের মূল অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত বস্তুর বস্তুত্ব বা মূলসত্তা ফলত এক ও অভিন্ন। সংক্ষেপে তাহার প্রণালী এইরূপ—যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া বুঝি তাহার অস্তিত্ব সর্বানুভবসিদ্ধ, বস্তু কখনও অস্তিত্বহীন হইতে পারেনা। পক্ষান্তরে যাহার অস্তিত্ব কেহ কখনও অনুভব করে না তাহা বস্তুপদবাচ্য নহে, যেমন আকাশকুসুম। সুতরাং বস্তুমাত্রই সৎ—ইহা বুঝা যায়। অতএব সত্তা সমস্ত বস্তুর মৌলিক স্বরূপ। কেবলমাত্র সত্তাই নহে, মৌলিক স্বরূপের অন্তর্গত আরও দুইটি পদার্থ বা স্বরূপ পাওয়া যায়, তাহা চৈতন্য বা প্রকাশশীলতা এবং আনন্দ। যাহা বস্তু বা সৎ তাহা প্রকাশমান, তাহা জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। বস্তু আছে অথচ তাহার জ্ঞান নাই ইহা হইতেই পারে না। কারণ, বস্তুবিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে তাহা যে আছে ইহা জানা যায় কি প্রকারে! সুতরাং বস্তু থাকিলেই তাহার জ্ঞান বা প্রকাশও আছে—ইহা অবশ্য স্বীকার্য। যাহা অসৎ বা অলীক তাহা কখনও জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং বস্তু এবং জ্ঞান পরস্পর অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ ও অভিন্ন। জ্ঞান বা চৈতন্য যদি বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত না হইত তাহা হইলে বস্তু কখনও প্রকাশিত হইতে পারিত না। অন্ধকারের স্বরূপের মধ্যে প্রকাশশীলতা নাই বলিয়াই উহা কখনও প্রকাশশীল নহে। সুতরাং বস্তুর মৌলিক স্বরূপের মধ্যে সত্তা এবং জ্ঞান এই উভয়কেই পাওয়া যায়। ঠিক তুল্য যুক্তিতে আনন্দও বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ প্রত্যেক বস্তুই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে কাহারও না কাহারও আনন্দদায়ক হয়। বস্তু নিজে যদি আনন্দস্বরূপ না হইত তাহা হইলে তাহা কখনও আনন্দ দান করিতে পারিত না। নির্গন্ধ বস্তু যেমন গন্ধদায়ক হয় না, নিরস বস্তুর নিকট হইতে যেমন রস গ্রহণ করা চলে না, তেমনই বস্তু আনন্দময় না হইলে উহা কখনও আনন্দদায়ক হইতে পারিত না। সুতরাং আনন্দও বস্তুর স্বরূপেরই অন্তর্গত। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলেই স্পষ্টতঃ বুঝা

যাইবে যে, সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দই সমস্ত বস্তুর মূলস্বরূপ, উহাই বস্তুর প্রকৃত পরিচয়। এই সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দদায়ককে আশ্রয় করিয়াই জাগতিক ব্যবহারের উপযোগী নাম ও বিভিন্ন আকার প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সুতরাং সমস্ত বস্তুর নাম ও আকারকে বাদ দিয়া যদি চিন্তা করা যায় তাহা হইলে সেখানে আর কোন ভেদ থাকিবে না, তখন দেশ-কালরূপ গণ্ডীর সীমানা ছাড়াইয়া এক মহাসত্য বিশ্বব্যাপীরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নাম ও রূপের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেকটি বস্তুকে একটি পৃথক সত্তাশালী বলিয়াই মনে হইবে। বস্তুতঃ পরমার্থ সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত দৃশ্যমান জগৎকে অস্বীকার করা যায় না, অদ্বৈত-বেদান্তও তাহা করে নাই। বৈদান্তিকগণ জীবজগতের উপলব্ধরূপের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করেন নাই। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি তাহা মূলতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মেরই স্বরূপমাত্র। কিন্তু মায়াচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির প্রভাবে আমরা মূল ব্রহ্ম পদার্থকেই বুঝিতেছি ইহা অনুভব করি না, প্রত্যেকটি বস্তুকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া একটি বিশেষ নামরূপাত্মক বস্তুরূপেই অনুভব করিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুদ্রতার গণ্ডীই আমাদিগকে অপরের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, আত্মিক সমতা বা সামগ্রিক তথ্যগত অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই ক্ষুদ্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রভাবে আকুল হইয়া পড়ি এবং একান্তভাবে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রচেষ্টাই আমাদের মুখ্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বব্যাপী অজর অমর শাশ্বত আত্মাকে সামান্য দেহের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ মনে করিয়া নিজেকে সুখী করিবার অসামান্য প্রয়াসে আমরা চতুর্দিকে ধাবিত হই। প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্কীর্ণতাবোধই আমাদিগকে দুর্বল করে, ব্যক্তিগত জীবন হইতে সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রজীবনেও এই দুর্বলতাই অভিব্যক্ত হইয়া নানা সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কাজেই জাতীয় জীবনের দুর্বলতা সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে হইবে, ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত নিজের ব্যক্তিসত্তাকে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। এই বিশ্বজনীনতার মূলমন্ত্রই অদ্বৈতবেদান্তের সমস্ত বক্তব্যের সারমর্ম। আমিই ব্রহ্ম, আমি অসীম অনন্তস্বরূপ, যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে আমার সত্তাই বিরাজিত—এই বোধ যদি প্রকৃতপক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে আর পৃথক

বলিয়া মনে হইবে না, হৃদয়ে অসীম বল সঞ্চারিত হইবে, সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া এক পরমানন্দধারায় জীবন পরিপূর্ণ হইবে। সুতরাং ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে, জীবনের মূল-উৎসের অন্বেষণ করিতে হইবে এবং আত্মিক সমতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বভুবনকে আপনার একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই জীবনের পরিপূর্ণ রূপ। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও এই জন্যই বেদান্তের এই মহাবাণী, এই গভীর সত্য উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুভূতি, জীবজগতের সহিত আত্মার অচ্ছেদ্য অভিন্নভাবই তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বিশ্বসভায় প্রচার করিয়াছেন।

স্বামিজীর সমগ্র জীবনের কর্মপদ্ধতির ভিতর দিয়া বেদান্তের এই অমোঘ বাণী রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই তিনি উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-বিদ্বান্ নির্বিশেষে সকলকে নিজের ভাই বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং প্রতিক্ষেত্রে প্রতিপদে নিজের কর্মের ভিতর দিয়া এই সত্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মেরুদণ্ডহীন দুর্বল জাতীয় জীবনকে সবল করিয়া চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভের উপযোগী এক মহাতেজিয়ান ও বলীয়ান জাতিগঠনই স্বামিজীর জীবনে লক্ষ্য ছিল। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, নিজের অন্তরে যেই মহাশক্তির ও আনন্দের প্রস্রবণ লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধান না পাইলে কেবলমাত্র বাহির হইতে ধার করা শক্তি বা আনন্দের সাহায্যে জীবনের পরিপূর্ণতা-লাভ সম্ভব হয় না। সেইজন্যই তিনি বেদান্তের দুরূহ ও জটিল তত্ত্ব সারগর্ভ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজ সাবলীল ভাষায় নিরলসভাবে সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন, আত্মবিস্মৃত ম্রিয়মান জাতির সম্মুখে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন: শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—হে বিশ্ববাসীগণ, তোমরা শুন, তোমরা অমৃতের সন্তান, তোমরা দুর্বল নহ, তোমরা প্রত্যেকে বিরাট, তোমরা ধনবান, তোমরা মহামহীয়ান্।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৈদান্তিকগণ জীবজগৎকে তো মিথ্যাই বলিয়াছেন, সুতরাং বেদান্তের দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের বাস্তব মূল্য কিছুই নাই। অথচ বিবেকানন্দ এই বিশ্ববাসী মানবজগতের কল্যাণের জন্যই সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করিয়াছেন। মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠাই তাহার জলন্ত প্রমাণ। শারীরিক শক্তির অনুশীলন করিয়া মানুষ যাহাতে সুস্থ ও সবল হয় তিনি তাহার জন্যই উপদেশ দিয়াছেন, বিশেষতঃ দরিদ্র বুভুক্ষু জাতির দারিদ্র্য দূর করিয়া যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে তিনি বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের সহিত

স্বামিজীর উপদেশ ও আচরণের সামঞ্জস্য কোথায়, বরং অসঙ্গতিই ফুটিয়া উঠিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা আপাততঃ সম্ভবপর হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের মূল-বক্তব্যের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ বেদান্ত জীবজগৎকে যে মিথ্যা বলিয়াছে তাহার অর্থ ইহা নহে যে, জীবজগৎ একেবারেই অলীক বা আকাশকুসুমাদির মত অসৎ। পক্ষান্তরে তাহারা জীবজগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবজগতের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় না—শুধু ইহাই তাহাদের বক্তব্য। এই বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যে কোনও বস্তুকে আমরা একটি বিশেষ নাম ও আকার বা গঠন-পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণতঃ বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐ নাম এবং রূপের অস্তিত্ব কতখানি ব্যাপক তাহা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বস্তুর মৌলিক সত্তার অতিরিক্ত পৃথক্ কোনও সত্তা নাম বা রূপের নাই। সুবর্ণনির্মিত বিবিধ অলঙ্কারের নাম ও রূপগত যতই ভেদ থাক না কেন, কোন অলঙ্কারেরই সুবর্ণের সত্তা ভিন্ন অতিরিক্ত কিছু অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝা যায় যে, সুবর্ণরূপ একটি মৌলিক সত্তাকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন নাম ও আকার অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি অলঙ্কারের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইলেও অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিলেই বুঝা যায় যে, এক সুবর্ণই বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নানা নামে খ্যাত হইয়াছে। অতএব অলঙ্কারের মূল সত্তা সুবর্ণ। উহাই অলঙ্কারের বাস্তব রূপ। অন্যান্য আকার ও নাম, ব্যবহারের সুবিধার জন্য কল্পিত মাত্র। যাহা কল্পিত তাহা যে খাঁটি সত্য নহে, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। এইরূপ বহির্দৃশ্যমান সমগ্র জীবজগৎও মূলীভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দকে কেন্দ্র করিয়াই অসংখ্য নাম ও রূপের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, তাহা বস্তুর মূলীভূত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই অনুভব। কিন্তু বাসনা এবং অজ্ঞানের দ্বারা আমাদের চিন্তাশক্তি কলুষিত বলিয়া অনুভূয়মান ব্রহ্মের স্বরূপ আমরা হৃদয়ে অনুভব করি না। বিভিন্ন কাচের আবরণের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত বৈদ্যুতিক আলোকের মূল-উৎস কাচ নহে, অথচ আমরা অনেক ক্ষেত্রে কাচকেই যেমন আলোক বলিয়া মনে করি, ব্যবহারিক জগতেও ঠিক ঐরূপ নামরূপের সাহায্যেই ব্রহ্মকে আমরা অনুভব করিয়া নাম ও রূপকেই একমাত্র বস্তু বলিয়া মনে করি। সুতরাং বৈদান্তিকগণ জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন—ইহার অর্থ এই নহে যে তাহারা জগৎকে আকাশকুসুমের মত অলীক বা অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান, উহা অখণ্ড, অবিনশ্বর। কিন্তু আমরা তাহা না বুঝিয়া খণ্ড খণ্ড রূপে প্রত্যেকটি বস্তুকে যে সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তাশালী বলিয়া মনে করি, আমাদের এই ধারণা যথার্থ নহে, ইহাই বৈদান্তিকের বক্তব্য। যাহা কিছু দেখি বা বুঝি, তাহা আসলে সচ্চিদানন্দময় হওয়া সত্ত্বেও আমরা ঠিক সেইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্বত্র এক অখণ্ড বস্তু অনুভব করি না। এই যে অনুভবের গোলমাল, ইহাই ভুল। কিন্তু বিচারাত্মক বুদ্ধি ও মননশীলতার সাহায্যে যদি সমস্ত বস্তুর আসল রূপটিকে অনুভব করা যায় তাহা হইলে বিশ্বজগতের সব-কিছুই আনন্দময় হইয়া উঠিবে, সত্যের চিরভাস্বর জ্যোতিতে হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইয়া এক নূতন বিশ্ব প্রতিভাত হইবে। এই নূতন বিশ্বের অনুভূতির ফলে আমার 'আমিত্ব' পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে, সমুদ্রে নিপতিত জলবিন্দুর মত বিরাট সত্তার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিব, বিশ্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত নিজের অভেদ ভাব পরিস্ফুট হইবে। সুতরাং বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্বভুবনে এই মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন যে, তুমি আমি প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বত্র সমতাবোধ জাগ্রত করিতে হইবে, ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া বহুত্বের মধ্যে এক বৃহৎ আমিত্বের স্বাদ অনুভব করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলেই সমস্ত দুর্বলতা দূর হইয়া যাইবে। কারণ অনন্তশক্তির প্রস্রবণরূপেই তখন নিজেকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, অমৃতের আস্বাদে হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যাওয়ার ফলে তখন সমস্ত দুঃখ-দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে।

এখানে ইহাও স্মরণযোগ্য যে, এইভাবে সমস্ত বস্তুর মৌলিক সত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রথমতঃ শারীরিক সুস্থতা আবশ্যক। শরীর সুস্থ না হইলে সবল হওয়া যায় না এবং সবল না হইলে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন সম্ভব নহে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—ইহাই উপনিষদের বাণী। দেহ ও মন সুগঠিত না হইলে কাহার সাহায্যে আমরা অন্তরের বোধকে জাগ্রত করিব? এই দেহ-মনের সাহায্যেই তো তাহা করিতে হইবে। সুতরাং সর্বাগ্রে দেহ ও মন সংগঠন করিতে হইবে, তাহা হইলেই আত্মদর্শনের প্রচেষ্টার অধিকার জন্মিবে। প্রতি পদেই যদি দৈহিক ও মানসিক অপুষ্টতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে স্থিরচিত্তে মননশীলতার চরম শিখরে আরোহণ করার প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসমাত্র। আবার দেহ ও মন সুস্থ রাখিবার প্রধান উপাদান যথোপযুক্ত আহার। বুভুক্ষুর দেহ-মন কখনও সুস্থ থাকে না, তারফলে ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে স্থিরমস্তিষ্কে কোন কিছুই করা

সম্ভব নহে। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ অমৃতের স্বাদ-লাভের অধিকারী করিবার জন্য প্রাথমিক এবং প্রধান কর্তব্য হিসাবে সমগ্র দেশবাসীকে দেহ-মন সংগঠন করিবার জন্য বারবার আহ্বান জানাইয়াছেন, জঠরের ক্ষুধা দূর করিবার জন্য যথোপযুক্ত অন্নের সংস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষের স্বাভাবিক, ইহা দূর করিতে না পারিলে দেহ-মনের বিকাশসাধন সম্ভব নহে। উপনিষদেও দেখা যায় যে "অন্নং বহু কুর্ব্বীত"—এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক জীবজগতের মধ্যে আমরা বাস করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক জগতের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্যবহারিক জগৎকে একেবারে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, বস্তুতঃ অদ্বৈতবেদান্ত ব্যবহারিক জগৎকে স্বীকার করিয়াই সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করিয়াছে। সুতরাং স্বামিজীর সমগ্র জীবনব্যাপী যে অনন্যসাধারণ কর্মানুশীলন ও জ্ঞানচর্চার সমন্বয় দেখা যায়, তাহাই অদ্বৈতবেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ। অদ্বৈত-বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তক আচার্য শঙ্করের জীবন এই বিষয়ে উৎকৃষ্টতর উদাহরণ। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াও আচার্য শঙ্কর সমগ্র জীবন-ব্যাপী যে মহতী কর্মসাধনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় সুধীসমাজে নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। আচার্য শঙ্করের সহিত এই অংশেও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের ধারক ও বাহক হইয়াও বীর সন্ন্যাসী সমাজ ও জাতিগঠনের যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা একমাত্র বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। সমগ্র বিশ্বভুবনের সহিত যে নিজের আত্মিক সম্পর্ক মনেপ্রাণে অনুভব করে, কেবলমাত্র সেই বিশ্ব-প্রেমিক হইতে পারে এবং বিশ্বপ্রেমিক না হইলে বিশ্বের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টাও সম্ভব নহে। কেবলমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সামগ্রিকরূপে বিশ্বের কল্যাণসাধন করা যায় না। সুতরাং আত্মিক সত্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলের অন্তর্নিহিত মূল সত্তার সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতে না পারিলে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনের মূল সূত্রটি অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যাইবে। এইজন্যই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিবার জন্য সুষম পথের সন্ধান দিয়াছেন। দুর্বলতা, ভীরুতা এবং কাপুরুষতা দূর করিয়া এক সুস্থ সবল জাতি গঠন করিবার মূলমন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে জীবনের প্রাথমিক স্তর হইতেই প্রচেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমতঃ স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া ঐহিক অভিযোগের ঊর্দ্ধ্বে উঠিতে হইবে। তারপরে সুস্থ দেহ-মনের প্রভাবে সকলকে

ভালবাসিয়া নিজের সমস্ত কর্মোদ্যম সদ্‌ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ মনের বিক্ষিপ্তভাব দূর হইয়া যাইবে এবং সমগ্র বিশ্বভুবনের মূল সচ্চিদানন্দের সহিত নিজের পরিপূর্ণ মিলন সাধিত হইয়া মানব-জীবনের চরম চরিতার্থতা সাধিত হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের চরম লক্ষ্যকে জীবনের আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া ব্যবহারিক জীবনের যথোপযুক্ত সদ্‌ব্যবহারই বেদান্তদর্শনেরও বক্তব্য। বিবেকানন্দও তাহাই করিয়াছেন। নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি মহাজীবনের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, ভূমার মধ্যে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন। এইজন্যই কোন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের সীমারেখা তাঁহার অমিতবিক্রম তেজস্বিতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, প্রতি পদে প্রতিক্ষেত্রে তিনি মহাজীবনের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সকলের জন্যই দ্বিধাহীন চিত্তে কর্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, নিজের জীবন দিয়া সকলকে মহত্ত্বের প্রেরণা দিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সাধনার পরম ও চরম লক্ষ্য, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মর্মবাণী। সুতরাং আজ সেই অমিতবিক্রম তেজস্বী অদ্বৈতকেশরী বীর সন্ন্যাসীর শতবর্ষপূর্তি-দিবসে আমাদের অন্তরের সমস্ত-কিছু তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার শিক্ষা যাহাতে জীবনে সার্থক হয় ইহাই শুধু প্রার্থনা করি।

২৪
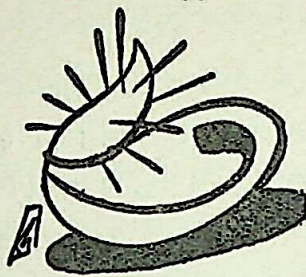
॥ চতুর্বিংশ অবদান ॥

॥ বাংলার তন্ত্র ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥

পাণিনীয় সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে 'তন্ত্র' শব্দের এইরূপ নিরুক্তি নির্ধারিত হইয়াছে : "তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্", অর্থাৎ যে শাস্ত্র-দ্বারা জ্ঞানের বিস্তার সাধন হয় তাহাই 'তন্ত্র'। ব্যাপক অর্থে 'তন্ত্র' শব্দ শাস্ত্রমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে, যেমন সাংখ্যদর্শনের অপর নাম কাপিলতন্ত্র, ন্যায়দর্শনের অপর নাম গোতমতন্ত্র, বেদান্তদর্শনের নামান্তর উত্তরতন্ত্র, মীমাংসাদর্শনের নামান্তর পূর্বতন্ত্র। ক্রমে ক্রমে 'তন্ত্র' শব্দটি এক বিশিষ্ট সাধনমার্গের শাস্ত্র সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে। 'কামিক আগমে' তন্ত্রের নিরুক্তি এইভাবে নির্ণীত হইয়াছে :

"তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্ব-মন্ত্রসমন্বিতান্।
ত্রাণং চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে"॥

যে শাস্ত্র তত্ত্ব ও মন্ত্রসমন্বিত বহু অর্থের বিস্তারসাধন করে এবং ঐ জ্ঞানের দ্বারা সাধককে পরিত্রাণ করে তাহাই 'তন্ত্র' নামে অভিহিত।

তন্ত্রশাস্ত্রের নামান্তর "আগম"। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ববৈশারদীতে (যোগ-সূত্রের ব্যাসভাষ্য-ব্যাখ্যা) "আগম" শব্দের তাৎপর্য নির্ণয়প্রসঙ্গে বলেন : "আগচ্ছন্তি বুদ্ধিমারোহন্তি যস্মাদ্ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সোপায়াঃ, স আগমঃ"। যে শাস্ত্র-দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষের উপায়সমূহ বুদ্ধির গোচরীভূত হয় তাহাই "আগম"। বেদ কর্মকাণ্ড-দ্বারা কেবল স্বর্গাদি ভোগ-সাধনের স্বরূপ উপলব্ধি করায়, অথবা জ্ঞানকাণ্ড-দ্বারা কেবল মোক্ষের স্বরূপ ও তাহার সাধনপন্থা নির্দেশ করে। কিন্তু "আগম" ভোগ ও মোক্ষের সমন্বয়বিধান পূর্বক ব্যবহারিক সুখ ও পারমার্থিক আনন্দ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকে।

বর্তমানে আমরা "তন্ত্র" বলিতে সাধারণতঃ "শক্তিতন্ত্র"-কেই বুঝিয়া থাকি। বস্তুতপক্ষে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের

প্রত্যেকেরই স্ব স্ব তন্ত্রশাস্ত্র রহিয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধদের ভিতরও তন্ত্রসাহিত্য ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। সকল সাধক সম্প্রদায়ের ভিতরেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শক্তিবাদ প্রবিষ্ট হইয়া আছে।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সাধনার দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, একটি বৈদিক ধারা, অপরটি তান্ত্রিক ধারা। একটি সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্যভাবে সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপাদন করে, অপরটি বিশিষ্ট অধিকারী সাধকদের জন্য গুহ্য সাধনার উপদেশ দিয়া থাকে ('গুহ্যঃ আদেশঃ')। বৈদিকযুগে বৈদিক সাধনপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিরও প্রচলন ছিল, উপনিষৎসমূহে বর্ণিত বিবিধ বিদ্যার বিবরণ হইতে তাহা প্রতীত হয়। বৃহদারণ্যক (৬।২) এবং ছান্দোগ্য (৫।৮) উপনিষদে বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রসঙ্গে "যোষা বাব গোতমাগ্নিঃ" ইত্যাদি রূপকের ভিতর তান্ত্রিক সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত (৩।১-১০) মধুবিদ্যা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আদিত্যের ঊর্ধ্বমুখ রশ্মিসমূহ মধুনাড়ী, গুহ্য আদেশ মধুকর, ব্রহ্মই পুষ্প, উহা হইতে নির্গলিত অমৃতকে সাধ্যগণ উপভোগ করিয়া থাকেন ইত্যাদি বর্ণনাতে তান্ত্রিক সাধন-রহস্যের গুহ্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের স্বকৃত শৈবভাষ্যে (২।২।৩৮) শ্রীকণ্ঠাচার্য বলেন যে, বেদ ও তন্ত্র উভয়ই শিব কর্তৃক রচিত হওয়াতে তুল্যরূপেই প্রামাণ্য। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে, বেদ কেবল ত্রৈবর্ণিকদের জন্য অর্থাৎ ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদেরই অধিকার। পরন্তু তন্ত্রে সকলেরই অধিকার সমভাবে বিদ্যমান। বেদ ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে প্রামাণ্য: "উভাবপি প্রমাণভূতৌ বেদাগমৌ"। কুল্লুকভট্ট মনুস্মৃতির (২।১) টীকাতে হারীত ঋষির একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন: "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদেকী তান্ত্রিকা চ"। তদনুসারে তন্ত্রের প্রামাণিকতা শ্রুতির সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কুলার্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে: "তস্মাদ্ বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাগমং প্রিয়ে" (২।১৪০)।

তন্ত্রের বৈদিকতা এবং হিন্দুর ধর্মজীবনে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্তিত আকারমাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বেই তাহাকে আমি ব্রাহ্মণভাগ, বিশেষতঃ অধ্বর্যু ব্রাহ্মণভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই; তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে, শ্রৌত বা স্মার্তকর্ম ব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমুদয় প্রচলিত কর্মকাণ্ডই

তন্ত্র হইতে গৃহীত। আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনাপ্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে"—(হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা)।[১]

কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' নামক বক্তৃতায় স্বামিজী বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত তন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতে কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্চনা এখনও ঐ বৈদিক কর্মকাণ্ডানুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুশাসন অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়মিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিকমন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে-সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসন্নিবেশ অধিকাংশ স্থলে বেদানুযায়ী নহে, তন্ত্র বা পুরাণানুযায়ী"—(ভারতে বিবেকানন্দ, ১৩৩১, পৃঃ ৩৮১-২)।

স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছেন : "বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণভাগই একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আজকালকার সমুদয় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে"—(ঐ, পৃঃ ৬৪৬)।

তন্ত্রের সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বঙ্গদেশকেই তান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি স্থান বলিয়া অনুমান করেন। অধ্যাপক হ্বীন্‌টারনিজ্ (Prof. Winternitz) বলেন : 'তন্ত্রের আদি জন্মভূমি বঙ্গদেশ বলিয়া মনে হয়, বঙ্গদেশ হইতে তন্ত্রশাস্ত্র আসাম ও নেপালে এমনকি বৌদ্ধধর্মের মারফৎ তিব্বত ও চীন পর্যন্ত প্রচারিত হয়'।[২]

এই মতবাদ সকলে গ্রহণ করিতে না পারেন; কিন্তু কতকগুলি মূলতন্ত্র বা তাহাদের অংশবিশেষ যে বঙ্গদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদবাক্য ও তান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত আছে :

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্কচিৎ ক্কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ংগতা" ॥

---

(১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৫০
Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, Reply to the Madras Address, p. 282

(২) History of Indian Literature: by Prof. Winternitz, Vol. I, p. 592.

অর্থাৎ এই তন্ত্রবিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া মিথিলায় প্রকটিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশলাভ করিয়া গুজরাটে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কামধেনু ও বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে বর্ণসমুদয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা বাঙ্গালা অক্ষরের বিষয়েই অধিক সঙ্গত হয়। বরদাতন্ত্রে কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গকেই ঐ তন্ত্রের উৎপত্তি স্থান বলিয়া অনুমান হয়। কালীবিলাসতন্ত্রের দুইটি মন্ত্র (১৫।৩-৪) আসাম ও পূর্ববঙ্গের ভাষার সংমিশ্রণে রচিত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় কতকগুলি প্রাচীন তন্ত্রের সম্পূর্ণ না হইলেও কতকাংশ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব মতবাদ তাঁহার নিম্নোক্ত উক্তি হইতে জানা যায়: "আমার মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত, দু'মাস ধরে আর যাগ করবার জো-টি নেই, একরাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পূজা শেষ করে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে, সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ একরাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হল"।[৩]

বৌদ্ধধর্মের সহিত তন্ত্রের সম্বন্ধবিষয়ে স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছেন: "বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদের ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি"—(ভারতে বিবেকানন্দ; পৃঃ ৬৪৬)।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধ পালরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে বহুতান্ত্রিক সাধক ও তান্ত্রিকনিবন্ধকারের আবির্ভাব হয়। মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্যকেই প্রাচীনতম বাঙ্গালী তন্ত্রনিবন্ধকার বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার "কাম্যযন্ত্রোদ্ধার" নামক নিবন্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমিত হয়।

দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ শ্রীসর্বানন্দ ঠাকুর পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার মেহার নামক স্থানে আবির্ভূত হন। ইনি পৌষ-সংক্রান্তি,

---

(৩) স্বামীজীর বাণী ও রচনা নবম খণ্ড, পৃঃ ৪১৭।

শুক্রবার, অমাবস্যা তিথিতে মেহারে জীনবৃক্ষমূলে উৎকট শব-সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তদীয় পুত্র শিবনাথ ভট্টাচার্যকৃত "সর্বানন্দ-তরঙ্গিণী" নামক সংস্কৃতগ্রন্থে সর্বানন্দের জীবনচরিত বর্ণিত আছে। সর্বানন্দ বিরচিত "সর্বোল্লাসতন্ত্র"[৪] একখানি বিখ্যাত তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থ। সর্বানন্দ বারাণসী ধামে গমন করিয়া তথায় বীরাচার তান্ত্রিক সাধন প্রকাশিত করেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যতগুলি তন্ত্র-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহাদের সকল-গুলির মধ্যে কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের 'তন্ত্রসার' সমধিক প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপে ইহার জন্ম হয়। কৃষ্ণানন্দ তদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খল বামাচারী তান্ত্রিকগণের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার জন্য 'তন্ত্রসার' প্রণয়ন করেন। ইহার ফলে বামাচারী তান্ত্রিকগণের অনেক কুক্রিয়া রহিত হইয়া যায়। বাংলার তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি প্রধানত এই গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দও তান্ত্রিক বামাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং উহার নিরসনকল্পে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামিজী বলিয়াছেন: "বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপারসমূহের আবির্ভাব হইল তাহার বর্ণনা করিবার আমার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠান-পদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক অশ্লীল গ্রন্থ—যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখনও বাহির হয় নাই বা মানবমস্তিষ্ক কল্পনা করে নাই, অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি—যাহা আর কখনও ধর্মের নামে চলে নাই। এসবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি"।

সুপ্রসিদ্ধ শক্তিসাধক তন্ত্রাচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যা মহাপীঠে তারাবিদ্যার সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার রচিত "শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী" গ্রন্থে অষ্টাদশ উল্লাসে শাক্তদিগের আচার-অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার "তারারহস্য" গ্রন্থে চারি পটলে তারা উপাসনার আনুষঙ্গিক আচারাদি আলোচিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ গিরির উপযুক্ত শিষ্য পূর্ণানন্দ পরমহংস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার 'শাক্তক্রম'-গ্রন্থ ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খ্রীঃ) রচিত হয়। শাক্তক্রমের সাত উল্লাসে শাক্তদের আচার ও অনুষ্ঠানাদি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীঃ) "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" নামক বিখ্যাত

---

(৪) বর্তমান প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক সম্পাদিত, এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪১

তন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীবিদ্যার উপাসনা ও প্রাসঙ্গিক আচারাদি প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ "ষট্‌চক্রনিরূপণ"—উক্ত গ্রন্থেরই ষষ্ঠ প্রকাশ (অধ্যায়) মাত্র। পূর্ণানন্দ রচিত "শ্যামারহস্য"-গ্রন্থে কালী-উপাসকের আচার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থের নাম "তত্ত্বানন্দতরঙ্গিনী" ও 'ষটকর্মোল্লাস'।

বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগে অনেক বাঙ্গালী সাধক-কবি মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে তন্ত্রোক্ত দেবতার মাহাত্ম্য ও তান্ত্রিক উপাসনার রহস্য প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম (১৬শ শতাব্দী), বিজয়গুপ্ত (১৬শ শতাব্দী) এবং ভারতচন্দ্র (১৮শ শতাব্দী) সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের রচিত চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল ও কলিকামঙ্গল আজ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে গীত হইয়া বাংলার জন-মানসে শক্তি-মহিমা ও তান্ত্রিক সাধনার ধারা জাগরূক রাখিয়াছে।

শাক্তসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে সাধক রামপ্রসাদই (১৭১৮-৭৫ খ্রীঃ) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বঙ্গপল্লীর অসংখ্য নরনারী আজিও রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতসুধা পান করিয়া সংসারের দুঃখ-জালার মধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে এবং জগজ্জননীর চরণোপান্তে ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হয়। রামপ্রসাদের পরেই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কাল্‌নার তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্তের নাম করা যাইতে পারে। তিনি বহু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। 'সাধকরঞ্জন' নামে তান্ত্রিক যোগ প্রতিপাদক একখানি বাংলা গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

সাধনাই যাঁহাদের প্রসিদ্ধির কারণ এক্ষণে সেইরূপ কয়েকজন বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। গোঁসাই ভট্টাচার্য নামে সুপরিচিত রত্নগর্ভ নামক সাধক (১৬শ শতাব্দী) বাংলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চাঁদ ও কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। ঢাকার অন্তর্গত মাইসারের দিগম্বরীতলায় তিনি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোঁসাই ভট্টাচার্য বীরাচার অবলম্বনে সাধনা করিয়া অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

শতাধিক বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠে বামাক্ষেপা নামক তান্ত্রিক সাধক তারাদেবীর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। নাটোরের সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দ নাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি প্রভৃতি অনেক তান্ত্রিক সাধক এইখানে সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনকাল মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠদশক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদের সাধনকাল ইহার প্রায় একশতাব্দী পূর্ববর্তী। এই একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার শক্তি

সাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ষকাল বাংলার জন-মানসের মধ্যেই শাক্তধর্ম একটি উদার ধর্মরূপে বিবর্তন লাভ করিতেছিল, এই ধারারই পরিণতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। তাঁহার সাধক জীবনের ইতিহাসে দেখি, তিনি তান্ত্রিক কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট প্রথমে শাক্তমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর পূজারীরূপে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন। স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাধনকাল। ইহার মধ্যে তিনি ১২৬২—৬৫ এই চারিবৎসরকাল ভবতারিণীর পূজকরূপে ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া সাধনা করেন। তৎপর ১২৬৬—৬৯ এই চারিবৎসরকাল তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর উপদেশ ও নির্দেশে বিধিমতে তন্ত্রোক্ত সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ১২৭০-৭৩ এই তিন বৎসরকালে বৈষ্ণব-সাধনা, অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা, ইসলাম, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি বহুতর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। পরিশেষে সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদামণিকে তান্ত্রিক পদ্ধতিমতে শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী মহাবিদ্যারূপে উপাসনা করিয়া সকল সাধনার পরিসমাপ্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: "যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। আবার যখন ভাবি, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি কালী বলি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি"।—কথামৃত ৩।১।৬

"যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী, মা, আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জলে ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে শক্তি বা কালীর উপমা"। —কথামৃত ১।১২।৯

তান্ত্রিক সাধনার মূল সিদ্ধান্ত এই যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম ও তাঁহার গুণময়ী মহাশক্তিতে কাল্পনিক ভেদমাত্র, বাস্তব কোন ভেদ নাই। শক্তি যখন ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাঁহাকে নির্গুণ বলে; পুনঃ শক্তি যখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সগুণ বলে। মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ (৪।১৫)

হে জগন্মাতঃ, স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যক্ত-অব্যক্ত, সাকার-নিরাকার—সবই তুমি। তোমায় কে জানিতে সমর্থ ?

তন্ত্রের উক্ত মতবাদের নাম 'শাক্তাদ্বৈতবাদ'। শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ্যতঃ এই শাক্তাদ্বৈতবাদ বিধান করিয়াছেন। তাঁহার কথামৃতের মধ্যে এই মতের কথাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। "মাতৃভাব বড় শুদ্ধ ভাব"। এই মাতৃভাবের উপাসনার বিশেষ প্রচারের জন্যই তাঁহার আগমন। কামকলুষিতবুদ্ধি জীবগণের পক্ষে ইহা মহৌষধ।

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। বাংলার উনবিংশ শতকের ধর্ম ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বোধি', তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল উনবিংশ শতকের বিদেশী শাস্ত্রদর্শনে পরিশীলিত 'বুদ্ধি' যাহার প্রতীক হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বুদ্ধি বোধিকে আশ্রয় করিল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বোধিকেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্রবিশ্বে ছড়াইয়া দিলেন 'বেদান্ত'-রূপে। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে এই বেদান্তই বিশ্বমানবের মিলন কেন্দ্র। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত যে খাঁটি শাক্তমত, ইহাও যেমন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, তেমনই আবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, এই খাঁটি শাক্তমত ও খাঁটি বেদান্তমতের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, একটা ব্যাপক সমন্বয়দৃষ্টির মধ্যে ইহারা বিধৃত রহিয়াছে।

বৈদিক সাধনা যেরূপ বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্য দিয়া অদ্বৈতবেদান্ত-সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ আগমোক্ত প্রয়োগ-পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য থাকিলেও বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার আদর্শ এক এবং অভিন্ন।

বৈদিক সাধনার যাহা ভাবনাময়অংশ তাহাকে বাহ্যিক ক্রিয়াত্মকরূপে প্রকাশ করাই তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। বেদান্তের সহিত তন্ত্রের কোন বিরোধ নাই। অদ্বৈতবেদান্তের পরমাচার্য ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী প্রভৃতি চারিটি মঠে শ্রীবিদ্যাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ যন্ত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তৎকৃত 'প্রপঞ্চসারতন্ত্রে' শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর 'সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্রে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশেষ মহিমা অসাধারণ কবিত্বের সহিত তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রচনা করিয়াছেন।

উপাসনা ব্যতীত অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এইজন্য উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার ভাষ্যাদিতে অতিবিস্তৃতভাবে সগুণব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপদে "অন্তস্তদ্ ধর্মোপদেশাৎ" এই সূত্রে আকারবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা বিচারিত হইয়াছে। এই সূত্রের ভামতী টীকার ব্যাখ্যাতে আচার্য অমলানন্দ লিখিয়াছেন ঃ
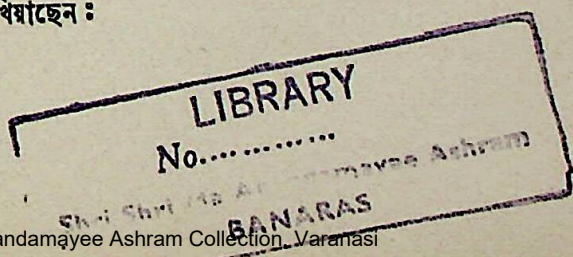
নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥
বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥

—কল্পতরুঃ

নিম্নাধিকারিগণ নির্বিশেষ শুদ্ধব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য শ্রুতিই সবিশেষ সগুণব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন। এই সগুণব্রহ্মের উপাসনা-দ্বারা উপাসকের চিত্ত একাগ্র হইলে সেই সবিশেষ ব্রহ্মই সবিশেষরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নিরুপাধি শুদ্ধব্রহ্ম-রূপে সাধকের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদীরও সগুণব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত অপেক্ষিত। সগুণব্রহ্মের উপাসনা অদ্বৈতবাদের প্রতিকূল নহে, প্রত্যুত একান্ত অনুকূল।

ভগিনী নিবেদিতা 'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' (The Master as I saw Him)-গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি এমন কিছুই প্রচার করেন নাই, যাহা মূর্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই তাঁহার একমাত্র আদর্শ, অদ্বৈতদর্শন তাঁহার একমাত্র মতবাদ, এবং বেদ ও উপনিষদ তাঁহার একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষের জগজ্জননীবোধক 'মা'-শব্দটি তাঁহার মুখে সর্বদাই লাগিয়াই থাকিত। আমরা যেমন আমাদের পরিবারের মধ্যে সুপরিচিত কাহারও সম্বন্ধে কথা কহিয়া থাকি, তিনিও জগদম্বার সম্বন্ধে সেইভাবে কথাবার্তা কহিতেন। তিনি দিবারাত্র তাঁহারই ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। অন্য সন্তানগণের ন্যায় তিনি সকল সময় শান্তশিষ্ট ছিলেন না। কখনও তিনি দুষ্ট ও বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেন, কিন্তু সে কেবল তাঁহারই প্রতি। ভালমন্দ যাহাই ঘটুক না কেন, তিনি সমস্তই জগন্মাতারই হাত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন এক শুভকর্ম উপলক্ষে তিনি জনৈক শিষ্যকে একটি মাতৃ-প্রার্থনা শিখাইয়া দেন, যাহা তাঁহার নিজ জীবনে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিয়াছিল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে শিষ্যের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "আর দেখ, শুধু প্রার্থনা করা নয়, তাঁকে জোর করে ওটা পূরণ করাতে হবে। মার কাছে ওসব দীনহীনভাব চলবে না, দেখো" ![৫]

(৫) স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত, অনুবাদক স্বামী মাধবানন্দ, পৃঃ ১৬৪-৫

পাশ্চাত্য দার্শনিকচিন্তা-দ্বারা প্রভাবিত, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সদস্যশ্রেণীভুক্ত, পৌত্তলিকতার ঘোরবিরোধী যুবক নরেন্দ্রনাথ কিপ্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের প্রভাবাধীনে আসিয়া 'মা-কালীর গোলাম' বনিয়া গেলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সেই দিব্য রূপান্তরের কাহিনী শিষ্যা নিবেদিতাকে বলিয়াছেন : "ওঃ! মা কালী ও তাঁর লীলাসকলকে আমি কি ঘৃণাই করতুম! ছ' বছর ধরে আমি ঐ নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছি, কিছুতেই তাঁকে মানব না। কিন্তু শেষে আমাকে মানতেই হল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করে-ছিলেন, আর এখন আমি বিশ্বাস করি যে, অতি সামান্য সামান্য কাজেও সেই মা-ই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করছেন। কেন যে আমি এরকম করলাম, সেটা গুহ্য ব্যাপার, তা আমি জীবনে কাকেও বলব না। আমার তখন অতি দুঃসময় পড়েছে। মা সুবিধা পেলেন। তিনি আমাকে গোলাম করে ফেললেন। ঠাকুরের নিজ মুখের কথা, 'তুই মায়ের গোলাম হবি'। ঠাকুর আমাকে মার হাতে সমর্পণ করে দিলেন"।[৬]

"ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মা-কালীরই অবতার বলবে। আমারও মনে হয় একথা নিঃসন্দেহ যে, মা তাঁর নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে আবির্ভূ তা হয়েছিলেন"।

ভগিনী নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন, যখনই তাঁহাকে কালীমূর্তির ব্যাখ্যা করিতে বলা হইত তখনই তিনি বলিতেন : "মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ ; মানব উহা পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ; আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে সে দেখে যে, উহাতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, ইহাই চরম ব্যাখ্যা। মা-কালীই ভারতের ভাবী বংশধরগণের একমাত্র উপাস্য হইবেন। তাঁহার নাম লইয়া মাতৃভক্ত সন্তানগণ নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন। তথাপি সর্বশেষে তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সনাতন জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশ ঘটিবে। তখন প্রত্যেক মানব নিজ নিজ শুভমুহূর্তোদয়ে দেখিবে যে, তাহার সমগ্রজীবন স্বপ্নমাত্র ছিল"।[৭]

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় অবস্থানকালে ১৮৯৫ খ্রী° 'সহস্র দ্বীপোদ্যান'

---

(৬) পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথের দারিদ্র্যমোচনের জন্য ঠাকুর-কর্তৃক তাঁহাকে কালীঘরে যাইয়া প্রার্থনা করিতে বলা এবং নরেন্দ্রনাথের শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ ও সংসার-বিস্মৃতি। দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৪৭-৫৪

(৭) স্বামিজীকে যেমন দেখিয়াছি —ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১৭০-৭৪

নামক স্থানে (Thousand Island Park) পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ও শিষ্যাদের নিকট যেসকল অমূল্য ভাষণ দিয়াছিলেন (Inspired Talks) তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত জগজ্জননীর স্বরূপ ও মহিমা সম্বন্ধে বহু তথ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তন্ত্রের দক্ষিণাচার ও বামাচার-সাধনমার্গ সম্বন্ধে স্বামিজী বলেন: "শাক্তেরা জগতের সেই সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকে (The Universal Energy) মা বলিয়া পূজা করে থাকেন। কারণ 'মা' নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবান্‌কে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজাকরাকে হিন্দুরা 'দক্ষিণাচার' বা 'দক্ষিণমার্গ' বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়—এর-দ্বারা কখন ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণরূপের রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে 'বামাচার' বা 'বামমার্গ' বলে। সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা তার সাধনা করে, সেই জাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়"।

জগন্মাতার স্বরূপ-সম্বন্ধে স্বামিজী বলিতেছেন: 'জননীই শক্তির প্রথম-বিকাশ-স্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে—মা সব করতে পারে। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী। তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জান্‌তে পারি না। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায় সবই সেই জগদম্বা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি (Person), তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে, যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন এবং দেখেছিলেন। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি যখন ইচ্ছা যে-কোনরূপে আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম-রূপ দুই থাকৃতে পারে। তাঁকে এই সকল বিভিন্নভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত"।

"সেই জগদম্বার এককণা, একবিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এককণা বুদ্ধ, আর এককণা খৃষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে-এককণা প্রকাশ রয়েছে

তারই উপাসনাতে মহত্ত্বলাভ হয়। যদি পরমজ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর"।[৮]

জগজ্জননীর প্রকাশ সাধুতে-পাপীতে, আলোকে-অন্ধকারে, সুখে-দুঃখে সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ। এ' সম্বন্ধে স্বামিজী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন : "মাতঃ, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই তা' নয়, এ' প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরও যেমন হত্যাকারীর ভিতরও তেমনি রহিয়াছে। মা সকলের মধ্যদিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করেছেন। আলোক অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়েনা। আলোক নিত্য শুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই "সৌম্যা সৌম্যতরা" নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

তিনি দুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন ; আবার সুখের ভিতর, উদাত্ত ভাবের ভিতরও রয়েছেন"।

শক্তি-সাধকেরা ব্রহ্মশক্তি প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়াও ভয় পান না। তাঁহারা এই সর্বসংহারিণী মৃত্যুরূপা কালীকে "মা" বলিয়া ডাকেন, উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করেন যে, মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমৃতত্বে পৌছিতে হইবে ; মৃত্যুরূপিণী কালীকে পূজা করিয়াই মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার সাধনা করিতে হইবে। বিশ্বসত্তা বিরাট সৃষ্টি এবং বিরাট ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। বিশ্বশক্তি শুধু সর্বমঙ্গলা দুর্গা নহে, রুধিরাক্তকলেবরা ধ্বংসনৃত্যপরায়ণা করালী কালীও বটে। সমস্ত অশুভ, বিরোধ, দ্বন্দ্ব, ধ্বংস ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। সুতরাং মাতৃভক্ত বীরসাধক বিবেকানন্দ মৃত্যুরূপিণী কালীকে এই বলিয়া আবাহন করিয়াছেন :

"Come, Mother, Come !
For Terror is Thy name !
Death is in Thy breath,
And every shaking step

---

(৮) দেববাণী,—পৃঃ ৭৭—৭৯

(৯) দেববাণী,—পৃঃ ৩৯—৪০

Destroys a world for e'er,
Thou Time, the All-Destroyer!
Come, O Mother, Come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother Comes."

—*Kali the Mother*

"মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।"

—ঐ, ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত
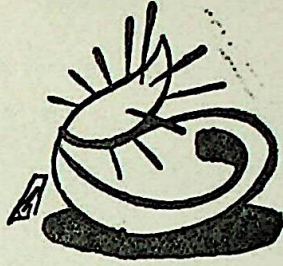
॥ পঞ্চবিংশ অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজ-সংস্কার ॥

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই নব-ভারত স্রষ্টাদের অন্যতম। নিম্ন ও পদদলিতদের জন্য তাঁহার গভীর-প্রীতি, সহানুভূতি ও জলন্ত স্বদেশপ্রেম তৎকালে দেশের যুব-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা লক্ষণীয় যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার দেশবাসীকে "ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয়ভাজন" বলিয়া মনে করেন নাই।

বিবেকানন্দ স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন গৌরবের শীর্ষ হইতে নিম্নতম অবস্থায় পতিত হইয়াছে। সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া বৈদান্তিক হিসাবে তিনি এই অধঃপতন আশীর্বাদ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি ইহার মধ্যে একটি ভবিষ্যৎ আশা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহা কেবলমাত্র দৃঢ় উদ্যমের মাধ্যমেই আসিবে। সুতরাং তিনি লিখিয়াছেন: "শক্তিমান বৃক্ষ সুন্দর সুপক্ক ফল উৎপাদন করে, সেই ফলটি ভূমিতে পতিত হয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পচিয়া যায়, সেই ধ্বংস হইতেই ভাবী বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সম্ভবতঃ তাহা প্রথম বৃক্ষটি অপেক্ষাও শক্তিমান হয়। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মাধ্যমে অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। এইরূপ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভারত জন্মলাভ করিবে"।

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে বিবেকানন্দ কোন্ বস্তুটি ভারতীয় সভ্যতার মধ্যমণি বলিয়া মনে করিতেন এবং ভারতের সমাজ ও সভ্যতার সংস্কার-সাধনে কি ভাবেই তাহার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

॥ উপায় ও নিরসন ॥

ব্যক্তিত্বের বিকাশের তারতম্যই হইল কোন সভ্যতার চরম-পরীক্ষা। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখি যে, হিন্দুর জীবনযাত্রার চরমলক্ষ্যই হইল ব্যক্তি-জীবনের

সর্বাত্মক মুক্তি। অধ্যাত্ম মুক্তি তখনই সার্থক ও সম্পূর্ণ যখনই ঐহিক ও সামাজিক স্বাধীনতাও সমভাবে অর্জন করা যায়। বৈদান্তিক হিসাবে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ইহা ব্যতীত আন্তর মুক্তিও কৃত্রিম।

বিবেকানন্দের মতে আমাদের চিন্তা ও কর্মের যে ঘটনাবলী তাহাই কর্মফল। এই নিয়মটি সঠিক বুঝিতে পারিলে ইহা যে ভাগ্যবাদীদের ওজরমাত্র নয়, পরন্তু কর্ম-প্রচেষ্টার অঙ্গস্বরূপ তাহা বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন : "বিশ্বে এমন কোন শক্তি নাই যাহা আমাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারে যদি না আমরা সর্বপ্রথম নিজেদের অনিষ্টসাধন করি.........দাঁড়াও, সাহস অবলম্বন কর এবং নিজ স্কন্ধে দোষ গ্রহণ করিতে শিক্ষা কর, অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না। যে-সমস্ত দোষ ত্রুটির জন্য তুমি দুঃখ ভোগ করিতেছ তাহার জন্য সর্বতোভাবে তুমিই দায়ী"।

দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বুদ্ধ যে-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ইহা তাহারই সমতুল। "আমরা আমাদের চিন্তার ফলস্বরূপ। আমাদের চিন্তাসমূহই ইহার ভিত্তি এবং ইহা আমাদের চিন্তারাশি হইতেই উদ্ভূত। মানুষের চিন্তা ও কর্ম যদি অসৎ হয় তাহা হইলে সেই দুঃখ তাহার অনুগামী হইবেই, যেমন গো-শকটের চক্রদ্বয় গোষ্পদেরই অনুগামী হয়"।

আমাদের নিকট তিনি এই আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে, প্রগাঢ় আন্তরিক শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করিতে পারে। ইহা ধ্যান এবং জগতের অনিত্যতা বিষয়ে গভীর মনসংযোগ-দ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে। এই প্রচেষ্টার মূলে প্রভূত শক্তি বর্তমান এবং বিবেকানন্দের ভাষায় এরূপ শক্তি-দ্বারা-ভূষিত ব্যক্তিই কেবলমাত্র জগতের অন্তর্নিহিত একত্বের অনুভূতি লাভ করিতে পারে। এজন্যই তিনি ভারতের যুবকগণকে সর্বপ্রকার দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠিয়া দেহ ও মনের শক্তি অর্জন করিতে বলিয়াছেন :

"আমাদের যুবকগণ অবশ্যই শক্তিমান হইবে, ধর্ম পরে আসিবে.....গীতা-পাঠ অপেক্ষা ফুটবলের মাধ্যমেই স্বর্গের সমীপবর্তী হইবে। তোমাদের বাহুর পেশী একটু দৃঢ় হইলেই গীতা ভাল বুঝিতে পারিবে।

॥ ভারতের পতনের কারণ ॥

বিবেকানন্দের মতে ভারতের পতনের কারণ সংকীর্ণতা—যাহা ধ্বংস ও দুর্বলতার আকারে সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :

"আমার মনে হয় ভারতের দুর্গতি ও অধঃপতনের প্রধান কারণ জাতিভেদ, যাহার মূলকারণ হইল জাতিতে জাতিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ...নিজে দুর্গত না হইলে অপরকে কেহ ঘৃণা করে না"।

"যখন জাতীয় চেতনা দুর্বল হইয়া পড়ে তখন সকল প্রকার রোগের জীবাণু জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তির সকল ক্ষেত্রেই প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে"।

॥ বৃথা চেষ্টা ॥

অতীতে কোন কোন মনীষী সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের সর্বৈব অনুকরণকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; অপর কেহ কেহ আবার সমভাবে অতীতের দিকে পশ্চাদপসরণে অভিলাষী হইয়াছিলেন—বিবেকানন্দ স্পষ্টতঃই এই উভয় প্রকার বাহ্যিক সমাধানের পরিপন্থী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: 'ভারতবর্ষে আমাদের এই পথে দুইটি প্রধান অন্তরায়, ইহা একটি উভয়-সঙ্কট অবস্থা। একটি হইল পুরাতন গোঁড়ামির প্রতি গভীর আসক্তি ও অপরটি হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ"।

এটি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন: "অনুকরণ সভ্যতা নহে, কাপুরুষের অনুকরণ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হয় না...। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিও না যে আহার-বিহার ও আচার-ব্যবহার পরাণুকরণ কখনও ভারতের পক্ষে মঙ্গলের হইবে...। অপরপক্ষে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এক প্রকার বাতিকগ্রস্ত—দর্শনশাস্ত্রের বাতিক এবং প্রভুই জানেন এই অদ্ভুত জাতির অদ্ভুত ঈশ্বর ও অদ্ভুত গ্রাম্য কুসংস্কার-সম্পর্কে আর কত প্রকার বাল-সুলভ ব্যাখ্যাই না আছে। প্রতিটি তুচ্ছ গ্রাম্য কুসংস্কার তাহাদের নিকট বেদের নির্দেশের ন্যায়"।

বহু কুসংস্কার, কাপুরুষতা ও ক্ষত আমাদের দেহে রহিয়াছে, সেগুলি ওঝা দ্বারা বিতাড়িত করিতে হইবে, অপসারিত করিতে হইবে এবং ধ্বংস করিতে হইবে। তাহাতে আমাদের ধর্ম, জাতীয় জীবন বা আধ্যাত্মিকতার কোন হানি হইবে না। প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি হইতে নিরাপদে এইসব কলুষতা যত সত্বর দূর করা হইবে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বসমূহ ততই উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিবে"।

॥ মূলভিত্তিতে বিশ্বাসী হও ॥

ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হইল ধর্ম, যাহা ব্যক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠত্বের কথাই শিক্ষা দেয়। বিবেকানন্দ এই অত্যাবশ্যকীয় ধর্মকেই সকল প্রকার সংস্কারমূলক

কার্যের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহার দেশবাসীকে সাগ্রহ আহ্বান জানাইয়াছিলেন। অপর সভ্যতাসমূহের মূলকেন্দ্র হইল অন্যরূপ। আমাদের নিজস্ব মূলভিত্তিকে উপেক্ষা করিলে বিপদ অনিবার্য। সার্বজনীনতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সভ্যতারই একটি স্থান আছে। সুতরাং একটি জাতি তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন অমূল্য সম্পদকে তখনই উপেক্ষা করিতে পারে যখন তাহার ধ্বংসের বিনিময়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি স্থায়ী সুফল লাভ হয়।

এ' সম্পর্কে তাঁহার সতর্কবাণী অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়: "যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকে জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও তবে তাহার ফল হইবে এই যে তোমরা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।·· ···আমি এরূপ বলিতেছি না যে, রাজনীতি বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, পরন্তু আমি ইহাই বলিতেছি যে, উহা এখানে গৌণ এবং ধর্মই মুখ্য।

"তোমরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই ধরিয়া থাকিবে। তারপর অপর হস্তটি প্রসারিত করিয়া অপর জাতির নিকট যাহা কিছু প্রাপ্ত হও গ্রহণ করিবে কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই জীবনে একটি আদর্শের অনুগামী হইবে"।

॥ বর্তমান অবস্থা ॥

আমাদের বর্তমান নিম্নাবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি কুহেলি আচ্ছন্ন ছিল না। তিনি ইহাকে কখনও অতিরঞ্জিত করেন নাই বা ঐতিহাসিক সত্যতার দিক হইতে ইহার মধ্যে কোনরূপ আত্মতুষ্টি লাভ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: "পৃথিবীতে কোন ধর্ম হিন্দুধর্মের ন্যায় মানবতার মহিমা এরূপ উচ্চভাবে ঘোষণা করে নাই, আবার পৃথিবীর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন ও দরিদ্রশ্রেণীকে এভাবে পদদলিত করে নাই"।

"তোমাদের ধর্ম জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথচ তোমরা নিম্নশ্রেণীর মানুষকে কিছুই দান করিতেছ না। তোমাদের ধর্মে অনন্ত উৎস প্রবাহিত অথচ তোমরা লোককে পয়ঃপ্রণালীর বারি দান করিতেছ"।

স্ত্রীজাতি ও জনসাধারণের আচরণের দিক দিয়া হিন্দুধর্মের যে বর্তমান দুর্গতি তাহা বাস্তবভাবে বিবেকানন্দ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়া তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন: "তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিগণ নিম্নশ্রেণীকে স্পর্শ করিবে না অথচ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাহাদের অর্থই শোষণ করিতেছে···চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায়

তাহাদের শ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক দেশেরই এই অবস্থা। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ এ' বিষয়ে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। ভারতবর্ষেও এই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বর্তমানে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যাধিক্য হইতে ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে। যতই চেষ্টা করুক আর উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্নশ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। নিম্নশ্রেণীর প্রাপ্য অধিকারদানের মধ্যেই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর মঙ্গল"।

তাঁহার মতে যাহারা জনসাধারণকে সুখ-সুবিধাদান হইতে বঞ্চিত করে তাহারা দুরাত্মা ও বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত কিছুই নয়।

যতদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্ষুধার্ত ও অজ্ঞ থাকিবে ততদিন প্রত্যেক মানুষকেই আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব, যাহারা তাহাদেরই অর্থে বিদ্যার্জন করিয়াছে অথচ তাহাদের জন্য কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে না। দীন-দরিদ্রকে শোষণ করিয়া তাহাদেরই অর্থে সগর্বে বিলাসিতা করিতেছে এবং এযাবৎ এই দুই কোটি নরনারীর জন্য যাহারা কিছুই করে নাই তাহারাও বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত কি হইতে পারে?"

"আমার মনে হয় এই জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষাই একটি জাতীয় পাপ এবং ভারতবর্ষের পতনের ইহাই অন্যতম কারণ। কোনপ্রকার রাজনীতিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না যতদিন না ভারতের জনগণের শিক্ষা ও খাওয়া-পরার পুনরায় সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে। তাহারা আমাদের শিক্ষাদান ও মন্দির নির্মানের জন্য অর্থ দান করিতেছে অথচ পরিবর্তে পাইতেছে পদাঘাত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমাদের দাসত্ব করিতেছে। যদি আমরা ভারতের পুনরভ্যুত্থান কামনা করি তবে তাহাদের জন্য কাজ করিতে হইবে"।

॥ সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি আবেদন ॥

ভারতে ভবিষ্যৎ সংস্কারের জন্য কেবলমাত্র একটি জিনিস প্রয়োজন। তাঁহাদের প্রতি তিনি ওজস্বিনী ভাষায় আবেদন জানাইয়াছেন: "তোমরা কি অনুভব কর যে ঈশ্বরের ও ঋষিদের লক্ষ লক্ষ বংশধরগণ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে? তুমি কি অনুভব কর যে লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও অনশনে কালযাপন করিতেছে এবং যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনশন করিয়া আসিতেছে? তুমি কি অনুভব কর সমগ্রদেশ অজ্ঞান অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন? ইহা কি তোমাকে বিনিদ্র ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে? হৃদয়স্পন্দনের সহিত একীভূত হইয়া ইহা কি তোমার

শোনিত ও শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত? এই চিন্তা কি তোমাকে উন্মাদপ্রায় করিয়াছে? এই একটি মাত্র চিন্তায় অভিভূত হইয়া তুমি কি তোমার নাম, যশ, স্ত্রী-পুত্র, সম্পদ্ এমন কি দেহবোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছ? দেশপ্রেমিকের ইহাই সর্বপ্রথম কর্তব্য"।

"ঈশ্বরলাভের জন্য তুমি কোথায় যাইবে; এই দীন, দরিদ্র ও দুর্বল ইহারা সকলেই কি ঈশ্বর নহে? প্রথমে তাহাদেরই পূজা কর না কেন? গঙ্গাতীরে কূপ খননের কি প্রয়োজন? যদি তুমি প্রকৃত সংস্কারক হইতে চাহ তবে তিনটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমে অনুভব কর, সত্যই কি তুমি আমাদের ভ্রাতৃগণের জন্য অনুভব কর? সত্যই কি তুমি অনুভব কর যে এই জগতে এত দুঃখ, এত অজ্ঞতা ও এত কুসংস্কার রহিয়াছে? সত্যই কি তুমি অনুভব কর যে এইসব ব্যক্তিগণ তোমার ভ্রাতা? তোমার সমগ্র সত্তায় কি এই ভাবধারা প্রবাহিত? ইহা কি তোমার শিরায়, শিরায় অণুরণিত? ইহা কি তোমার দেহের প্রতিটি তন্ত্রী ও স্নায়ুতে প্রবাহিত? সেই সহানুভূতির ভাব কি পূর্ণমাত্রায় তোমার মধ্যে রহিয়াছে? যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে এইটিই হইল প্রথম পদক্ষেপ। ইহার যদি কোনরূপ প্রতিকার করিতে পার তবেই অন্য চিন্তা। হইতে পারে সমুদয় প্রাচীন ভাবধারাই কুসংস্কারযুক্ত, কিন্তু এইসকল কুসংস্কারের আবর্জনার মধ্যে সদ্যগঠিত সোনার তাল এবং সত্য থাকিতে পারে। কোনরূপ উপায় আবিষ্কারে কি সক্ষম হইয়াছ যাহাতে এই স্বর্ণকে খাদ্‌বিহীন করা যায়? আরও একটি জিনিস প্রয়োজন। তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি নিশ্চিন্ত যে নাম, যশ ও কাঞ্চন লাভের তৃষ্ণার জন্য এইসব কার্যে লিপ্ত নও"?

॥ শিক্ষা এবং স্বাভাবিক উন্নতির মাধ্যমে সংস্কার ॥

যদিও বিবেকানন্দ এই মত পোষণ করিতেন যে শিক্ষিত, বিত্তবান ও সুবিধা-ভোগী ব্যক্তিরাই জনসাধারণের অধঃপতন ও উপেক্ষার জন্য দায়ী। তথাপি একটি বিষয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন। নিম্নশ্রেণীদের উন্নতির জন্য উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের যে সৌখীন প্রচেষ্টা তাহা তিনি অনুমোদন করেন নাই। এইসব বিবেকাহত ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সেবার সুযোগ দান করিতে তাহাদের অস্বীকার করিয়াছিলেন। সংস্কার অন্তর হইতে আসিবে; ইহা দেহ-মন হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতদিন যাহারা পরাধীন ছিল তাহাদের জন্য বিকাশ লাভ করিবে। তিনি বলিয়াছেন: "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি; আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি ঈশ্বরের স্থলে নিজেকে বসাইয়া সমাজকে নির্দেশদানের পক্ষপাতী নহি। যে-পথে

তোমরা চলিতেছ তাহা ঠিক নহে। আমার আদর্শ জাতীয়পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতির বিধান করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন তাহার নিজ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হইতে হয়, অন্য কোন উপায় থাকে না, জাতির পক্ষেও তদ্রূপ"।

"তোমাদিগকে অবশ্যই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূলসংস্কার নাম দিয়ে থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্ধ্বদেশে উঠিতে থাকুক···সুস্থ সামাজিক পরিবর্তনসমূহ অন্তরস্থ অধ্যাত্মশক্তিরই বিকাশ এবং যদি তাহা দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত হয়, তখন সমাজও তদনুযায়ী তাহাকে গঠন করিয়া লইবে। আধুনিক সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে যাইও না কারণ, প্রথমে অধ্যাত্ম-সংস্কার ব্যতীত অন্য কোন সংস্কার হইতেই পারে না"।

সমস্ত সমাজ-আন্দোলনকারীগণই অন্ততঃ তাহাদের নেতৃবৃন্দ সাম্যবাদ এবং সমবন্টননীতির একটি অধ্যাত্মভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সেই অধ্যাত্মভিত্তি একমাত্র বেদান্ত। কোন শক্তি, অথবা সরকার অথবা কোন আইনের কঠিন শৃঙ্খল জাতির এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ নয়—একমাত্র অধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুশীলনই এই মিথ্যা বর্ণবৈষম্য দুর করিবার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

"পুরাতন যুগে ফিরিয়া যাও, সেখানে এখনও শক্তি ও সজীবতা রহিয়াছে। অতীত উৎসের নির্মল বারি পান করিয়া পুনরায় শক্তিমান হইয়া উঠ এবং ইহাই ভারতীয় জীবনের একমাত্র পথ"।

পুনরায় যখন তিনি হিন্দুসমাজে নারীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন: "নারীগণের সমস্যা সমাধানের তুমি কে? নিরস্ত হও, তাহারা নিজেরাই তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবে। আমাদের কর্তব্য সমাজের নরনারীকে প্রকৃত শিক্ষা দান করা। সেই শিক্ষা লাভের ফলেই তাহারা তাহাদের ভালমন্দ বুঝিতে পারিবে এবং শেষোক্ত বিষয়টি পরিত্যাগ করিবে"। শিক্ষাদানবিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার যৎসামান্যই।*

বিবেকানন্দ আদর্শ-সংস্কাররীতি সম্পর্কে প্রায় অসহিষ্ণু ছিলেন। সুতরাং এক সময় তিনি বলিয়াছেন: 'আদর্শ-সংস্কার কোনদিনই বাস্তবে পরিণত হইবে না তাহাতে শক্তি ক্ষয় না করিয়া বরং একটি আইনপ্রণয়নসংস্থা গঠন কর অর্থাৎ আমাদের জনগণকে শিক্ষাদান করিলে তাহারাই তাহাদের নিজ সমস্যাগুলির

* বর্তমান লেখকের অভিমত।

সমাধান করিবে। যতক্ষণ না তাহা করা যাইতেছে ততক্ষণ আদর্শ সংস্কারগুলি আদর্শেই পর্যবসিত থাকিবে। নূতন নিয়ম হইতেছে জনগণই তাহাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিবে; এবং তাহা কার্যে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে অতীতে তাহা চিরদিনই রাজাদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিয়াছে"।

"স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া ভাল হওয়ার অপেক্ষা আমার মতে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ভুল পথে চালিত হওয়াও অধিকতর মঙ্গল"।

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম সোপান। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আত্মার সর্ববিধ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন, ফলে ধর্মের উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারা দেহকে সর্বপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ফলে সমাজ উন্নত হইতে পারে নাই।

॥ বিশেষ সামাজিক সমস্যা : জাতি ॥

বিবেকানন্দ যথার্থই বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় সমাজে অন্যান্য সমস্যাগুলি অপেক্ষা জাতিপ্রথা একটি প্রধান সমস্যা। ব্রাহ্মণগণের আদর্শ সম্পর্কে তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা ছিল। পরোক্ষভাবে তিনি এই শিক্ষিত, শৃঙ্খলাবিহীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন: "তোমরা কি শোন নাই যে শাস্ত্রে লিখিত আছে ব্রাহ্মণেরা আইনের বাধ্য নহেন, তাঁহারা রাজারও শাসনাধীন নহেন, এবং তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করিতে পারিবে না? স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেভাবে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছে সেভাবে ইহা বুঝিও না, প্রকৃত মৌলিক বেদান্তের ভাবে ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায় যাঁহারা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ ও উহাদের বিস্তারেই নিযুক্ত,— যে দেশ কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা, সৎস্বভাব, ধর্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা অধ্যুষিত সে-জাতি ও দেশ যে সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধের অতীত হইবে এ আর আশ্চর্য কথা কি? এবম্বিধ জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্য-সামন্ত, পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন। তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি, মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গস্বরূপ। আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল ততই তাঁহারা বিভিন্ন

জাতিতে বিভক্ত হইলেন। আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্য যুগের অভ্যুদয় হইবে তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণ হইবে এমন কোন কারণ নাই, যদিও এরূপ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথাপি না-ও হইতে পারে। ব্রাহ্মণজাতি ও ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন হওয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক"।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জাতি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ইহার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, যদিও ধর্মীয় আচার-বিধিসমূহ জাতিবিভাগের মাধ্যমে সুবিধাবাদী শ্রেণীদের সেবার নিমিত্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে। এ' সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অভিমত এই যে: "জাতি ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতেই উদ্ভূত এবং ইহা বংশানুক্রমিক একটি ব্যবসায়-বৃত্তি" (পৃঃ ৭৫)। সুতরাং তিনি আরও বলিয়াছেন: "বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই জাতিকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাবিয়া ভুল করিয়াছিলেন এবং ধর্ম ও জাতিকে একত্রে জড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহারা অকৃতকার্য হইয়াছিলেন"।

বিবেকানন্দের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। তাঁহার ভাষায় এইরূপ কথিত হইয়াছে: "ভারতে সকলকে ব্রাহ্মণ করাই আমার পরিকল্পনা, কারণ, ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ" (পৃঃ ৭৬)। "এতদিন ব্রাহ্মণগণই ধর্মকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সময়ের প্রতিকূলে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যাও, ব্যবস্থা অবলম্বন কর যাহাতে এদেশে সকলেই সেই ধর্ম গ্রহণ করে"।

"সকলকেই এমন কি নিম্নতর চণ্ডালকে পর্যন্ত সেই মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তাহাদিগকে সহজ ভাষায়, জীবনধারণের উপকারিতা, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দান কর"।

"আমরা তাহাই চাই, ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা নয়, সকলের জন্য সমান সুযোগ, প্রত্যেককেই এরূপ শিক্ষা দান কর যে তোমার মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই তাহার নিজ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হউক"।

"সংস্কৃতির স্বীকরণই জাতির সমতা-সাধনের একমাত্র উপায়, শিক্ষাই উচ্চ শ্রেণীর একমাত্র শক্তি"।

গান্ধীজি প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাঁহার অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে স্বামিজীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের বাস্তব সুপারিশসমূহ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজিও সকল জাতিকেই সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াসী

ছিলেন, যে শূদ্রগণ কায়িক পরিশ্রমে মানবজাতির সেবা করে তাহাদের উপর তিনি দেবত্বারোপ করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে কায়িক পরিশ্রমে সমভাবে সকল জাতিই অংশ গ্রহণ করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইবে। উন্নত ধরণের শ্রমই হইবে তাহাদের মূল্য। কিন্তু প্রত্যেকেই পায়ের ঘাম মাথায় ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করিবে। ইহা লক্ষণীয় যে নব-ভারতের এই দুই মহান্ সংগঠকের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য ছিল যৎসামান্যই। আর একটি বিষয়ে তাঁহারা উভয়েই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রথমে ছিলেন সার্বজনীন, তারপর ভারতীয়। নিম্নে উদ্ধৃত বিবেকানন্দের মনোভাবও তাঁহার পরবর্তী সমসাময়িক কর্তৃক একান্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল।

॥ সভ্যতার সংঘর্ষ ॥

বিবেকানন্দের ভালমন্দ পরিমাপের একটি মাত্র মান ছিল। তিনি বলিয়াছেন: "বিস্তৃতিই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। প্রেমই বিস্তৃতির লক্ষণ ও সর্বপ্রকার স্বার্থপরতাই মৃত্যু। অতএব প্রেমই বাঁচিয়া থাকিবার রীতি"।

"যদি জগতে কোন পাপ থাকে, তবে তাহা দুর্বলতা; সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর, যেহেতু দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু"।

ভারতের মৃত্তিকাতেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া তিনি অপর সকল দেশের সভ্যতাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু বিস্তার করিয়াছিলেন।

"আমার স্বদেশপ্রেম, ভারতের প্রতি ভালবাসা ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত আমি মনে করি না যে অপর জাতির নিকট অনেক কিছু শিক্ষা করিতে হইবে। মনে রাখিও, আমরা অপরের পদতলে বসিতেও প্রস্তুত, যেহেতু প্রত্যেকের কাছেই মহৎ শিক্ষণীয় কিছু আছে। আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে অপর দেশে সমাজশক্তি কিভাবে কাজ করিতেছে এবং যদি আমরা পুনরায় একটি জাতিতে পরিণত হইতে চাই তবে অপর জাতির মানসিক বিকাশ কিভাবে হইতেছে তাহার সহিত স্বাধীন ও মুক্তভাবে আদান-প্রদান রাখিতে হইবে। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, যাহা কিছু পার স্বীকরণ করিয়া লও, প্রত্যেক জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ কর এবং যাহা কিছু প্রয়োজনীয় গ্রহণ কর"।

ভারতবর্ষে সভ্যতার সঙ্কট সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: "আজ প্রাচীন গ্রীসবাসী ভারতীয় মৃত্তিকাতে প্রাচীন হিন্দুজাতির সহিত মিলিত হইতেছে। এইরূপে নীরবে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন সুরু হইয়া গিয়াছে,

আমরা চতুর্দিকে দেখিতেছি, বিস্তৃতি, আত্মত্যাগ, নবজাগরণ, আন্দোলন, এই ত্রিশক্তির একত্র সম্মেলনে কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে"।

মাত্র কাগজে কলমে সংস্কারের বাঁধাধরা পদ্ধতিতে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার মতে শিক্ষাদাতা ও সংস্কারকগণের একটিমাত্র কাজ করার আছে; তাহা হইল ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে সাহায্য করা। তারপর জাতি অথবা ব্যক্তিকে তাহাদের স্বীয় পরিপূর্ণতার পথ খুঁজিয়া লইতে ছাড়িয়া দাও।

"আমি প্রত্যেকটি সংস্কারেই সহানুভূতিশীল কিন্তু কয়টি বিধবাবিবাহ হইল তাহার উপর কোন জাতির ভাগ্য নির্ভর করে না, পরন্তু জনসাধারণের উন্নতির উপরই নির্ভর করে। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা নষ্ট না করিয়া তুমি কি তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্বের উদ্ধারসাধন করিতে পার? তুমি কি সমতা, মুক্তি ও কর্মশক্তির দিক দিয়া সমভাবে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়াও যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সহজাত প্রকৃতির দিক দিয়া হিন্দু হইতে পার? এইরূপই করিতে হইবে এবং আমরা তাহাই করিব"।

যেহেতু বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের কেন্দ্র ছিল জনগণের মুক্তি, সেইজন্যই তিনি একজন জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ কর্ণধার ছিলেন। এইজন্যই তাঁহার নিকট প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভেদ ছিল না, আগামী ভবিষ্যতে মানবজাতির মুক্তি-মঞ্চে উভয়কেই নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিতে হইবে। সুতরাং তিনি তাঁহার দেশবাসীকে এই বলিয়া উৎসাহ দান করিয়াছিলেন: "মানবজাতির বিকাশের জন্য প্রতীচ্যের আদর্শও যেমন প্রয়োজন, প্রাচ্যেরও সেইরূপ প্রয়োজন, এবং আমার মনে হয় ইহা অধিকতর প্রয়োজন"।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের কাছে ইহাই তাঁহার বাণী এবং আশা। কিন্তু সুদীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের এই দাসত্বশৃঙ্খলমোচন তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।*

---

* এই প্রবন্ধের সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি "*India and Her Problems*" By Swami Vivekananda পুস্তক হইতে গৃহীত।
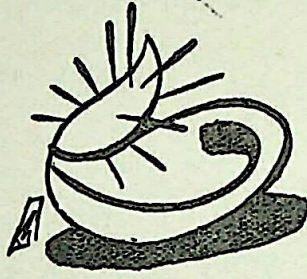
॥ ষড়বিংশ অবদান ॥

॥ সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের বিপ্লব-চিন্তা ॥

স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিপ্লববাদী ছিলেন—এ'কথাটি কিছুকাল হল আমাদের দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'বিপ্লবী' বিশেষণে যাঁরা বিবেকানন্দকে অভিহিত করেছেন তাঁরা অধিকাংশই রাজনীতিসংক্রান্ত বিশেষ চিন্তাধারার বাহক, এবং তাঁরা অনেকেই তাঁর 'সন্ন্যাসব্রত', 'আধ্যাত্মিকতা' প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বিপ্লব-বাদের কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পান না। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ' মতের একজন প্রধান প্রচারক। এই বিশিষ্ট সমাজদার্শনিক তাঁর "Swami Vivekananda—The Patriot Prophet"-শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একজন 'সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী' ('social-revolutionist') বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দের ধর্মনিষ্ঠা তাঁর মধ্যে 'মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের' অবস্থান মাত্র নির্দেশ করছে।

কিন্তু এ' বিচার সত্য বিচার নয়। অনুসন্ধিৎসুমাত্রই দেখতে পান যে, বিবেকানন্দের জীবনের মূলকেন্দ্রে ধর্মের স্থান, তাঁর সমাজদর্শন ও ধর্মদর্শনের মধ্যে প্রকৃত বৈপরীত্য নেই, তাঁর ধর্মদর্শনই তাঁর বিপ্লববাদের উৎস। এ'ক্ষেত্রে বিচার্য ডঃ দত্ত প্রমুখ সমাজশাস্ত্রবিদ্‌দের এ' ধরনের ভ্রান্তিমূলক ধারণার কারণ কি? এ' বিচারে প্রবৃত্ত হতে হ'লে আমাদের প্রথম সত্য বিচারের পদ্ধতি-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রকৃত মাপকাঠি কি?

জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির' বর্তমানে বিশেষ প্রাধান্য। ইতিহাস, দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সর্বত্রই 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনার ছড়াছড়ি। কিন্তু এই 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'-টি কি? বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোকে যে আলোচনা করা হয় আমরা তাকেই সাধারণত 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনা বলে অভিহিত করে থাকি। কিন্তু

এ' মত ঠিক নয়। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এ' বিষয়ে যে অভিমত দিয়েছেন তা' আমাদের সঠিক ধারণা-গঠনে প্রভূত সহায়তা করবে। তিনি বলছেন: "বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকল প্রয়োগ করলেই যে সত্য আবিষ্কার করা যায়, তা' নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করলে আমরা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তসকল পেয়ে থাকি। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান করতে হলে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে প্রথমে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিকে যুক্তিসিদ্ধ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন''।[১] এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধে আর একজন মনীষী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'ইতিহাসের মুক্তি' শীর্ষক গ্রন্থে যে কথা বলছেন তাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ তা হল সত্যনিষ্ঠা, এবং বিনা-প্রমাণে বা অপ্রমাণে কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করা, এবং প্রমাণ-বিরুদ্ধ হলে চিরপোষিত মত ও চিন্তাধারা পরিত্যাগে দ্বিধাহীনতা'' অর্থাৎ যা সত্যনিষ্ঠ ও প্রামাণিক তাই যুক্তিসিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক। কিন্তু এরূপ স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি ক'জনের আছে? আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের পূর্বপোষিত ধারণা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে পারি এবং এমনভাবে সেগুলির অবস্থান ঘটাতে পারি যাতে আমাদের এইসকল ধারণাই অপরিহার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এ' কারণেই অনেকের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের ধর্মমতকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলে মনে হয়েছে। তাঁরা যেকোনও ধর্মমতকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলে বরাবর বিশ্বাস করেন, এবং সেজন্য বিবেকানন্দের বিপ্লববাদের স্বরূপ নির্ণয় তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। এই বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা যে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে এ' সত্য তাঁদের নিকট প্রতিভাত হয় নি এবং এজন্য তাঁরা বিবেকানন্দকে ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করতেও পারেন নি। তাঁদের কাছে বিবেকানন্দ হচ্ছেন একটি "complex character" যাঁর মধ্যে পরস্পরবিরোধী আদর্শসকল স্থান পেয়েছে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও সমাজবিপ্লববাদ একত্রে সন্নিবেশিত দেখা যায়[২]। কিন্তু, আমরা দেখব যে সত্য হল এই যে, বিবেকানন্দের মধ্যে কোনও জটিলতা নেই, কোনও বৈপরীত্য নেই, তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও সমাজবিপ্লববাদ একই সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত—বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকতার ফলিত দিকই সমাজবিপ্লব।

কিন্তু 'সত্যনিষ্ঠা'-র আবার অপব্যাখ্যা সম্ভব। বর্তমানে আমাদের দেশে 'বস্তুনিষ্ঠা' বলে একটি কথাও অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যনিষ্ঠাই প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠা

---

(১) Brojendra Nath Seal—The Meanings of Race, Tripe & Nation

(২) ডঃ দত্তের পূর্ববর্ণিত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠা বলতে আজকালে আমাদের দেশে যা প্রচলিত তা' একটি প্রচণ্ড মানসিক বিভ্রান্তির ফল এবং এ' বস্তুনিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠা হতে বহুদূরে। এই বস্তুনিষ্ঠাবাদীরা বিবেকানন্দকে বিচার করতে বসে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন এবং এই 'বস্তুনিষ্ঠা'-র মোহ হতে মুক্ত দৃষ্টি প্রয়োগ না করলে আমরা বিবেকানন্দের বিপ্লববাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করে উঠতে পারি না।

লোকান্তরিত মনীষী বিনয়কুমার সরকার এই বস্তুনিষ্ঠাবাদের একজন প্রধান প্রচারক, যদিও আজ তা' অন্যান্য বিচারহীনদের হাতে পড়ে সত্যনিষ্ঠা হতে দূরে চলে যাচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে অধ্যাপক সরকারের বস্তুনিষ্ঠাবাদের মূল কথা হল এই যে, জগৎ-সংসার ভালমন্দের সংমিশ্রণে গঠিত এবং সেজন্য কখন তা' সম্পূর্ণ দোষমুক্ত ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। সত্যযুগের কল্পনা সম্পূর্ণ ভূয়ো। এ' জগৎ কখনও পূর্ণতা (perfection) প্রাপ্ত হবে না। যাঁরা কল্পনা করেছেন যে, বর্তমান ক্রটি ও অপূর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে এক আদর্শসমাজে আমরা কালে পৌছব তাঁরা সকলেই ভ্রান্ত ও ভাববিলাসী উন্মাদ। এজন্য হেগেল, মার্ক্স, বিবেকানন্দ সকলেই পূর্ণতাবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ নন। প্রথম কথা, ডঃ সরকারের বস্তুনিষ্ঠাবাদের জন্ম বিবেকানন্দ হতে, যদিও তাঁর জন্মসূত্র সম্বন্ধে ডঃ সরকার জ্ঞাত নন। বিবেকানন্দের পরিভাষা ভাব সবই ডঃ সরকার ধ্বনিত করেছেন, স্বয়ং নূতন কিছুই বলেন নি। বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করে বিষয়টি প্রমাণ করছি। বিবেকানন্দ তাঁর 'পত্রাবলী'-র একস্থানে বলছেন: "বাস্তব জগৎ সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে; আর প্রত্যেকটি ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে। তার কারণ ভাল-মন্দ দুটি পৃথক বস্তু নয়, আসলে এক। পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোনও ভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত"।......"একটি ভুল আমরা প্রতিনিয়তই করে থাকি তা এই যে ভাল জিনিসটাকে আমরা ক্রমবর্ধমান বলে মনে করে থাকি, কিন্তু মন্দ জিনিসটার পরিমাণ আমরা নির্দিষ্ট বলে ভাবি। তা' থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু মন্দ ক্ষয় হয়ে এমন সময় আসবে, যখন কেবল ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই অপসিদ্ধান্ত একটি মিথ্যাযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত"।......"জগতে উন্নতি বলতে যেমন বেশী সুখভোগ বুঝায়, তেমনি বেশী দুঃখভোগ বুঝায়"। এই কথাগুলিরই হুবহু প্রতিধ্বনিই ডঃ সরকার করেছেন। কিন্তু এ' সম্পর্কে স্বামিজী আরও যা বলেছেন তাও বিশেষ প্রতিধানযোগ্য: "এই যে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ এইই মায়া বা প্রকৃতি"। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠাবাদ প্রকারান্তরে মায়াবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু, মায়াবাদকে আমরা

"*Illusion*"-বাদ বা অলীকতাবাদ ছাড়া আর কিছু ভাবতে শিখিনি। তাই যে মুহূর্তে 'মায়াবাদ' শুনি তখনই আমরা মায়াবাদীকে অ-বস্তুনিষ্ঠ বলে অধঃপাতে দিই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'মায়াবাদ' বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যক্ষবাদ—"statement of facts"। অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর মায়াবাদই অধ্যাপক সরকার ও তাঁর অনুগামীদের হাতে বস্তুনিষ্ঠাবাদে পরিণত হয়েছে। অথচ কি ভ্রান্তি যে, এঁরাই বিবেকানন্দকে পূর্ণতাবাদী বলে অভিহিত করেন! কোনও মায়াবাদী অদ্বৈতবেদান্তী পূর্ণতাবাদী নন। হেগেল ও মার্ক্স পূর্ণতাবাদী। হেগেলের মতে 'Absolute Idea' বিবর্তনের পথে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু মায়াবাদী অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন যা বিবর্তিত হয় তা' অপূর্ণ, তা' কখনও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হতে পারে না। কারণ 'নেতি' হতে কখনও কোনও 'ইতি' বা 'অস্তি' উৎপাদিত হতে পারে না। যা অপূর্ণ তা' চিরকালই অপূর্ণ, যা পূর্ণ তা' চিরদিনই পূর্ণতা-ধর্মবিশিষ্ট।

এই বস্তুনিষ্ঠাবাদীরা বিবেকানন্দের ভারত ইতিহাস-ব্যাখ্যার প্রতিও কটাক্ষপাত করে থাকেন। তাঁদের কথা ভারতের মানুষ কোনও যুগে অন্যদেশের মানুষদের অপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিক বা কম সংসারনিষ্ঠ নয়। অথচ বিবেকানন্দের মতে পুণ্যভূমি ভারত আধ্যাত্মিকতার দেশ। কিন্তু সাধারণ মানবপ্রকৃতি ভারতে যে অন্য-প্রকার এমন কথা বিবেকানন্দ কোথাও বলেন নি। তার প্রমাণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম-প্রচারিত ব্যাপক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ তিনি কোনও দিন সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ এটি। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুক্তিচর্চার জন্য সমাজের সর্বসাধারণ ইহলোকের সুখ ও ঐহিক উন্নতি হতে বঞ্চিত হোক, এ'রকম ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিবেকানন্দের কণ্ঠেই আমরা নিঃসৃত হতে শুনি: "The present Hindu Society is organised only for spiritual men and hopelessly crushes out everything else. Why? Where they shall go who want to enjoy the world a little with its frivolties?" তা' হলে কি তিনি পরস্পরবিরোধী উক্তি করেছেন? তা' নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চা এবং গণ-মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁকে এই অভিজ্ঞানই দিয়েছিল যে, ভারতের জাতীয় জীবনে মূলশক্তিরূপে ক্রিয়া করে আসছে আধ্যাত্মিকতা। ভারতের ইতিহাসে প্রতি সঙ্কট-মুহূর্তে, প্রতি বিপ্লবের শীর্ষ-দেশে দেখা যায় একজন বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের আবির্ভাব। তাঁদের জীবনেই মানবজীবনের নবমূল্যায়ন ঘটে এবং তাঁদেরই প্রয়াসে সমাজে সৃজনীশক্তির রুদ্ধ উৎসমুখের উন্মোচন ঘটে। ফলে সমাজ নব বলে বলীয়ান হয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। এ তো অস্বীকার করবার উপায় নেই?

অতএব এ' সকল বস্তুনিষ্ঠাবাদী সত্যনিষ্ঠ হতে পারেন নি। বস্তুনিষ্ঠ হতে গিয়ে এঁদের স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে এবং তাঁরা বাস্তবতাচ্যুত ও সত্যচ্যুত হয়েছেন। সেইজন্য উপনিষদের ভিত্তিচ্যুত করে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম্ গ্রহণ করেন। এবং বিবেকানন্দের ধর্মচ্যুতি ঘটিয়ে তাঁকে বিপ্লববাদীরূপে গ্রহণ করেন। এ' কথা তাঁরা বিচার করে দেখেন না যে, উপনিষৎ বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম্-এর কোন অস্তিত্ব থাকে না, আর ধর্ম বাদ দিলে বিবেকানন্দের বিপ্লববাদের উৎস নিঃশেষিত হয়।

অতএব, সত্যাসত্য-বিচারের জন্য আমাদের প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ বিচারহীন বস্তুনিষ্ঠা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু নিছক ভাবালুতাও পরিহার করতে হবে, স্তুতি নয়, যুক্তিসিদ্ধ তথ্য দ্বারা প্রমাণ করতে হবে আমাদের অনুসন্ধানকে। তবেই তা হবে প্রামাণিক বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক।

আমাদের অলোচনার মুখবন্ধ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবেকানন্দের বিপ্লববাদ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ও বিচারহীন বস্তুনিষ্ঠাবশতঃ একদল প্রভাবশীল ব্যক্তি জনমনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন তা' নিরসনের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। এবারে আমাদের পূর্ব আলোচনায় নির্ণীত সত্যবিচারের যুক্তিসহ মাপকাঠি সহযোগে বিবেকানন্দের বিপ্লব-দর্শনের বিশ্লেষণের প্রয়াস করছি।

বিবেকানন্দের সমগ্র দর্শন সত্যই একটি বিপ্লব-দর্শন। কারণ এর লক্ষ্য মানব-সমাজের "আমূল-রূপান্তর সাধন"। নানা জায়গায় এ' ধরনের বহু উক্তি তিনি করেছেন, যথা: "I want to revolutionise the whole world", "Nothing short of conquering the whole world is my watchword", "I want a root and branch reform"। এ' কাজের জন্য তিনি বিদ্রোহীদেরই আহ্বান জানিয়েছেন: "I want men-rebels and women-rebels"। শুধু যে পৃথিবীর রূপান্তরসাধনকার্যে বিপ্লবীদের আহ্বান জানিয়ে তিনি কার্য সমাপ্ত করেছেন তা' নয়, তিনি এমন একটি বৈপ্লবিক কর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখান হতে এই বিপ্লবের মন্ত্র বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়বে। তাও শুধু নয়, এমন একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী তাঁর ছিল যা বাস্তবধর্মীতার দিক থেকে রাশিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠনসূচীর সমগোত্র।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে এ' বিপ্লবে কোনও রাজনৈতিক বিপ্লব নয়। রাজনীতিতে তিনি কোনদিনই বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল: "আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকীর সঙ্গে কোনও সংশ্রব

রাখতে চাই না। আমি কোনও প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি আর সব বাজে" (পত্রাবলী পৃঃ ১৫৪)। এই মত অত্যন্ত সুদৃঢ় সংশয়লেশশূন্য—অতএব, কেউ এজন্য তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করুন বা তাঁকে গ্রহণ না করুন এসে যায় না, একথা প্রমাণিত যে তিনি রাজনৈতিক অর্থে আমূল রূপান্তরের কথা বলেন নি।

কি অর্থে বলেছেন তা' সম্যক জানতে হলে তাঁর দর্শনমতের একটু আলোচনা প্রয়োজন। তাঁর মতেঃ "স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল হতে বহির্জগতে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি। আর সেই চেষ্টার ফলে আমাদের মন থেকে এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি বের হয়ে আসছে, যথা—পুরুষ, নারী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জগৎ, ভালবাসা, ঘৃণা, ধন-সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি"।

"আসল কথা, এই ব্রহ্ম আমাদের ভেতরই রয়েছেন এবং তিনি সেই শাশ্বত দ্রষ্টা। সেই যথার্থ 'অহম্' যিনি কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন এবং যাঁকে অন্যান্য জিনিসের মতো ইন্দ্রিয়গোচর করার চেষ্টা করাও ধীশক্তির অপব্যবহার মাত্র"।

"যখন জীবাত্মা এ'কথা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎকল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশঃই বেশী করে অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ, এতে যেমন শরীর-বিবর্তন আসতে থাকে, তেমনি অপরদিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। 'মনুষ্য' কথাটি সংস্কৃত 'মন' ধাতু থেকে সিদ্ধ। সুতরাং ওর অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-গ্রহণশীল প্রাণী নয়। ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশবাদই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহপ্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক সমাজে জীবন বলতে বুঝায় ইচ্ছা, তৃষ্ণা বা বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, সে সব একটি ব্যাপারের বিভিন্ন ধারা ও স্তর মাত্র। সেটি এই ইচ্ছার বা কল্পিত 'আমি'-র বিসর্জন। এই যে নিজের ভিতর থেকে বাইরে লাফিয়ে যাবার ভাব রয়েছে, জ্ঞাতাকে (subject) জ্ঞেয়রূপে পরিণত করবার একটা চেষ্টা রয়েছে সেটির বিসর্জন"।

সমাজের মূলপ্রকৃতি ও উদ্দেশ্য স্বামিজী এখানে অকাট্য যুক্তি সহযোগে উদ্ঘাটিত করেছেন। মানুষের হাতে সমাজে যে নিত্য নব নব রূপায়ণ ঘটছে তা হ'ল

তার স্বরূপজ্ঞানের সহায়তা-লাভের জন্য। মানবজীবনের সত্যের সঙ্গে সমাজ-ধর্মের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে যে দেবসত্তা তার বিকাশসাধনই সমাজ-জীবনের মূল উদ্দেশ্য। সেইজন্য সমাজ অন্ধশক্তির ক্রীড়নকমাত্র নয়। সব সমাজ, সব রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য—মানুষের সব স্বার্থকে এই দেবত্বশক্তি বিকাশসাধনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করা। যখন সমাজ-জীবন তার এই মুলধর্মপ্রতিষ্ঠ থাকে তখন স্বতঃসিদ্ধভাবে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। সেইজন্য দেখা যায় মানুষ অনন্তকাল ধরে সমাজ-জীবনে সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করে চলেছে। ভারতের ইতিহাসে দেখি যুগে যুগে এ প্রয়াস ভাগবতধর্মীরা করেছে, ভগবান বুদ্ধ করেছেন, শ্রীচৈতন্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যাঁরা এই সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন তাঁরাই আমাদের মহামানব"।[৩] মাঝে মাঝে অবশ্য সমাজ মূললক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, তখনই অসাম্যের প্লাবনে সমাজ ধ্বংসোন্মুখ হয়, অত্যাচার-অবিচারের শৃঙ্খলে সমাজের সর্ব-সাধারণের মধ্যে সৃজনীশক্তি রুদ্ধ হয়ে অবনতি আনে। সেইজন্য বিবেকানন্দের মতে "civilisation is the manifestation of divinity in man",—সভ্যতা হল দেবত্বের বিকাশ। অতএব, আধ্যাত্মিকতাই সমাজ-কল্যাণের প্রকৃত পথ, তার মধ্যেই তার লক্ষ্য-সিদ্ধি, উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা।

বর্তমানযুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে আমাদের অধিকারে এসেছে অচিন্ত্যনীয় পরিমান ভোগসম্ভার। অতএব আমরা এক বিষম ইন্দ্রিয়ানুগতার কবলিত হয়ে পড়েছি। অবিরাম পান, ভোজন, বিলাসভোগ—এ' ছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষ্য আছে বলে আমরা ভাবতে পারছি না। আমাদের মূল্যবোধে এখন এই একটি জিনিসই স্থান পেয়েছে তার নাম হচ্ছে ভোগ। তার ফলে আজ সমাজ-জীবনের সর্বত্র এক নিদারুণ অসাম্য প্রকট। এই সুবিপুল ভোগোপকরণ-সৃষ্টির কার্যে আজ যাদের প্রাধান্য সেই ধনিক বা বৈশ্য শ্রেণী আজ সমাজ-জীবনের কর্ণধার। আমাদের রুচি-পছন্দ, শিল্পকলাবোধও এদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়িয়েছে[৪]। মানুষ তার মননশীলতা সৃজনশীলতা সব হারিয়ে একটি পুতুলে পরিণত হতে চলেছে এবং তারই ফলে নানা রকমের বিশেষ সুবিধা ও ধনবৈষম্য আজ অভ্রভেদী হয়ে সমাজ-জীবনকে অবরুদ্ধ করছে। ধনবৈষম্য, ক্ষমতাবৈষম্য,

---

(৩) রবীন্দ্রনাথ—ইতিহাস

(৪) কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এ' প্রসঙ্গে তথ্যপূর্ণ একটি আলোচনা করেছিলেন আলডুস্ হাক্সলী ভারতীয় দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়।

বিত্ত-বৈষম্য ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়া নানাবিধ বিশেষ সুবিধার চাপে নিদারুণ নিপীড়িত সাধারণ ব্যক্তিরা—যারা শ্রমজীবি। এই হল বর্তমান যুগের মূলে অধিষ্ঠিত সমস্যা।

বিবেকানন্দ এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন—সমস্যার মূল উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। সর্বসাধারণ অর্থাৎ শ্রমজীবির সামাজিক প্রাধান্য অর্জন ও সর্বপ্রকার বিশেষসুবিধার অবসানকল্পে তাঁর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল :"তোমরা উচ্চ বর্ণেরা তোমরা ভূতকাল, তোমরা শূন্যে বিলীন হও। বেরুক নূতন ভারত ভূনাওয়ালা, ভুট্টাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে"। এ' কার্যে সম্ভব হ'বে কি করে ? বিবেকানন্দ বলছেন, অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বের ওপর সমাজ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা। অদ্বৈতবেদান্ত মতে—"all power is in everyone, all knowledge is in every man", —সব মানুষের মধ্যে একই দেবত্বশক্তি সুপ্ত আছে। তাহলে বিশেষ সুবিধার কোনও দাবী দাঁড়ায় না। তাহলে কি করণীয় আমাদের ? আমাদের শিক্ষার দ্বারা সকলের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করতে হবে। শূদ্রসমাজকে ব্রাহ্মণসমাজে পরিণত করতে হবে। এককথায় দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ মানবদের শ্রেণীবিহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠাই ছিল বিবেকানন্দের পরিকল্পনা। এই অর্থেই তিনি সমাজের আমূল রূপান্তর সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। সমগ্র মানবশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে ছিল তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি, আর পৃথিবীর বহু দেশের গণমানসের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাই ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তা তিনি সুস্পষ্ট দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সুস্পষ্ট ভাষায়[৫] যে আসন্ন শূদ্রবিপ্লব ঘটবে রাশিয়ায় কিম্বা চীনে। কিন্তু যে ভাবে ঘটবে তার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। তিনি তাই আমাদের সাবধান করে বলেছেন: "Before flooding India with socialistic or political ideas deluge the country with religious ideas"। তাঁর ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য করে তাঁর দেহরক্ষার পনর বৎসর পরে রাশিয়ার বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং তার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে চীনেও তা সফল হয়। কিন্তু এ' বিপ্লবে ধর্মের স্থান নেই, মানুষের মধ্যে দেবত্বের কোনও স্বীকৃতি নেই বা তা বিকাশের কোনও আয়োজন নেই। তার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হয়েছে তা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। অতীতের ঐতিহ্যময় চীনের আত্মার কি মৃত্যু ঘটেছে ? যে ভগবান তথাগতের দেশের উদ্দেশ্যে

---

(৫) Sister Christine-এর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য

একদিন শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রণতি জানাতে চীন হতে বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে কঠিন আয়াসে উত্তুঙ্গ হিমগিরি অতিক্রম করে এসেছিলেন শান্তি-মৈত্রীর বাণীদূত ফাহিয়ান ও হিউয়েন-সাঙ্, সেই চীন আজ দেবতাত্মা হিমালয়ের ধ্যান-সমাহিত অঙ্গে করেছে অস্ত্রাঘাত, ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে দেখা দিয়েছে পররাজ্যলোভী লুণ্ঠকের বেশে! স্বামী বিবেকানন্দ এও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাই বলেছেন দেবত্বের জাগরণ ঘটাও সর্বসাধারণের মধ্যে। না হলে সাম্যের নামে অসাম্যের বীজবপন, আর শান্তির নামে যুদ্ধের বীজবপন চলবে। অধ্যাত্ম জাগরণ ব্যতীত সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিকতাই সাম্যের উৎস।

সেইজন্য স্বামিজী মানুষের মধ্যে সুপ্ত 'ব্রহ্মসিংহ'-কে সর্বাগ্রে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল "Put the chemicals together, the action will take care of itself"—রসায়নাগারে বৈজ্ঞানিক যদি দুটি মৌলিক পদার্থের একাগ্র সমাবেশ ঘটাতে পারেন, তাহলে যৌগিক ক্রিয়া আপনিই সংগঠিত হয়। তেমনি দেবশক্তির জাগরণ ঘটলে আপনিই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই মানবের রূপান্তর সাধনকেই তিনি 'আমূল রূপান্তর' আখ্যা দিয়েছেন: "My Ideal can be put into a few words only—to preach unto mankind their divinities and how to manifest it in every moment of life'।

তাঁর এই বিপ্লব-সিদ্ধির জন্য তিনি একটি বৈপ্লবিক কর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেখানকার কর্মসকল তিনভাগে বিভক্ত হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান। 'খালিপেটে ধর্ম হয় না,' নিরন্নের কাছে ধর্মের কথা বলা অর্থহীন। সেইজন্য অন্নদান ও দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রথম কর্ম। দ্বিতীয় কর্ম অগণিত শিক্ষাবঞ্চিত জনগণকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে, তারা জানুক বিশ্বজগৎ কি ভাবে গড়া, কি তার পরিচয়। পরিশেষে, তাদের দেবসত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা এনে দিতে হবে। যুগ যুগ ধরে এই সকল অত্যাচারিত জনগণ শুনেছে তারা কেউ নয়, কিছু নয়। এখন তাদের শোনান হোক: তারা অমিতশক্তিমান, তারা কেন বঞ্চিত থাকবে। স্বামিজী চেয়েছিলেন এই কর্মচক্রে 'আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী' তরুণবৃন্দ সমবেত হয়ে মানবসমাজের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করবে, "আগুন ছড়িয়ে দেবে হিমালয় হতে কন্যাকুমারীরা পর্যন্ত", আর "উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত"। এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং তাঁর এই কর্মচক্রের মূলকর্মসূচী হল শিক্ষা। মনে হতে পারে এ' আর নূতন সমাধান কি? আর এর মধ্যে বৈপ্লবিক কি আছে? একটি

একটি করে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে যুগ যুগ কেটে যাবে, তারপর সমাজের রূপান্তর সাধন তা আর কোনদিন সম্ভব হবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই রাশিয়ায় বিপ্লব কি এই শিক্ষার দ্বারাই সংঘঠিত হয় নি? বিপ্লবের শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারখানায় কারখানায়, কামারশালায়, তাঁতশালায়, ছাত্রাবাসে, বিদ্যালয়ে। তার ফলেই কি রাশিয়ায় বিপ্লব অনতিবিলম্বে ঘটেনি? স্বামী বিবেকানন্দও পরিকল্পনা করেছিলেন শিক্ষাকে অগণিত মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে দেবেন,—সকলের প্রাণে পৌঁছে দেবেন এই বাণী—"তোমরা অমিতবীর্য ও অমৃতের অধিকারী"। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই বাণী নিয়ে অপ্রতিরোধ্য সমুদ্র-তরঙ্গের মত হিমালয় হতে কন্যাকুমারী আর দক্ষিণমেরু হতে উত্তরমেরু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তাঁর পূর্বোক্ত সিংহহৃদয় তরুণ-তরুণীবৃন্দ। তিনি যা আশা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়নি, কারণ একরকম তরুণ-তরুণীদল অগ্রসর হয়ে আসেনি। না হলে তারা যদি সত্যই এরূপ শিক্ষাকে কারখানায় শ্রমিকের কাছে, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের কাছে, চণ্ডালের কাছে, মুচি মেথরের কুটীরে, ছাত্রাবাসে, ভজনালয়ে, বিচারালয়ে পৌঁছে দিতে পারত তাহলে কি এক মহাজাগরণ অচিরেই সংঘটিত হত না? ঠিক রাশিয়ায় সে ভাবে জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এই মহত্তম ভাবের দ্বারাও তারা উদ্বুদ্ধ হত। কাজেই এ' অতি বাস্তব পরিকল্পনা।

এদের এই শিক্ষায় হৃতসর্বস্ব যুগ যুগ ধরে অত্যাচার প্রপীড়িত অনাহারে অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় জনসাধারণ পুরোহিত, ধনিক, রাজা ও বৈশ্য, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবির শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সমর্থ হবে। স্বামিজী সেই আশাই করেছিলেন, সেই পরিকল্পনাই করেছিলেন। তাই বলেছেন: "আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড়া আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' এই অভয়বাণীই শুনাতে আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ'। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে এই অভয়বাণী অচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা তোমরা অমিতবীর্য অমৃতের অধিকারী"।[৬]

"তোমরা কি অনুভব কর যে কোটি কোটি আর্য-ঋষিদের বংশধর পশুর প্রতিবেশী হয়ে আছে, তোমরা কি অনুভব কর সে কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে আছে, তোমরা কি অনুভব কর যে কৃষ্ণ মেঘের মতো অজ্ঞানতা সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেলেছে।...এই চিন্তা কি তোমাদের

---

(৬) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

ব্যাকুল করে না, বিনিদ্র করে না, তাহা কি তোমাদের পাগল করে না। এই ধ্বংসের কথা, এই দায়িত্বের কথাই কি তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে না"।[৭]

এখন চাই সবল সমর্থ বিশ্বাসী অল্পবয়স্ক মানুষ। এমন একশত মানুষ পেলে দুনিয়ার চেহারা আমূল পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমরা ক'জন এই অগণিত নরনারীর দারিদ্র্য অশিক্ষা অত্যাচার অবিচারের দায় গ্রহণ করেছি, ক'জনের সেই দায়ের চিন্তা করে সুখনিদ্রা ঘুচে গেছে, কজন সেকথা ভেবে উন্মাদের মতো কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছি? কজন নিজের মধ্যে দেবশক্তিকে জাগ্রত করেছি, কজনকে তা করতে সহায়তা করেছি?

স্বামিজীর শতবার্ষিকী উৎসব-উদ্‌যাপন শুধু তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শোভাযাত্রা, সভা আর সঙ্গীতানুষ্ঠানে সমাপ্ত হবে? ঐ সকল সিংহহৃদয় তরুণ-তরুণী কোথায়? কোথায় সেই সকল "men rebels," "women rebles" যাদের কাছে ধর্ম একমাত্র সত্য, আর সত্য ছাড়া আর কিছু নাই। স্বামিজী আমূল-রূপান্তর সাধনের পরিকল্পনা আজ তাদের পথ চেয়ে আছে। উর্ধ্বলোক হতে পদ্মপলাশনেত্র সেই মহাবীর সন্ন্যাসী তাদেরই জন্য অপেক্ষায় আছেন, কবে তারা আসবে, কবে তাঁর এই বিপ্লব সার্থক হবে।

(৭) 'আমার সমর পরিকল্পনা'—বিবেকানন্দ

॥ সপ্তবিংশতি অবদান ॥
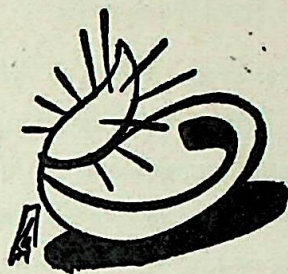
॥ স্বামিজীর শিল্পচিন্তা ॥

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শিল্পদর্শন সম্পর্কে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। সেই ঔৎসুক্যপ্রণোদিত হয়ে আমরা এই নিবন্ধের অবতারণা করছি।

স্বামিজী নির্বিকল্পসমাধি আশ্রয় ক'রে রূপহীন, নিরাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রমী এক অনন্ত ছায়ালোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; সাধনলব্ধ ঐশীশক্তির প্রসাদে কালান্তরের চিত্র তাঁর মানসনেত্রের সম্মুখে নিত্য সমুদ্ভাসিত ছিল। মহাকালের লীলা তাঁর চক্ষে পরম-অর্থে অর্থবান নয়। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছেন আপন যোগজ দৃষ্টির সহায়তায়। তাঁর বাল্যবন্ধুকে তিনি সে-কথা বলেছেন, আমরা তা' শ্রবণ করেছি। সুন্দর, কালধৃত; যে সুন্দর শিল্প বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাকে সাধারণভাবে কালজয়ী বললেও তা' পরিপূর্ণরূপে কালকে অতিক্রম করতে পারে না, কেননা, সুন্দর 'বিশেষ'-কে আশ্রয় করে; বিশেষ কালের দ্বারা 'বিশেষ'-রূপে চিহ্নিত। শিল্পের উপজীব্য হল সামান্য নয়, বিশেষ মাত্র। তিনি বিশেষকে উত্তীর্ণ হয়ে নির্বিশেষের মধ্যে পরম আনন্দে অবগাহন করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেই পরমসত্তার সাযুজ্য এবং সামীপ্য লাভ করেছেন, যেখানে সব বিশেষ তার চরিত্র হারিয়ে নির্বিশেষ হয়েছে। পরম কবি যিনি, তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন স্বামিজী। সুন্দরের উপাসনা হল অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা; পরমসুন্দরের উপাসনা হল অমৃতের তপস্যা। এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনাতেই আবার ঐ পরমসুন্দরের উপাসনার জন্য আসন পাতা হয়। এই পরমসুন্দরই হলেন, কবি এবং সকল মানসকর্মের নিয়ন্তা। ঈশোপনিষদে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

> "স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
> কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"।

—"তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি উজ্জ্বল দেহশূন্য ব্রণশূন্য স্নায়ুশূন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ; তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন"। এই 'কবির্মনীষী'-ই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের ধারক ও সৃজক। তাঁকে পেলে, তাঁকে লাভ করলে সকল সৌন্দর্যের মূলীভূত কারণকে পাওয়া যায়। এই পরমসুন্দরকে স্বামিজী পেয়েছিলেন; তাই তিনি প্রকৃতির রহস্যও জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যানে 'দৈবী প্রকৃতি'-র চিন্তা করেছিলেন; তাই তো তিনি অমৃতত্ব লাভ করেছেন। 'দৈবী প্রকৃতি'-র চিন্তনে এবং অনুধ্যানে অমৃতত্ব লাভের কথা ঈশোপনিষদে কথিত হয়েছে। পরমপুরুষের সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ ঘটলে ভোজ্য এবং ভোক্তা এরা একাত্ম হয়ে যায়। ভোক্তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য ঐ পরমপুরুষকে আবৃত করে রাখে। সুন্দরের আবরণের অন্তরালে পরমসুন্দর আত্মগোপন করে থাকে। তাই তো সুন্দরের পুজারী পরমভক্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে বলে:

> "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
> তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
> ···তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
> যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'' ॥ (ঈশোপনিষৎ, ১৫, ১৬)

—"হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্ম আমি যাহাতে দেখিতে পারি এইজন্য আবরণ অপসারিত কর। আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি,—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমি-ই"। রসিকসুজন রূপের মধ্যেই পরমরূপকারকে আবিষ্কার করেন। তাঁহার আবিষ্কারে তদ্দর্শনে সকল রূপের ইতি হয়। ভোক্তা পরমবিস্ময়ে ঐ পরম-রূপকার এবং আপনার মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি করে। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দ্বৈতভাব দুরীভূত হয়। দুই যে একের মধ্যেই বিধৃত আছে, সেই পরমজ্ঞানের সন্ধানটুকু রূপপিপাসু লাভ করে। তার মধ্যেই তার সকল রূপতৃষ্ণার সমাধি ঘটে। তার দেবদর্শন হয় এবং একই সাথে তার আত্মদর্শনও সংঘটিত হয়। ফরাসী দার্শনিক ব্রেমো বলেছিলেন, ভক্ত এবং রূপপূজারী সমগোত্রীয়। বহু-দূর পর্যন্ত তাদের একত্র অভিসার। তারপরে ভক্ত ভগবানের দিকে ফেরে আর শিল্পী পরমসুন্দরের সান্নিধ্যলাভ করে। স্বামিজী বললেন যে সুন্দরের উপাসক এবং ভক্ত এরা একই পথের পথিক। সুন্দরের উপাসক সুন্দরের মধ্যে যেমন

পরমসুন্দরকে দেখতে পান তাঁর সাধনার প্রান্তিক সীমায়, ঠিক তেমনি করে তাঁর আত্মসাক্ষাৎকারও ঘটে, কেননা আত্মাই তো ব্রহ্ম।

এই আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পেতে হলে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের পথে তা' পাওয়া যায়। এই বৈরাগ্যের পথেও ব্রহ্মলাভ ঘটে। এই ব্রহ্মই তো পরমসুন্দর। স্বামিজীর কথা উদ্ধৃত করি: "একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐ-সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যাঁহার বেচা-কেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন"।[১]

ছবি দেখে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগের পথে যেমন লাভালাভের দৃষ্টিটুকু অন্তরায় হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মানন্দলাভের পথে প্রধান বাধা হল আমাদের বাসনাপঙ্কিল দৃষ্টিটুকু। নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ হল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। 'রসো বৈ স',—তিনি রসস্বরূপ। তাই তো নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদনের পথে ব্রহ্মলাভ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। স্বামিজী সৌন্দর্য-দর্শনের রূপকল্প প্রয়োগ করলেন ব্রহ্মদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। আবার তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: "এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই: তিনিই মহৎকবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনাত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে"।[২]

---

(১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১৭২
(২) ঐ ঐ ঐ ঐ

জীব মায়ামুক্ত হয়, বাসনা ত্যাগ করে ; তার মুক্তি ঘটে এই বৈরাগ্যের পথে। স্বামিজী এই বৈরাগ্যকে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলিত করেছেন। যেমন করে শিল্পের রস অলব্ধ থেকে যায় যদি না রসিকজনার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যটুকু আয়ত্তে থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের মায়াবন্ধনেরও মুক্তি ঘটে না যদি না আমরা বাসনা-বৈরাগ্যটুকু অর্জন করতে পারি। স্বামিজীর পক্ষে এই উভয়বিধ বৈরাগ্যই সহজলভ্য। যিনি নির্বিকল্পসমাধির আনন্দহিল্লোলে অবগাহন করেছেন, যিনি নির্বিশেষ মর্ত্যালোকোত্তর অস্পষ্ট লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন আপন তপঃপ্রভাবলে তিনি নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ বা রসের চরম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, এ'কথা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ হল শিল্পের জগৎ ; স্বামিজী যখন নির্বিশেষ লোকের আভাস পান তখন শিল্পলোক অতিক্রান্ত। আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হল নাম-রূপের জগৎ। শিল্পজগৎও তাই। রূপ সত্যকে আবৃতও করে, আবার তাকে ব্যঞ্জিতও করে। সত্যের ব্যঞ্জনা, তার আভাস রূপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সত্যকে—পূর্ণ সত্যকে নন্দনতাত্ত্বিক পথে, রূপারাধনার পথে লাভ করা যায় না। রূপ অপগত না হলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে না। তাই পূর্ণ সত্যকে যে-লোকে লাভ করা যায় বা পূর্ণ সত্য হওয়া যায়, তা' হল অদ্বৈতের জগৎ। আর নন্দনতত্ত্বের জগৎ হল দ্বৈত-আশ্রয়ী। রূপ-ভোক্তা এবং রূপ—এরা এ' জগতের সমান অংশভাগী। যখন এই রূপের জগৎ অতিক্রান্ত হয়, রূপরসিক পরম-রূপকে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখন সুন্দরের জগৎ পরমসুন্দরের মধ্যে আপনার চরম-সার্থকতা খুঁজে পায়। এই পরম অভিজ্ঞতাটুকু ক্রমান্বিত। রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকের দিকে ভক্তের অভিসার নিত্য চলে। রূপলোক-অতিক্রমণের অভিজ্ঞতা সহজলভ্য নয়। সাধারণতঃ মানুষেরা রূপ-লোকের সীমানায় আবদ্ধ। এর বাইরে যাওয়া অতীব দুরূহ। এই রূপলোককে অতিক্রম করেছিলেন স্বামিজী তাঁর অলৌকিক তপস্যার বলে আর শ্রীঠাকুরের কৃপায়। তাঁর দেবদুর্লভ এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন :[৩]

> "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
> ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
> অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
> ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর" ॥

(৩) স্বামিজীর বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭

পূর্ব-কথিত ঈশোপনিষদের শ্লোকে সূর্যদেবকে বলা হয়েছে তাঁর আলোক-আবরণ অপসারিত করার জন্য। সেই আলোক-আবরণ অপসারিত করলে তবেই সত্যের স্বরূপ দেখা যায়, তবেই আত্মোপলব্ধি ঘটে, একথা বললেন উপনিষদের ঋষি। তাঁর সুউচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বামিজীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এঁরা উভয়েই একই ভাবনার দ্বারা ভাবিত স্বামিজী-দৃষ্ট এই অস্পষ্ট লোক জ্যোতিঃহারা, সূর্য-বিহীন। সূর্যের আলোক-আবরণ অপসারিত হলে তবেই সত্যদর্শন ঘটে, এ' কথা বললেন উপনিষদের ঋষি; আর স্বামিজীর অভিজ্ঞতায় আমরা সেই সত্যের আভাস পাই। স্বামিজী যে অবাঙ্‌মনসোগোচরমের কথা বলেছেন সেখানে সূর্য-চন্দ্র অস্তমিত, সে লোকে জ্যোতির্লেখা অলিখিত।

স্বামিজী-কথিত শিল্পমূল্য ও শিল্পব্যঞ্জিত মহামূল্যের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক জগৎ ও মানুষের চরম মুক্তির সন্ধান দেয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ পারমার্থিক পর্যায়কে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার ব্যবহারিক স্তরকেও স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পের আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন তার চরম-মূল্যায়ন হলেও ব্যবহারিক সত্তার আলোকে তার মূল্যায়ন বাহুল্য নয়—একথা স্বামিজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। তাই দেখি তাঁর নানান্ লেখায়, বক্তৃতায় এবং আলোচনায় শিল্পের উল্লেখ। দেশ-বিদেশের শিল্প, গ্রীক শিল্প, ভারতীয় এবং এশিয়ার দেশগুলির শিল্প এবং রোমক শিল্পের উল্লেখ আমরা বহুবারই পেয়েছি। কখন কখন শিল্পের চরম আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন করেছেন তিনি। তার উল্লেখ পূর্বেই আমরা করেছি। আবার কখন বা বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিল্পী বড় হয়ে উঠেছে। শিল্পকে অতিক্রম ক'রে শিল্পীর দাবীটা স্বামিজীর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি সানন্দে সে স্বীকৃতিটুকু দিয়েছেন। তিনি শ্রমের গুণগান করেছেন; শ্রমদানীদের প্রণাম করেছেন।[৪] নির্বিকার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য তাঁর অনায়াসলভ্য ছিল ব'লে তিনি সহজেই যথার্থ শিল্পমূল্যায়নটুকু করতে পারতেন। ইউরোপীয় দেশগুলির শিল্পপ্রচেষ্টার তুলনামূলক আলোচনা স্বামিজী করেছেন। আমরা সেটুকু উদ্ধৃত করে দিই। "কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ। ... কিন্তু ফরাসীতে সে

(৪) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৬

শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর"।[৫]

স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিল্পপ্রকরণের মূল্যায়ন যে বহুলাংশে যাথার্থ্যের দাবী রাখে, একথা বিরূপ সমালোচকেরাও স্বীকার করবেন। ফরাসী শিল্পকলার সুকুমার সৌন্দর্য স্বামিজীকে আকৃষ্ট করেছিল। লুভার মিউজিয়ম দেখে তিনি গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা শিল্পরসিক-মাত্রেরই অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিদেশী শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বামিজী লিখছেন: "মিউজিয়ম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম 'মিসেনি' (Mycenoean), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। ...এই 'মিসেনি' শিল্প প্রধানতঃ এশিয়া শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হ'তে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত 'হেলেনিক' বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। ...ক্রমে এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ ক'রে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছে"।[৬] তারপরে স্বামিজী 'আর্কেইক' ও ক্লাসিক গ্রীক শিল্পের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রীক শিল্পের মূল্যায়নপ্রসঙ্গে তিনি লিখলেন: "কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন; '(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প চরম-উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে'। এই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়,—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন"।[৭] স্বামিজী আটিক শিল্পীগোষ্ঠির শিল্পকর্মে লক্ষ্য করলেন অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের

---

(৫) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৬
(৬) ঐ ঐ ঐ, ঐ পৃঃ ১৪২-৪৩
(৭) ঐ ঐ ঐ, ঐ পৃঃ ১৪৩

গৌরব; যাহা কোনকালে মানব-মনে আপন অধিকার হারাইবে না। এছাড়াও তিনি আটিক শিল্পের অন্যতর প্রবৃত্তিটিকেও আবিষ্কার করেন। সেটা হল শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত ক'রে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা অলৌকিক দেবমহিমা, একদিকে আটিক শিল্পের উপজীব্য; অন্যপ্রান্তে মানুষ আপন মহিমায় এবং স্বরূপে শিল্পসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আটিক শিল্পের এই দুটি ধারা স্বামিজীকে আকৃষ্ট করেছিল, কেননা স্বামিজী উভয়কেই পরমসত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। মানুষের শ্রেয়বিধানের মধ্য দিয়েই তো ভগবানের সেবা করা যায়। তাই দেবভাব এবং মানব-মহিমা, স্বামিজীর মতে আটিক শিল্পকে অনন্যসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যিনি জীবের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি শিল্পে দেবভাব এবং মানবভাব উভয়কেই স্বাগত জানাবেন, এ আর বিচিত্র কী?

অন্যত্র জাপানী ছবি সম্বন্ধে স্বামিজী যে আলোচনা করেছেন তা' কলারসিক এবং নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রশ্নকর্তা স্বামিজীকে বলছেন: "আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার জো নেই"।

স্বামিজী বললেন: "ঠিক, ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না, সব গেছে, তবু যা আছে তা' অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ"।[৮] পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ মানুষের শিল্প-জীবনের সঙ্গে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের তুলনা করে স্বামিজী প্রসঙ্গান্তরে বললেন: "কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্যকারিতা) আমাদের art (শিল্প)। ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। এখন চাই art এবং utility'র combination (সংযোগ)। গোঁড়া নন্দনতাত্ত্বিক হয়ত বলবেন যে, শিল্প এবং প্রয়োজন এরা হল পরস্পরবিরুদ্ধ। কেমন করে এদের প্রকৃতির যাথার্থ্যকে রক্ষা ক'রে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায়, সে সম্পর্কে নানান কুটতর্কের অবতারণা হয়ত করা যেতে পারে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রসার এবং ঐশ্বর্য স্বামিজীর মতের সারবত্তায় আমাদের আস্থা স্থাপন করতে উৎসাহিত করে।

---

(৮) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬

আর এই সমন্বয়প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে জাপানে। স্বামিজী সেকথা আমাদের বলেছেন। আপাতবিরোধী নন্দনতত্ত্বগত দু'টি আদর্শের সমন্বয় তিনি ঘটিয়ে দিয়েছেন তাঁর ঋষি দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রসাদগুণে।

শিল্পে বাস্তবতা-সম্পর্কে পণ্ডিতজন নানান ধরনের মত পোষণ করেছেন। শিল্পে প্রয়োজনের স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে স্বামিজীর সুচিন্তিত মতের উল্লেখ আমরা করেছি। শিল্পে বাস্তবতা-সম্পর্কে তাঁর মতামতও প্রণিধানযোগ্য। শিল্প কতটুকু বাস্তব-অনুসারী হবে, কতখানি সে বাস্তবকে অনুসরণ ক'রে তারপরে কল্পনার পাথায় ভর করবে, সে প্রশ্ন অতি দুরূহ। স্বামিজী এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধানকল্পে শিষ্যকে বলেছেন: "একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে— যাদের স্কুলে লেখাপড়া হ'ল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama (সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা"।[৯] এই মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন: "শিল্পের বিষয়-বস্তুর মুখ্যভাবটুকু শিল্পকর্মের মধ্য থেকে ফুটে বেরুনো চাই। শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই"। ভারতীয় ঐতিহাসিক শিল্পকর্মে স্বামিজী এই দু'টি গুণই প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতীয় শিল্প আপন গৌরবে ভাস্বর, কেননা এই দু'টি গুণই ভারতীয় শিল্পে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করেছে। তিনি অন্যত্র ভারতীয় নাটক এবং গ্রীক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় নাটককে উক্ত দু'টি প্রসাদগুণই বরমাল্য দিয়েছে। তৎকালে প্রচলিত গ্রীক নাটকের দ্বারা ভারতীয় নাটকের প্রভাবিত হওয়ার কথাকে স্বামিজী অস্বীকার করেছেন। বিদ্বদ্‌জনসুলভ জ্ঞানের আনুকূল্যে সূক্ষ্ম তর্কজালের বিস্তার ক'রে তিনি বললেন: "আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ তো নাই, বরং শেকস্‌পীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে"।

শুধু নাটক কেন আর্য ভাস্কর্যেও গ্রীক প্রভাব তিনি অস্বীকার করলেন। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রে স্বামিজীর ব্যুৎপত্তি সন্দেহাতীত। বিশেষজ্ঞের সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম মননধর্ম স্বামিজীর সকল আলোচনার বিষয়বস্তুর

(৯) স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪১৪

উপর অলোকসামান্য আলোকপাত করেছে, একথা নির্বিচারে বলা যায়। বিলাতী-সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বললেন: "বিলাতী সঙ্গীত খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত; যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অন্ধি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না"।[১০]

বিলাতী সঙ্গীতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বামিজী শিল্পে অধিকার-বাদের নীতিকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই অধিকার কুলগত নয়, এ' অধিকার অর্জন-সাপেক্ষ।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বামিজীর আসক্তি জন্মেছিল ধীরে ধীরে একথা স্বামিজীর স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পূর্ণ রূপ। সে রূপ দর্শন করা অভ্যাস ও আয়াস-সাধ্য। হার্মনি-প্রধান পাশ্চাত্য সঙ্গীত স্বামিজীকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি পাশ্চাত্যসঙ্গীতে করুণরস এবং বীররস, এই উভয়বিধ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য ক'রে বললেন যে, 'আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে harmony'র অভাব; আর এই অভাবটুকুর জন্য বীররসের প্রাধান্য বড় একটা ভারতীয় সঙ্গীতে দেখা যায় না। বীররস, স্বামিজীর মতে, হার্মনি-আশ্রয়ী। 'সকল রাগই martial হয় যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিনীর মধ্যেও কতকগুলি হয়'। মুসলমান বিজয়ের পরে এ-দেশে টপ্পা গানের বিশুদ্ধতা আর রইল না ব'লে স্বামিজী আক্ষেপ করেছেন। এ-দেশে এসে মুসলমান ওস্তাদেরা রাগ-রাগিনীগুলিকে আত্মস্থ করলেন; এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা টপ্পা গানের রীতির উপরে আপনাদের মুন্সিয়ানা এমনভাবে প্রয়োগ করলেন যে টপ্পা গানের নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে গেল। স্বামিজীর এই মত সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও একথা বলা যায় যে, তাঁর শিল্পদৃষ্টি শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বাবলীর অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করেছে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করি: "তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উল্টে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন

---

(১০) স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৯৯

ও সংযোগ) নিয়ে এক-একটা রাগ-রাগিণী হয় তো? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি ক'রে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়।...তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড়-মূর্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে'।[১১] উপরি উদ্ধৃত উক্তি থেকে সঙ্গীত তথা শিল্প সম্বন্ধে স্বামিজীর আর একটি মত আমরা আবিষ্কার করতে পারি। তাঁর মতে সঙ্গীতের কবিত্বভাবটাকে বিসর্জন দিলে শিল্পের মূল্যহানি ঘটে। অর্থাৎ সঙ্গীত শুধুমাত্র সুরের বা রাগ-রাগিনীর খেলা নয়। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দিয়ে যেন শিল্পের মূল্যায়ন না করা হয়। সুর একটা ভাব বহন করে; সেই ভাবটি সঙ্গীতের শিল্পমূল্য কতকাংশে নির্ধারিত করে। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ'। স্বামিজী ইঙ্গিত করলেন যে, 'শুধু সুর দিয়ে যেন কানকে আমরা না ভোলাই। মন ভোলাবার জন্য যেন কবিত্ব ভাবটিও অক্ষত এবং পূর্ণ থাকে'। শিল্পের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এই তত্ত্বকে রূপ এবং ভাব (form and content)-এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ তত্ত্ব হিসেবে দেখা হয়েছে। শিল্পে রূপ বা ফর্মের প্রাধান্য হবে, না ভাব বা কন্টেন্টের প্রাধান্য ঘটবে? এ অতি জটিল প্রশ্ন। স্বামিজীর মত হল আবিস্ততলীয় মধ্যপন্থা আশ্রয়ী। সঙ্গীতে রাগরাগিনী এবং তার কবিত্বভাব, এরা উভয়েই প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প হতে হলে এই রাগরাগিনী এবং কবিত্বভাবকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। স্বামিজীর এই মত তর্কশাস্ত্র-অনুমোদনসম্মত।

স্বামিজীর সঙ্গীতবিজ্ঞানে পারঙ্গমতার কথা বহুজনবিদিত। আমাদের সঙ্গীতে হার্মনির অভার যেমন তাঁকে পীড়া দিয়েছে ঠিক তেমনি ওদেশের কাব্যে অমিত্রাক্ষরছন্দের আধিক্য তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি বললেন: "শুধু ছন্দের মিল ঘটানো কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্তু নয়"। এ ঘোষণা তিনি করলেন স্যানফ্র্যান্‌সিস্কো শহরে অবস্থিত ওয়েণ্ড সভাগৃহে। তাঁর কণ্ঠে সেদিন বিষাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ভারতের শিল্পকে, তার শিল্পদর্শনকে তিনি আবার ফিরে পেতে চাইলেন। তিনি বললেন:

---

(১১) স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯-৪০০

"বর্তমান ভারতবর্ষকে, তার ব্যক্তি এবং ব্যষ্টিজীবনকে শিল্প-আশ্রয়ী হ'তে হবে। আর সেইদিকে সে কতখানি অগ্রসর হতে পারবে তার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে সেদিন এই কথাই ধ্বনিত হল: "ভারতবর্ষে বহুযুগ পূর্বে সঙ্গীত পূর্ণ সপ্ত-স্বরে এমন কি অর্ধ ও চতুর্থাংশ স্বরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প—এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতের সব কিছু নির্ভর করে"।[১২]

নব্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তার সৃষ্টিধর্মী শিল্প-প্রচেষ্টার স্পর্শধন্য হ'য়ে স্বামিজীর কল্পিত মূর্তি পরিগ্রহ করুক্। তাঁর আবির্ভাব শতবর্ষ-পূর্তি দেশের শিল্পীদের এই মহান দায়িত্ব পালনে প্রণোদিত করুক, আমাদের এইটুকু প্রার্থনা।

---

(১২) স্বামিজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫
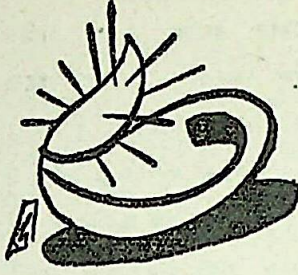
॥ অষ্টবিংশতি অবদান ॥

॥ বিবেকানন্দ ও ভারতশিল্প ॥

নব উন্মেষের প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যখন একে একে বিকশিত হচ্ছে সংস্কৃতির শতদল, ঠিক তখনই সেই সৃজন যজ্ঞের চরমক্ষণে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। ধর্মে, সংস্কারে, বিদ্যায়, সাহিত্যে, অভিনয়ে, বিজ্ঞানে সেদিনের আত্ম-সচেতন বাঙালী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিমী সংস্কৃতির কাছে প্রমাণ করলো আপন সামর্থ্যের কথা, আপন সংস্কৃতির ইতিহাস। সেই তখন অবহেলিত ভারতীয় শিল্পশৈলীর নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠায় প্রায় সবার অজ্ঞাতে হোতা হয়েছিলেন সেদিনের ভারতের অন্যতম বিদ্রোহী আত্মা বিবেকানন্দ।

আপন পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতা, সমকালীন শিক্ষা ও শিক্ষকদের পরিবেশ সম্ভবত নরেন্দ্রনাথকে সজাগ করে, সংস্কৃতি সচেতন করে, আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মানুসন্ধানে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের আশাহত অভিমানে, এ বিদ্রোহী আত্মা নিজেকে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাধারণের অজানিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যৌবনোজ্জ্বল ভারতের ভবিষ্যৎ। তারই অংশবিশেষ ভারতীয় শিল্প-চেতনা।

নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, চরৈবেতি—চরৈবেতি। ভ্রমণে দর্শন, দর্শনে জ্ঞান। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্রভারতবাসী, অজ্ঞ, মুচি, মেথরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনুভব করলেন ভাই বলে। তেমনি ভারতের আসমুদ্র হিমাচল, পদে পদে অতিক্রম করে, মন্দিরে মন্দিরে, দেবতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য দর্শনে সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্প-আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়েছিল স্বামিজীর। আরো তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "কোন আদর্শ, ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি অঙ্কনে পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃত শিল্পকলা পদ্মের মত, মাটি থেকেই তার উদ্ভব, মাটি থেকেই তার পুষ্টি, মাটির

সঙ্গে তার যোগ নিত্য অথচ মাটি থেকে তা' অনেক উর্দ্ধ্ববর্তী। কাজেই শিল্পকলার প্রকৃতির সঙ্গে যোগ থাকবেই। যোগসূত্র ছিন্ন হলে শিল্পকলার অবনতিই হয়, কিন্তু তা' হবে প্রকৃতির উর্দ্ধে" (অনুবাদ)। হাটে, বাটে, মাঠে, ঘাটে, পায়ে, পায়ে চলার ক্ষণে প্রত্যক্ষ করেছেন কামার, কুমোর, পটুয়া, সূত্রধরকে। অন্তরঙ্গ হয়েছেন, ঘনিষ্ঠতা তাঁকে সুযোগ দিয়েছে শিল্পকলার প্রাণভ্রমরার অনুসন্ধানে। তাকে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন: "ভারতীয় চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে শ্রীহীন মাটির পুতুলকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, কারণ উহার মধ্যেও আধ্যাত্মিক আদর্শটাই আর একভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র" (অনুবাদ)।

দিগ্বিজয়ের কালে প্রাচী-র এ প্রতিভা প্রতিচীর দুয়ারে দুয়ারে পরাধীনদেশের প্রাণের পরিচয় প্রচার করে ঘুরলেন। তখন ওদেশের সাংস্কৃতিক উন্মেষ, ওখানের শিল্প সচেতনতা সম্ভবত স্বামিজীকে ব্যাকুল করেছিল তাঁর ভারতের পরাভূত আশাহত আত্মাকে পুনোরুজ্জীবিত করতে, তাই সেদিন সেখানে সংগ্রহশালায় সংগ্রহশালায় সশিষ্যা স্বামিজী অনুসন্ধান করেছেন, অনুধাবন করেছেন শিল্পবোধের সীমা, রসোপলব্ধির আগ্রহ, কলাশিল্পে জাতীয়তার অভিমান। আপন অভিজ্ঞতায় প্রদীপ্ত করেছেন উন্মেষ-উন্মুখ আর একটি জ্ঞান বর্তিকা। ভারতে এসে আয়র্ল্যাণ্ডের মার্গরেট নোবেল নিবেদিতা হলেন। গুরু বিবেকানন্দের যোগ্যা প্রতিনিধি হয়ে আপন গুরু-প্রজ্জ্বলিত প্রাণের অংশ নিয়ে জনমনের একান্তে, ভারতে ভারতীয়তার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিনী হলেন নিবেদিতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলা সংস্কৃতির চরম বিকাশের মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশ চেতনায় সচেতন। বাংলাদেশে তখন স্বদেশী যুগের শুরু। সেই তখন ভারতীয় প্রতিভার অন্যতম যুগন্ধর, ভারতীয় শিল্প শৈলের জনক অবনীন্দ্রনাথ. সেই স্বদেশী আন্দোলনে ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, দোলায়, দোলায় কেমন করে উপলব্ধি করেছেন দেশের কথা, সেটি তাঁর কথাতেই শুনি: "গেল আমাদের স্বদেশীযুগ ভেঙে। কিন্তু এই যে স্বদেশীযুগে ভারতে শিখেছিলুম দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমার ছবির জগতে। তখন বাজনা করি, ছবিও আঁকি—গানবাজনাটি আমার ভিতরে ছিল না, সেটি গেল ছবিটি রইল। ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে"।

শিল্পী শিল্পের তাগিদে, জাতীয়তার তাগিদে রচনা করলেন নব্য ভারতীয় শিল্প শৈলী। নতুন ভারতের আপন শিল্পভাষা। হ্যাভেল অনুপ্রাণিত ক্লাবটি ক্রমে ক্রমে উড্রফ, ব্লাণ্ট, কিচ্‌নার, র‍্যাম্পেনি প্রভৃতির সহযোগিতায় সোসাইটি হয়ে উঠলো।

৩০

দল বাড়লো, শিল্পী সংগ্রহ হলো, অবনীন্দ্র শিল্প শৈলীতে সমবেত হলেন নন্দলাল, অসিত, সুরেন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু অনুকৃতিঅনুপ্রাণিত, অনুকরণঅনুপ্লাবিত, লিথোগ্রাফ, ওলিওগ্রাফ উদ্ভাসিত পরাভূত ভারতের সাধারণ মন তখন বিরসতায় মগ্ন। তাই নবজাগ্রত ভারতে জনসাধারণ নব রসের আস্বাদনে বিমুখ ও বিরত ছিল সেদিন। ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে জনসংযোগ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, ব্যাহত করতে উদ্যত হলো তার প্রতি পদক্ষেপ।

এমন মুহূর্তে বিবেকানন্দের তেজে উন্মেষিতা নিবেদিতা এগিয়ে এলেন সে দায়িত্ব পালনে। ভারতের তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ সাথী গুরুভাই, বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে, দর্শনে, আলাপ-আলোচনায় আত্মস্থ করলেন ভারতীয়তা। প্রত্যক্ষ করলেন, বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন শিল্প। তখন কখনও সঙ্গী হলেন রবীন্দ্রনাথ, কখনও জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি। রামানন্দকে উদ্বুদ্ধ করলেন ইংরেজি মাসিক পত্রে। একের পর এক প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন, ব্যাখ্যা করলেন ভারতীয় শিল্পের ধ্রুপদীপর্যায় ও নব্যভারতীয় শিল্প আন্দোলনকে। গুরুর আরব্ধ কর্মে তাই আপন দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মসচেতনতাহীন এ প্রচেষ্টা তাঁকে ভারতীয় শিল্প আন্দোলনের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাতা রূপে চিত্রিত করেছে। তাঁর এ কর্মের স্বীকৃতি রয়েছে অবনীন্দ্র রচনায়।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। বাগবাজারের ছোট্ট ঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালদের কত ভালোবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। অজন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে। একদিন আমায় নিবেদিতা বললেন, 'অজন্তায় মিসেস হ্যারিংহাম এসেছে। তুমিও তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহায্য করবে। দু'পক্ষেরই উপকার হবে। আমি চিঠিলিখে সব ঠিক করে দিচ্ছি'। বল্লুম, "আচ্ছা"। নিবেদিতা তক্ষুণি মিসেস হ্যারিংহামকে চিঠি লিখে দিলেন। উত্তরে মিসেস হ্যারিংহাম জানালেন, বোম্বে থেকে তিনি আর্টিষ্ট পেয়েছেন তাঁর কাজে সাহায্য করবার। এরা সব নতুন আর্টিষ্ট, জানেন না কাউকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবেদিতা ছেড়ে দেবার মেয়ে নন। বুঝেছিলেন এতে করে নন্দলালদের উপকার হবে। যে করে হোক পাঠাবেনই তাদের। আবার তাঁকে চিঠি লিখলেন। আমায় বললেন: "খরচপত্তর সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দাও অজন্তায়। এ রকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না"। নিবেদিতা যখন বুঝেছেন এতে নন্দলালদের ভালো হবে, আমিও তাই মেনে নিয়ে সমস্ত খরচপত্তর দিয়ে নন্দলালদের কয়েকজনকে

পাঠিয়ে দিলুম অজন্তায়। পাঠিয়ে দিয়ে তখন আমার ভাবনা। কি জানি, পরের ছেলে, পাহাড়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলুম, যদি কিছু হয়! মনে আর শান্তি পাইনে, গেলুম আবার নিবেদিতার কাছে। বললুম: "সেখানে ওদের খাওয়া দাওয়াই বা কি হচ্ছে, রান্নার লোক নেই সঙ্গে, ছেলে মানুষ সব"। নিবেদিতা বললেন: "আচ্ছা আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি"। বলে গণেন মহারাজকে ডাকিয়ে আনলেন। ডাল, চাল, তেল, নুন, ময়দা, ঘি আর একজন রাঁধুনি সঙ্গে দিয়ে বিলিব্যবস্থা বলে কয়ে গণেন মহারাজকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দলালদের কাছে। তবে নিশ্চিন্ত হই।

নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হতো না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি।

শিল্পগুরুর স্বীকৃতিতেই নির্দেশ রয়েছে নিবেদিতার দানের পরিমাণ সম্বন্ধে। নিবেদিতার এ প্রচেষ্টা তাঁর গুরুর অনুসরণ। বিবেকানন্দের শিল্প-জিজ্ঞাসা পরিণতি পেয়েছে নিবেদিতার প্রচেষ্টায়। তাই গুরু প্রণোদিত শিল্প অনুভূতি বিকশিত হলো শিল্প আন্দোলনে, প্রচারিত হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো শিষ্যার প্রচেষ্টায়। আজ যেমন সে শিল্প আন্দোলন স্তিমিত, তেমনি নিবেদিতা প্রায় বিস্মৃতা—বিবেকানন্দ অজ্ঞাত, ফলে পুজ্য প্রতিমায় পরিণত। এ এক দুঃসহ মুহূর্ত।

যন্ত্রযুগের নবতন্ত্রে ব্যাহত মনুষ্যত্ব, বিকশিত হয়েছে বিকৃতিতে। যন্ত্র অনুসরণে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে গিয়ে টুকরো টুকরো অনুভূতি নিয়ে অনুভবের চেষ্টা করেছে মহা-অনুভবকে। এ দুরূহ প্রচেষ্টায় আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন গুরুতর, তাই স্বভাবতই বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ এসে পড়বে আত্ম-জিজ্ঞাসুর কাছে। এমনি এক চরম মুহূর্ত ই বিবেকানন্দের স্রষ্টা। এমন এক আত্ম-জিজ্ঞাসাই অপমানে, অভিমানে, জ্বালায়-যন্ত্রণায়, অভিভূত না হয়ে—পরাজয়ের গ্লানিকে তুচ্ছ করে ঘোষণা করেছিল মানবতার বিজয় সংবাদ। মানুষকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিল আত্ম-উপলব্ধির সার্থকতায়। বিবেকানন্দের প্রজ্ঞা সেদিন মানবতার চরম বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক সোপানগুলি রচনার ধাপে ধাপে নিজের উপলব্ধি দিয়ে অজ্ঞানকে সাহায্য করেছিল অভিজ্ঞতা লাভে। সে উপলব্ধির রেশ ছড়িয়ে আছে বিবেকানন্দের সাহিত্য-কীর্তিতে, শিষ্যা নিবেদিতার ফুটফলস অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি (Footfalls of Indian History) বইয়ে ওকাকুরার রচনায়। বিবেকানন্দের সেই রত্ন ভাণ্ডারের দু'এক টুকরো দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ হলো: "শিল্পকলা সৌন্দর্যের প্রকাশ। প্রতিটি বস্তুতেই শিল্পকলার প্রকাশ থাকা

উচিত। স্থাপত্য আর গৃহের মধ্যে পার্থক্য হল, স্থাপত্য একটি চিন্তার প্রকাশ আর গৃহ অর্থনৈতিক তত্ত্বভিত্তিক নির্মাণ। বস্তুর মূল্য চিন্তাপ্রকাশের উন্মুখতার ওপর নির্ভরশীল"।

"গ্রীক শিল্পকলার গোপন কথা হল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েও প্রকৃতির অনুসরণ, ভারতীয় শিল্পকলার গোপন কথা হল আদর্শের রূপায়ণ। গ্রীক চিত্রকরের শক্তি হয়ত মাংসখণ্ড অঙ্কনেই ব্যয়িত হয়, আর তাতে তিনি এতই সফল হন যে, একটা কুকুর মাংসভ্রমে সেটা কামড়াতে যায়। কেবলমাত্র প্রকৃতির অনুসরণে গৌরব কি? কুকুরের সামনে একখণ্ড মাংস দিলেই হয়?"
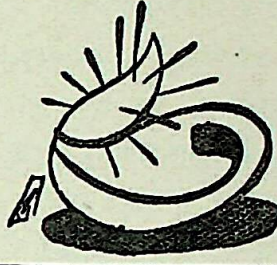
। উনত্রিংশ অবদান ।

॥ বাংলা গদ্যশিল্পে স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শিল্পই শিল্পী। প্রতিটি সার্থক শিল্পই শিল্পীমনের স্বতঃস্ফূর্ত লীলারসে পরিষিক্ত। শিল্পের যদি কোন নিজস্ব রূপ থাকে, রং থাকে, তাহলে তা' শিল্পীর ধ্যানে কল্পনায়। প্রকাশেই তার বিকাশ। শিল্পকে স্বয়ম্ভু চিন্তা করলে, তার থেকে নকল তাজমহল তৈরী করা যেতে পারে, কিন্তু নতুন একটি বিজ্ঞান ভবন গড়ে তোলা চলবে না। শিল্পের রূপান্তরেই শিল্পীর নবজন্ম। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তাই বাংলা গদ্যশিল্পের রূপান্তর দেখা গেল শিল্পী বিবেকানন্দের লেখনীতে।

স্বামী বিবেকানন্দ সাহিত্যিক নন, বিপ্লবী। তাঁর কালের সমাজে ও ধর্মে এনেছেন নতুন দৃষ্টিভংগী। অকপটে উন্মুক্ত করেছেন অন্তরের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা, উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন জনমানসকে নতুন মননে। তাঁর আন্তরিকতার উৎস-মুখে ভেসে গেছে পুরাতন শিল্পবোধ, মার্জিত সংস্কার। তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁর লেখনীতে। তাই তিনিই তাঁর ভাষা, তিনিই শিল্প ও শিল্পী।

নতুন ব্যক্তিত্বের জাগরণে ভাষারীতির দিক্ পরিবর্তন কোন দেশেই কিছু নতুন নয়। যাঁরা মুখ্যত সাহিত্যিক নন, তাঁরাও ভাষাশিল্পের রূপান্তর ঘটান তাঁদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে। বাংলাভাষায় রাজা রামমোহন, ফরাসীভাষায় ভলটেয়ার আর ইংরেজীতে বার্ক এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইরকম আর একটি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের স্বামী বিবেকানন্দ।

(২)

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও জীবনকাল প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই (১৮৬৩-১৯০২) সীমাবদ্ধ। এই শতাব্দীটি আমাদের দেশের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চেতনার একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। নবজাগরণ অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবতা-

বাদের প্রতিষ্ঠাসূচক প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব দেখা গেল আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে—রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের উদ্যমে। একটা অস্তিবাদী সমাজ-চেতনাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। এর বিরুদ্ধে সেযুগের রক্ষণশীল হিন্দুদের বাদ-প্রতিবাদ অরণ্যে রোদন মাত্র হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তখন আমাদের জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষা এগিয়ে চলেছিল নব মূল্যায়নে। কিন্তু কালক্রমে সেই মূল্যবিচারের কষ্টিপাথরে কনক রেখাটি গেল হারিয়ে। ব্যর্থ হল ধর্ম-প্রগতি। ধর্মাদর্শের মাটিতে রস গ্রহণ করেই বেঁচে থাকে জাতীয় জীবনের মহীরুহ। চৈতন্যোত্তর বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের যে পরিণতি হয়েছিল, ব্রাহ্মধর্মেরও তাই হলো। এইকালে রামমোহনের মতোই যুক্তিবাদ, সমাজচেতনা ও ধর্মাদর্শ নিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দেখা দিল নব্য উদারপন্থী হিন্দুধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা তাই প্রচারধর্মী। উদ্দীপনাময় জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে তা' স্বচ্ছ ও নিরাবরণ। সেখানে স্থিতধী সাহিত্যিকের পরিশীলন যতখানি আছে, তার চেয়ে বেশী আছে কর্মীর প্রাণচঞ্চল আবেগ। এই পশ্চাৎপটের আলোকেই একমাত্র স্বামিজীর ভাষারীতির স্বরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যে যে বিশেষ রীতির প্রবর্তক, তাকে মৌখিক গদ্যরীতি বলা চলে। কিন্তু তিনি এই রীতির শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও, একক নন।

(৩)

বাংলা ভাষার অনুরাগী পাঠক মাত্রেই একথা জানেন যে, ব্যাপকভাবে আধুনিক বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা চলে যে, বাংলা চলিত ভাষা সে যুগে প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের দ্বারা বহু অনুশীলিত না হলেও, কালগত ভাবে সাধু-ভাষারই সমজা। একই বছরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আওতায় প্রকাশিত হয় সাধুভাষায় রচিত প্রথম বই রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও চলিত ভাষায় রচিত প্রথম বই উইলিয়ম কেরীর কথোপকথন। এরপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে বাংলা সাধুভাষা হয়েছে বহু-চর্চিত ও পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু চলিত ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করেছেন মাত্র দু'জন লেখক—প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর। তাই তাঁদের

লেখনীতে সাধুভাষার যে উৎকর্ষ দেখা গেছে, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের ভাষায় তা' আশা করা যায় না।

আমাদের আলোচ্য লেখক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের কর্মগত এবং মর্মগত কোন মিল না থাকলেও, ভাষাশিল্পী হিসেবে যথেষ্ট মিল আছে। কালগতভাবে এই দু'জন স্বামিজীর পূর্বসূরী। তাই এঁদের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যও জানা প্রয়োজন।

কেরীর কথোপকথন-এর ভাষা সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয় নি। তাই সে ভাষার ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এদিক থেকে প্যারীচাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি শুধু প্রথম চলিত গদ্যের রূপকারই নন, প্রথম বাংলা উপন্যাস রচয়িতাও বটে।

প্যারীচাঁদের প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকার পাতাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মুখবন্ধে এই পত্রিকার আদর্শ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই"। এর থেকে বোঝা যায় যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই প্যারীচাঁদ চলিত বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভাষাশিল্পী ছিলেন না। তাই কথ্যভাষাকে আশ্রয় করলেও সাধু ভাষার ঠাট একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যেকথা বলেছেন, তাকেই আমরা প্যারীচাঁদের ভাষা সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় বলে গ্রহণ করতে পারি। "...উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল সকল সময় পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাংলাদেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংলা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ"। এই মন্তব্যের দ্বারাই সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র চলিত ভাষাকে আমাদের সাহিত্যে স্বীকৃতি দিলেন।

ভাষাশিল্পী হিসেবে প্যারীচাঁদের অক্ষমতা অনেক পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে কালীপ্রসন্নের রচনায়। বিশুদ্ধ চলিত রীতি বা কলকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষাকে কালীপ্রসন্ন তাঁর লেখনীতে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বানান পদ্ধতির মধ্যেও চলিত উচ্চারণের ঢংটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন যত

বড় ভাষাকার, তার চেয়ে বড় জীবনরসিক। তাই জীবন-সমালোচনায় তিনি তাঁর ভাষাকে একটা স্বতন্ত্র আর্ট হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিতে পারেন নি। জীবনের অবিকৃত রূপটি তুলে ধরবার ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর ভাষারূপটি বিকৃতই রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা-শূন্য"। অর্থাৎ অসংলগ্ন, অশ্লীল এবং অপবিত্র বলে বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষাকে নাকচ করে দিতে চেয়েছেন। কালীপ্রসন্নের এই অপরিণত ভাষা প্রায় ৩৭ বছর পরে এই রীতির পরবর্তী লেখক বিবেকানন্দের হাতে কতখানি শিল্প-সৌকর্য লাভ করেছে, এখন তাই আমাদের বিবেচ্য।

(৪)

শিল্প শিল্পী-মনেরই সচেতন ও অবচেতন প্রকাশ। সৃষ্টি হয় শিল্পীর সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে। অভ্যাসে এবং অনুশীলনে হয়ত তার বাইরের চাকচিক্য বাড়ে, রূপ হয় অপরূপ, কিন্তু যে পরশমণির স্পর্শে তা সোনা হয়ে ওঠে, সেটি হল শিল্পীর সংবেদনা। তাই স্বভাবশিল্পীর দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নয়।

শিল্পীর সঙ্গে কর্মীর একটা আপাত-বিরোধ আছে। শিল্পী বাস করেন নিছক সৌন্দর্যের জগতে, আর কর্মী বাস করেন প্রয়োজনের জগতে। কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য এক। তাই মহৎ কর্মীকে মহৎ শিল্পীও বলা চলে। স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থেই শিল্পী এবং স্বভাবশিল্পী। স্বল্প-পরিসর কর্মময় জীবনে ভাষা বা সাহিত্য-চর্চার বিশেষ অবকাশ তিনি পান নি, কিন্তু তাঁর শৈল্পিক অন্তর কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়তই সাধনা করে চলেছিল। তাই কর্মী যখন শিল্পে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন অনায়াসেই তা' হল সুন্দর—সম্পূর্ণাঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকাল মাত্র উনচল্লিশ বৎসর। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ তিনটি বৎসর তিনি কেবলমাত্র লিখন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বামিজীর মৌলিক গদ্য রচনা এবং এ সম্বন্ধে প্রাপ্ত সন তারিখ ঐ তিনটি বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

লেখকের মৌলিক গদ্য রচনার বই মোট চারটি,—'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এই চারটি বইয়ের রচনাংশই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে উদ্বোধন পত্রিকায়। উদ্বোধন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয় ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামিজী প্রধানত উদ্বোধন পত্রিকার জন্যই এইগুলি লিখেছেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি এদেশে ছিলেন না। স্বামিজী

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁর কিছু রচনা জাহাজে অথবা প্রবাসকালে লেখা। ভ্রমণ শেষ করে তিনি বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। সন-তারিখ মিলিয়ে দেখা যায় যে, এই ১৮ মাসে তিনি রচনা করেছেন 'বর্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক' এবং 'ভাববার কথা'-র কোন কোন প্রবন্ধ। সুতরাং স্বদেশে ফেরবার পর আর মাত্র একটি বই লিখেছেন, সেটি হল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, স্বামিজীর প্রথম মৌলিক গদ্য-রচনা সাধু-ভাষাতেই। অন্ততঃ ঐ চারটি বইয়ের পরিসরে আলোচনাকে সীমিত করলে এই কথাই বলতে হয়। ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি সম্ভবত স্বামিজীর প্রথম রচনা। কিন্তু ঐ লেখাটি উদ্বোধন পত্রিকার বহির্ভূত। এদিক থেকে তাঁর প্রথম রচনা ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ-এ প্রকাশিত উদ্বোধন পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার প্রস্তাবনাটি। এই লেখাটির রচনাভঙ্গীর সংগে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের রচনাভঙ্গীর যথেষ্ট মিল আছে এবং তা' থাকাই স্বাভাবিক। কারণ উদ্বোধন পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'বর্তমান ভারত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই দুটি রচনার কাল-পরিধি মাত্র কয়েকটি মাস।

উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনা অর্থাৎ যেটি পরে 'ভাববার কথা' বইতে 'বর্তমান সমস্যা' নামে সংকলিত হয়েছে, আর 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি, একই দৃষ্টিভংগীতে বিচার্য। এইগুলিই স্বামিজীর প্রথম রচনা। তাই নিজস্ব কোন লিখনশৈলী তিনি তখনো ঠিক করে উঠতে পারেন নি। এবং এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হয়েছে; অর্থাৎ তিনি বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। একটু উদ্ধৃতি দিলেই আমার কথা স্পষ্ট হবে: "মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি"—(বর্তমান সমস্যা: ভাববার কথা)।

"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে
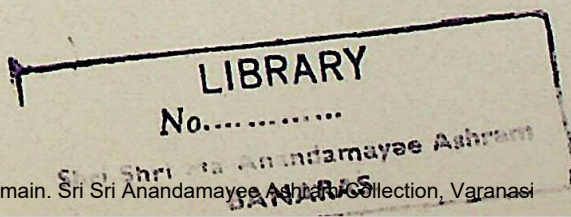
সহানুভূতিযোগে তাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেক দিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরে সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতা-রাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়"—(বর্তমান ভারত)।

শুধু বিশুদ্ধ সাধুভাষা এবং বঙ্কিমী বাচনভংগী নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় যে একটা সঞ্জীবনী শক্তি ছিল, এ লেখাতেও তা আছে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের মত তীব্র যুক্তিনিষ্ঠা, জাতিপ্রেম ও ভাবাবেগ নিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদককে লেখা স্বামিজীর একটি চিঠি আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঐ চিঠিতে স্বামিজী লিখেছেন: "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?...... স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চা'ল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ"—(বাংলা ভাষা : ভাববার কথা)।

'পরিব্রাজক' বইটি স্বামিজীর দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণের কাহিনী। বইটির অধিকাংশই জাহাজে ভ্রমণকালে এবং প্রবাসে রচিত। কিন্তু জাহাজ-ভ্রমণের সূচনাকালে স্বামিজী যে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এ-কথা আগেই বলেছি। তার নজীরও বিরল নয়। পরিব্রাজকের দশম সংস্করণের ১৩ পৃষ্ঠায় স্বামিজী লিখেছেন: "যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু—ভায়া 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন"! 'তু—ভায়া'-র তাগাদা যে স্বামিজী অগ্রাহ্য

করতে পারেন নি, এটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ সংগেই স্বামিজী চলতি ভাষায় 'পরিব্রাজক' বইটি রচনা শুরু করেন। সুতরাং এই সময়েই ভাষারীতি সম্বন্ধে স্বামিজী তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ও পথ স্থির করেন। সম্ভবত 'বর্তমান ভারত' রচনাকালে ঐ ভাষার দুর্বলতা এবং অনুপোযোগিতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তারই সার্থক প্রতিক্রিয়া 'পরিব্রাজক' বইটির রচনাশৈলী ও উপরে উদ্ধৃত চিঠিটির অংশ-বিশেষ।

"জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্চে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙ্গলা দেশ। বাঙ্গলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত। কেউ বলেন সোঁদরবন পূর্বে গ্রাম-নগরময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও-কথা মানতে চায় না"—(পরিব্রাজক)।

অন্বয়ের দিক থেকে এ একেবারে খাঁটি চলতি ভাষা। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বেরোয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। তার পরের বছর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। এর প্রায় ৩৬ বছর বাদে স্বামিজী পরিব্রাজক বইটি লেখেন। সুতরাং এ বইটি রচনাকালে স্বামিজী যে কালী-প্রসন্নের ঐ একখানি মাত্র বই ও তাঁর আগের লেখক প্যারীচাঁদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন নি, এ কথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। তাছাড়া তখন ছিল সাধুভাষার যুগ। কিশোর নরেন্দ্রনাথকে ছাত্রাবস্থায় পড়তে হয়েছিল অক্ষয় কুমার দত্তের চারুপাঠ, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী ও ঐ জাতীয় অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক। সুতরাং এই চলতি ভাষায় বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য প্রকাশের চিন্তা যে তাঁর নিজস্ব, এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও চলতি ভাষার বিবর্তনগত যে উৎকর্ষ আশা করা যায়, তা তাঁর হাতে ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি স্বভাবশিল্পীর মতোই প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের ভাষার দুর্বলতাকে কাটিয়ে, তাকে একটা সহজ স্বাভাবিক ও সংস্কৃত রূপ দিতে পেরেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা বিস্তৃততর পর্যায়ে নানারকম ভাবে হতে পারে। কিন্তু এখানে তার অবকাশ কম। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দই তাঁর প্রবর্তিত চলতি গদ্যরীতির শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রমাণস্বরূপ একটু নিদর্শন এখানে তুলে দেওয়া গেল :

"এবার সব চুপ্—নোড়ো-চোড়ো না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ, বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্ চুপ্—এইবার চিৎ হ'ল—ঐ যে

আড়ে গিল্‌ছে ; চুপ্—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' (অর্থাৎ হাঙ্গর) অবসর-ক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ ক'রে যেমন চলে যাবে, অমনি প'ড়লো টান ! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি !! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান—কাছি ধ'রে দে টান। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর ! বাপ্ কি মুখ। ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে ! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড় —টান। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিশ-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আবার টান—কি ভারি হে ? ও মা, ও কি ? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কি ? ও যে—নাড়ি-ভুঁড়ি। নিজের ভারে নিজের নাড়িভুঁড়ি বেরল যে ! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক ; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে ! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো ; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ্ ! বাবা, কি হাঙ্গর ! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর প'ড়লো"—(পরিব্রাজক)।

নাটকে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া বোঝানো হয়। কিন্তু এখানে এক আধারে মিশেছে সংলাপ, ক্রিয়া ও বর্ণনা। চলিত ভাষার এই যাদুশক্তি একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছেন।

স্বামিজীর পরবর্তী রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থটি। 'পরিব্রাজক' রচনার পর চলিত ভাষার শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই তিনি এই গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সুতরাং 'পরিব্রাজক'-এর ভাষারীতি এ বইতেও দেখা যায়। কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নানান চিন্তা-সমন্বিত প্রবন্ধের বই। আর 'পরিব্রাজক' সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী। সুতরাং 'পরিব্রাজক'-এর ভাষা ও 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য'-এর ভাষায় পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও স্বামিজী অসামান্য শক্তির পরীক্ষা দিয়েছেন। 'পরিব্রাজক'-এ যে চলিত গদ্য রীতির মান তুলে ধরে ধরেছেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইতে তার বিন্দুমাত্র অপকর্ষ ঘটে নি। যেমন—"আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে ? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন ক'রে হোক্ সমুদ্রে যাবেই দুদিন আগে বা

পরে, ছুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় তু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ ক'রে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়" —(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।

স্বামিজী এই বিশেষ রীতিতে তৎসমের চেয়ে বেশীমাত্রায় তদ্ভব ও দেশী শব্দের ব্যবহার, চলতি বাংলা ইডিয়মের বহুল প্রয়োগ, কলকাতা-অঞ্চলের কথ্যভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ গঠন ও নতুন অন্বয় সৃষ্টি করে ভাষাকে শিল্পে উত্তীর্ণ করেছেন। এ ছাড়া, ইংরিজী ভাষাচর্চার একটা প্রভাব তাঁর বাংলা-গদ্যের বহু জায়গাতেই প্রকট। ইংরিজী ভাষারীতিতে বিশেষণ ব্যবহার, বাক্যাংশ (clause) গঠন ও বাগ্‌বিধির আক্ষরিক অনুবাদ তাঁর ভাষাতে বিরল নয়। কৌতূহলী পাঠক স্বামিজীর রচনা থেকে এগুলির উদাহরণ খুঁজে নিতে পারেন।

(৫)

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর ১২ বছর পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'। এই পত্রিকাটি বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। শুধু ভাবে নয়, সাহিত্যের বাহন ভাষাতেও প্রমথ চৌধুরী নতুন আন্দোলনের ঝড় তুলেছিলেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। কারণ প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন ও বিবেকানন্দের রচনা সত্ত্বেও চলিত ভাষা তখনো পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদা পায় নি। প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই তাকে পরবর্তীকালে সাহিত্য-স্বীকৃতি দিয়েছে ও সব রকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তুলেছে।

চলিত ভাষার এই নব বিবর্তনের উৎস কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে। কালীপ্রসন্ন ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই খাঁটি কলকাতার লোক এবং কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাই ছিল তাঁদের চলিত ভাষার ভিত্তি। এ সম্পর্কে স্বামিজী লিখেছেন: "বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।......যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাংলা দেশের ভাষা হ'য়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন"—(বাংলা ভাষা: ভাববার কথা)।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরী মূলত কৃষ্ণনগরীয় হলেও কলকাতারই লোক এবং রবীন্দ্রনাথও তাই। এই দুজন লেখকের চলিত ভাষার উৎস সাধু ভাষা। অর্থাৎ সাধু ভাষারই একটা কৃত্রিম কথ্য রূপ তাঁরা তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলেন চলিত ভাষা নামে। এই রীতিটিই ইদানীংকালে বহু ব্যবহৃত ও অনুশীলিত হয়েছে। এই রীতির উৎকর্ষ কিভাবে কতদূর হয়েছে, তা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু এইটুকুই এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে, চলিত ভাষার দুটি উৎস বা ধারা। একটি কলকাতা অঞ্চলের অবিকৃত কথ্য ভাষা, অপরটি সাধু ভাষার কৃত্রিম কথ্য রূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ চলিত ভাষার যে রীতির লেখক, সেই রীতিটি তাঁর পরে আর অনুসৃত হয় নি। সুতরাং এই ভাষার কতদূর সম্ভাবনা ছিল বা আছে, তা এখানে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, তাঁর হাতে এই ভাষার অসামান্য উৎকর্ষ দেখা গেছে। নিছক কালগত বিবর্তনে নয়, অসাধারণ শিল্প-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশেই তিনি স্বল্পায়ু জীবনের শেষ তিনটি বছরে বাংলা ভাষায় এক বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।
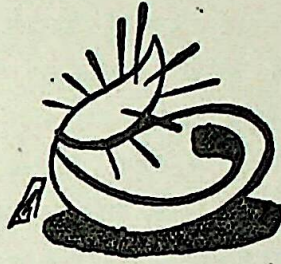
। ত্রিংশ অবদান ।

॥ স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' ॥

নানাদিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দী এক গৌরবময় নব জাগরণের যুগ। এই নব জাগরণের স্বরূপ-লক্ষণ সে যুগের সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যেও প্রতিফলিত। এ যুগে জাতির আত্মবিস্মৃতি অপসারিত হইয়া এক নবতর চেতনা সুরু হয় বাঙালীর ধর্মে ও মানস জীবনে, নানা দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে। বাংলার পত্র-সাহিত্যও এ যুগেই একটি পরিণতরূপ লাভ করে। অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে পত্র-চর্চার রীতি প্রচলিত ছিল, বররুচির 'পত্র কৌমুদী'-ই তাহার প্রমাণ। সাহিত্যের গবেষকগণ গদ্য সাহিত্যের উৎস সন্ধানে যাত্রা করিয়া আবিষ্কার করেন যে, ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোমরাজ চুকাম্ ফা স্বর্গদেবকে লিখিত পত্রখানিই বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম পত্র-চর্চার নিদর্শন। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সমস্ত মনীষীদের পত্র-চর্চা পত্র-সাহিত্যের ক্ষেত্র সমৃদ্ধতর করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পত্রাবলীও উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় তাঁহার লিখিত পত্রের সংখ্যা ৫৫২ খানি। অবশ্য তাঁহার লিখিত পত্রাবলী ইংরাজীতেই অধিক। কিন্তু বাংলাতেও সাধু ও কথ্য ভাষায় লিখিত পত্রগুলির গদ্য ভঙ্গীও অপূর্ব। তাঁহার প্রতিটি পত্রে আত্মপ্রত্যয়ের সুর সুস্পষ্ট। সে ভাষা অনন্যসাধারণ, সে শুধু স্বামিজীর ব্যক্তিত্বেরই বাহন। স্বামিজীর এই পত্রগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্রাজক বেশে পরিভ্রমণ অবস্থায় লিখিত পত্রগুলি (১৮৮৬-৯৩ জুলাই)।

এগুলির কয়েকখানি বাদ দিলে অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণের পরম হিতৈষী-সুহৃদ্ কাশীর বিদগ্ধ জমিদার শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, সমসাময়িক সমাজ ও জাতির পরিচয়, সংস্কৃতির রূপ ইত্যাদি এই পত্রগুলির মুখ্য বিষয়-বস্তু। এ-ধরণের রচনা-রীতির ভাষার সৌকর্য বাদ দিলেও একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে, যাহা সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস-রচনার পক্ষে অপরিহার্য। আমেরিকা যাত্রার পথে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই, ইয়োকোহামার ওরিয়েণ্টাল হোটেল হইতে তাঁহার মান্দ্রাজী বন্ধুবর্গকে লিখিত পত্র-খানিই ইহার বিশেষ সাক্ষ্যবহ। পত্রখানিতে পিনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংকং, নাগাসাকি, কোবি ও জাপানের অধিবাসী, তাহাদের ধর্ম, সমাজ, শিল্প ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি নিখুঁতচিত্রের তথ্যপূর্ণ বর্ণনা পাই আর সেই সঙ্গে পাই একজন স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর পৌরষদৃপ্ত আহ্বান, দেশের জন্য, জাতির জন্য ও জন্মভূমির জন্য। তিনি লিখিতেছেন: "এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর ক'রে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।...এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মান্দ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে"?

পরবর্তীকালে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগষ্ট আমেরিকায় পৌছিয়াই ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ, মাসাচুসেটস্ হইতে আলাসিঙ্গাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহাতে পরিস্ফুট তাঁহার তৎকালীন দোলাচল মানসিক বৃত্তির একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। তিনি লিখিতেছেন: "এখানে আমার ভয়ানক খরচ হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে আমার ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে।

এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। * * এক্ষণে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই। * * * আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!! এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। * * এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বল দাঁড়াইবে ৬০।৭০ পাউণ্ড। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। * * * আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, জানি না। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পারো, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও।

আমেরিকার ন্যায় ঐশ্বর্যশালিনী দেশে নিঃসম্বল এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর অনাহার ও বিদ্রূপ-লাঞ্ছনার এ এক করুণ কাহিনী। প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ পত্রগুলিতে স্বামিজীর মানসিক দ্বন্দ্বের এরূপ একটি সুর উদ্ঘাটিত।

আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামিজীর বিজয় গৌরব ঘোষিত হইবার পর যে পত্রগুলি তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও মান্দ্রাজী বন্ধুগণকে লিখিয়াছেন সেগুলিই তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত পত্রাবলী। এজাতীয় পত্রগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের মনের মুখরতা ও নানাচারী অভিব্যক্তির ইঙ্গিতবহ, কিছুটা দ্বন্দ্বমুক্ত ও সৃষ্টিধর্মী। এসম্বন্ধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর চিকাগো হইতে পুনরায় আলাসিঙ্গাকে লিখিত একখানি পত্রে দেখি: "আমার এক মুহূর্তের অবিশ্বাস ও দুর্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পাইয়াছ তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। * * * বস্টনের নিকটবর্তী এক গ্রামে ডক্টর রাইটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার প্রতি অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন— * * 'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' (Art Palace) নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। * * * সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল;

৩২

তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। * * * ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। * * যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। * * * টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন: "মূকং করোতি বাচালং"। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতেই আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। * * অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। * * আমার পোশাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ শত পাউণ্ড আছে। আর আমার বাড়ী ভাড়া বা খাইখরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছা করিলেই এই শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ীতে আমি থাকিতে পারি"।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের ভাবী জীবনের যে উজ্জ্বল চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটি শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান", উপরি উক্ত পত্রখানি সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতার ইতিহাস। আবার এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পত্রগুলিতেই স্বামিজীর নব, নব অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আত্মার সাধনা, আত্মার প্রসার, তার সাধনবেগ ও অপরিসীম পৌরুষ, স্বদেশপ্রেম এবং অপার্থিব মানবপ্রীতির এক আশ্চর্য প্রতিফলন দেখিতে পাই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতাকে লিখিত এক পত্র-বিচারে দেখা যায় উক্ত ভাবধারাগুলির এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত:

"শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারক দা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও, আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খোলে তাই চেষ্টা কর। * *

পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর। পারো কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া? * * * উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গপ্প-মারা, ঘণ্টা-নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, * * * দেখি বাঙালীর ধর্ম কতদূর গড়ায়। * * * কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে? Intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও। * * * সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেক্‌চার (বক্তৃতা) তো কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো, তোর পেটে এতও ছিল!!' * * *

সমাজকে, জগৎকে, electrify (বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাষ্টার, রামবাবু করুন গে। তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought-currents (ভাবপ্রবাহ-বিস্তার)। * * * Character formed (চরিত্র গঠিত) হ'য়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ্দ—বুঝলে? গৌর-মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে-কোন রকমে হোক)। * * গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? একএক জনে একশত মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থুল বাঁধাতে হবে, হুঁকোফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মতো চক্র মারো দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মায় মেয়ে-মদ্দ, যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা Spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। * * * এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার

ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। * * তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও), * * নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। * * * যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? * * * যে যে এই চিঠি পড়বে তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। * * * আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন—তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন"।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের পত্রগুলিতেই লিপিবদ্ধ স্বামিজীর জীবনের উন্মেষ পর্বের ইতিহাস (১৮৮৬—১৮৯৩)। আর সমগ্র দ্বিতীয় পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায়ের পত্রাবলীর কিয়দংশ তাঁহার জীবনের বিকাশ পর্বের সাক্ষ্যবহ (১৮৯৩-৯৬)। ইহার পটভূমিকা আমেরিকা, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "কালে বটবৃক্ষের মত বর্দ্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দান করবি" তাহারই ফলশ্রুতি। বস্তুত তৃতীয় পর্যায়ের পত্রগুলি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডবাসী বন্ধুবান্ধব ও যে সকল মার্কিন পরিবারের সহৃদয় ব্যবহারে স্বামিজী মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাদিগকে লিখিত।

বিশেষ করিয়া ৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউস্থ হেল ভগিনীগণকে (মিস্ মেরী হেল, হ্যারিয়েট হেল, ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি প্রভৃতি) এবং পরম হিতৈষিণী মার্কিন মহিলা জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লিওডকে লিখিত পত্রগুলিই উল্লেখযোগ্য। এই পত্রগুলি সাহিত্যগুণান্বিত, শুধু লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহকই নহে, পরন্তু হৃদয়ের গভীরস্পর্শ বিজড়িত। এই কারণে এগুলি অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ ও মনন-ধর্মী এবং অন্তহীন নীল আকাশের ন্যায় স্নিগ্ধ ও অতলস্পর্শী।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে নিউ ইয়র্ক হইতে ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত পত্রখানিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি লিখিতেছেন:

"প্রিয় ভগিনি,

* * ১৩ ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে কথাটি বলো না যেন। কোটের খরচ পড়বে ৩০ ডলার। খাবার-দাবার ঠিকই মিলছে ...এবং যথেষ্ট টাকা। আশা হয়, আগামী বক্তৃতার পরেই অবিলম্বে ব্যাঙ্কে কিছু রাখতে পারব। * * যা হোক, ১৯ তারিখ পার হলেই এক লাফে বস্টন থেকে চিকাগোয়, তারপরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেব, আর টানা বিশ্রাম—দু-তিন সপ্তাহের। তখন গ্যাঁট হয়ে বসে শুধু গল্প করব আর পাইপ টানব। * * হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের. ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে যাব। বস্টনে তিনটি বক্তৃতা এবং হার্ভার্ডে তিনটি—সকলেরই ব্যবস্থা করেছেন মিসেস্ ব্রীড। * * সুতরাং চিকাগোর পথে আমি আর একবার নিউ ইয়র্কে আসব—কিছু কড়া বাণী শুনিয়ে টাকাকড়ি পকেটস্থ ক'রে সাঁ ক'রে চিকাগোয় চলে যাব।

চিকাগোয় পাওয়া যায় না এমন কিছু যদি নিউ ইয়র্ক বা বস্টন থেকে তোমার দরকার থাকে, সত্বর লিখবে। আমার এখন পকেট-ভর্তি ডলার। যা তুমি চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে—কখনও মনে ক'রো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাই-ই। পৃথিবীতে একটি জিনিসই আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।

তোমার স্নেহময় ভাই
বিবেকানন্দ"

কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর স্নেহের স্পর্শ বিজড়িত উক্ত পত্রখানি। যাঁহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত দূরীভূত করিয়াছে এ-হেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের পক্ষেই এ-পত্র লেখা সম্ভব।

তৃতীয় পর্যায়ের শেষের দিকের পত্রগুলিতে (১৮৯৭-১৯০২) স্বামিজীর একটি কেন্দ্রনিষ্ঠ মনের গাঢ়তা পরিস্ফুট এবং এগুলিই জীবন ও জগৎরহস্য উন্মোচনের পরিচায়ক। জীবনের পরিণতি পর্বের ইতিহাস।

"মা নরেন্দ্রকে তাঁহার কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন। সে যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সংকল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে"। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যৎবাণী আক্ষরিকভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া হইতে জোসেফাইন্ ম্যাক্লিওডকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানির ছত্রে ছত্রে :

"প্রিয় জো,

* * আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্ছি। লড়াইয়ে হার জিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলি-পাটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালকভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলেছে!—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন: "মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক্ (সংসারের ভালমন্দ সংসারীরা দেখুক্), তুই (ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!" * * * হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম-অনন্ত শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তি ভঙ্গ করছে না। আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি, এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশী, জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরাণো "বিবেকানন্দ" কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না! শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

তুমি বুঝতে পারছ কেন আমি অভেদানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না? * * * তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই

জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিয়েছি।

উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্য-সম্পদ-শালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সবপ্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, কত শান্ত!—আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়। প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। এর আগে আমার কর্মের ভিতর নাম-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্ব-স্পৃহা আসত। এখন সে-সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই, মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।

আহা, কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা কিছু দেখছি, শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে! মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি ভালবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা ঠিক যেন সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটা কি সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না।—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব! যা কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও

সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেন না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সব চেয়ে উপাদেয় বলে শরীরটার প্রতি এর আগে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে!... ইতি

তোমারই চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ"

নেপোলিয়ন, ভল্টেয়ার, রুশো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পত্র-সাহিত্যিকদের, এমন কি রবীন্দ্রনাথের পত্রেও মানসিক বিকাশের এরূপ একটি স্তর উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এ-জন্যই তিনি সকল লোকের, সকল কালের উর্ধ্বে অবস্থিত এবং জগৎপূজ্য। এই পত্রখানিই স্বামিজীর জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণের পরিণতি। তাঁহার দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশেষ ভবিষ্যৎ বাণী "আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে তুই যাইবি কোথায়?" এই ঋণ পরিশোধের শেষ উত্তর স্বামিজী ১৯০০, অগষ্টের পত্রে যেভাবে দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য গুরুর কুশলী শিষ্যের উপযুক্ত উত্তরই বটে। উপসংহারে সেটুকুই উপহার দিলাম:

"হরি ভাই,

...এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে, কারও একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majority-র (অধিকাংশের) হুকুমে হবে...সেই মত ট্রাস্ট ডীড্ করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি।...এ বৃত্তান্ত ঐ পর্যন্ত। এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি বস্। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি। সে-কথা তোমায় কী বলব?...দলিল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কত্তাত্তির! কত্তাত্তি ছাড়া বাকী সব সই করে দিয়েছি!...গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কত্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন। এ তাঁর কাজ।...প্রাণ ধরে সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব সে আমার কাজ।...আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম। গুরুমহারাজের ঋণ* প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবীদাওয়া নেই।...তোমরা যা করছ, ও গুরুমহারাজের কাজ, করে যাও।... ইতি

নরেন্দ্র"

সর্বকালের, সর্বদেশের একজন লোকাতীত পুরুষের একটি মহান জীবনের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস—এই 'পত্রাবলী'।

---

* এই প্রসঙ্গে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে, শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্রখানি দ্রষ্টব্য।
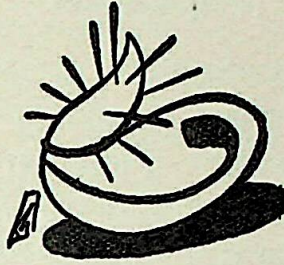
॥ একত্রিংশ অবদান ॥

॥ সঙ্গীতে স্বামিজী ॥

স্বামিজীর পুণ্য জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর কীর্তিকথা নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। স্বদেশ-জননীর এই মহান সন্তান জগতে এবং জাতীয় জীবনে কি কি অবদান রেখে গেছেন, তাঁর আবির্ভাবে দেশ কি লাভ করেছে, আজ তার নব-মূল্যায়ন হচ্ছে দেশের সর্বত্র। তিনি শুধু ধর্মনায়ক ছিলেন না, ছিলেন জাতির জাগরণযজ্ঞের এক মহান ঋত্বিক। দেশ-মানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কর্মবীর, স্বদেশের কল্যাণব্রতের চিন্তানায়ক।

উক্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁর কার্যাবলী এবং অবদানও কিছু তাঁর ব্যক্তিত্বের সমগ্র প্রকাশ বা সম্পূর্ণ রূপ নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন বিরাট, তেমনি বহুমুখী। তাঁর চরিত্রের একদিকে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস, ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মচেতনা, দেশপ্রেম ও সেবাব্রত, অন্যদিকে অধ্যয়ন এবং চিত্রশিল্পাদিতে গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য এবং রচনাশক্তি, সঙ্গীতচর্চা এবং সঙ্গীতচিন্তা; অর্থাৎ তাঁর শিল্পীসত্তা। এই দুই অংশের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং তারা তাঁর চরিত্রের পরিপূরক। দুয়ের সমন্বয়ে সুসমঞ্জস তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এবং উক্ত বিবিধ গুণাবলীর সম্মিলনেই স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামিজীর শিল্পীসত্তার এক পরমপ্রকাশ হল তাঁর সঙ্গীত-জীবন—বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনে সঙ্গীত এমন সত্য ছিল যে, কোন সময়ে তাঁর জীবন থেকে সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সঙ্গীত তাঁর সমগ্র সত্তার সঙ্গে কেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত ছিল, সে বিষয়ে পরে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা হবে।

লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী স্বামিজী সঙ্গীতজ্ঞরূপেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একথা সুপরিচিত যে, স্বামিজী একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজ্ঞরূপে এই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। কারণ, সঙ্গীত-বিষয়েও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। গায়করূপে তাঁর খ্যাতি সমধিক হলেও তিনি ছিলেন একাধারে মৃদঙ্গবাদক, গীত-রচয়িতা, সঙ্গীতের তত্ত্বদর্শী লেখক এবং সঙ্গীত-বিজ্ঞানের ভাষ্যকার। একাধিক গুণী কলাবতের অধীনে রীতিমত শিক্ষালাভ করে তিনি সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। সঙ্গীত-বিষয়ে তিনি অশিক্ষিত পটু ছিলেন না। ছিলেন সহজাত প্রতিভার অধিকারী এবং পদ্ধতিগত শিক্ষাপ্রাপ্ত।

॥ উত্তরাধিকার ও রীতিমত শিক্ষা ॥

স্বামিজী জন্মসূত্রে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা লাভ করেন। উত্তর-কলকাতার শিমুলিয়ায় যে বিখ্যাত ও বনিয়াদী দত্তবংশে তাঁর জন্ম, সেই পরিবার শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা ও উদার চিন্তাধার জন্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সেখানে সঙ্গীতেরও চর্চা বিদ্যমান ছিল।

স্বামিজীর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে যান, একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথ এবং পত্নীকে পরিত্যাগ করে। দুর্গাপ্রসাদ আর সংসারে প্রবেশ করেন নি। তাঁর সঙ্গে পৌত্র নরেন্দ্রনাথের (স্বামিজীর পূর্বাশ্রমের নাম) আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। দুর্গাপ্রসাদের সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে, তিনি গান গাইতেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর।

নরেন্দ্রনাথের পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাড্‌ভোকেট বিশ্বনাথ দত্ত বিশেষ সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। কৃতী আইনজীবি হলেও তিনি অবসর যাপন করতেন কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিতে এবং কলাবতদের সঙ্গীত উপভোগে। তিনি বিশেষ সামাজিক, মজলিসী ও সৌখীনপ্রকৃতির ছিলেন এবং রাগসঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর একান্ত অনুরাগ। তিনি শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন না, এক সময়ে উস্তাদের অধীনে সঙ্গীতশিক্ষাও করেছিলেন, একথা স্বামিজীর দ্বিতীয় অনুজ মহেন্দ্রনাথের বিবৃতি থেকে জানা যায়। উত্তর-জীবনে বিশ্বনাথের পক্ষে সঙ্গীতচর্চা করা আর সম্ভব না হলেও, তিনি আজীবন ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী। তাঁর গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতি সপ্তায় শনি ও রবিবার সঙ্গীতের আসর বসত এবং সেখানে কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞগণ সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর পিতার কাছেই আরম্ভ হয়েছিল। সপরিবারে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করবার সময় রায়পুরে বিশ্বনাথ

দত্ত মহাশয় পুত্রকে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ দেন। তারপরে কলকাতায় উপযুক্ত সঙ্গীতাচার্যের অধীনে নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান করবার সময়, তিনি ছিলেন কিশোর বালক এবং তখন তাঁর বয়স ১৩৷১৪ বছর। কিন্তু তারও অনেক আগে, প্রায় শিশুকাল থেকে নরেন্দ্রনাথের সুকণ্ঠ এবং শোনা গান অনুকরণ করে গাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। শিমুলিয়া দত্ত বাড়ীর ঠাকুর-দালানে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়বার সময়ে মকর-সংক্রান্তির দিন গঙ্গাবন্দনা গান, গোবিন্দ অধিকারীর ও অন্য একটি যাত্রা শোনবার পর তার গান গাওয়া, বৈষ্ণব ভিখারীদের মুখে শোনা গান ইত্যাদি নরেন্দ্রনাথের শিশু-বয়সের গানের কথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী শ্যামানন্দ প্রভৃতি তাঁর জীবনী-রচয়িতারা উল্লেখ করেছেন। এই সব বিবরণ থেকে জানা যায় বাল্যকাল থেকে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে আসক্তি ও নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল।

তারপর রায়পুরে অবস্থানকালে পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত এবং পরে কলকাতায় এসে কলাবতের অধীনে রীতিমত শিক্ষালাভ। শেষোক্ত বিষয়ের বিবরণ দেবার তাঁর উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানাবার আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "মাতা শ্রদ্ধেয়া ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্টি ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রার গান তিনি আপনমনে বেশ গাহিতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানাদিক হইতে শক্তি আসায় স্বামিজীর সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল"।

যতদূর জানা যায়, (১৮৭৯ খ্রীঃ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে) প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর নরেন্দ্রনাথ উস্তাদের অধীনে পদ্ধতিগতভাবে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তার ব্যবস্থা করে' দেন তাঁর পিতা স্বয়ং। পুত্রের সঙ্গে আর একজন জ্ঞাতিরও সঙ্গীতপ্রতিভা লক্ষ্য করে' বিশ্বনাথ তাঁরও একসঙ্গে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে দেন, সঙ্গীতযন্ত্রাদি ক্রয় ও সঙ্গীতশিক্ষকের পারিশ্রমিক বহন করে'। নরেন্দ্রনাথের সেই জ্ঞাতিভ্রাতার নাম অমৃতলাল ওরফে হাবু দত্ত। হাবু দত্ত নরেন্দ্র অপেক্ষা বছর চারেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নরেন্দ্রের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের ভ্রাতা কালিপ্রসাদের পৌত্র। উত্তর-জীবনে হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট ও এস্রাজ-বাদকরূপে স্বনামধন্য এবং দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞরূপে গণ্য হন। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে হাবু দত্তের কাছে অনেকদিন যন্ত্রসঙ্গীতে তালিম পান। হাবু দত্তের বিষয়ে একটি গৌরবের কথা এই যে, য়ুরোপের বহু বিখ্যাত

গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে ১৯১১ খ্রীঃ যখন কলকাতায় আসেন, তখন একদিন বেলুড় মঠে হাবু দত্তের এস্রাজবাদন শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। হাবু দত্ত পরে সঙ্গীত-নায়ক উজীর খাঁর ঘরাণা শিক্ষা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল উস্তাদ বেণীমাধব অধিকারীর অধীনে এবং নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। নরেন্দ্র প্রধানতঃ কণ্ঠসঙ্গীত অবলম্বন করেন। কিন্তু হাবু দত্ত ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতে এবং এস্রাজী কানাইলাল ঢেঁড়ী ও পরে উজীর খাঁকে সঙ্গীতগুরুরূপে লাভ করেন। হাবু দত্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই গৃহে বাস করতেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর সুরেন্দ্রনাথও (তমু বাবু) একজন গুণী যন্ত্রীরূপে পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের যে বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত-সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান হয় (পরে উল্লিখিতব্য) তাঁর সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ক রচনাটিতে যার পরিচয় পাওয়া যায়), তা তাঁর উক্ত দুই যন্ত্রী জ্ঞাতিভ্রাতার একই গৃহে যন্ত্রসঙ্গীত চর্চার ফলে।

নরেন্দ্রনাথের পদ্ধতিগত কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার প্রথম গুরু বেণীমাধব অধিকারী ছিলেন ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য এবং নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের "নল-দময়ন্তী", "দক্ষযজ্ঞ", "চৈতন্যলীলা" প্রভৃতি নাটকের গীতাবলীর সুর-সংযোজক। নরেন্দ্রনাথ উক্ত আহম্মদ খাঁর কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন বলে শোনা যায়। অন্য এক মতে, তিনি ধ্রুপদী জোয়ালাপ্রসাদের কাছেও শিক্ষা-লাভ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষালাভও হয়েছিল। পরে বরানগর মঠে অবস্থানকালে এবং শেষ জীবনে বেলুড় মঠেও অন্যের গানের সঙ্গে তাঁর মৃদঙ্গবাদনের কথা জানা যায়। কিন্তু কার কাছে তিনি পাখোয়াজ শিখেছিলেন, তা সঠিক জানা যায় নি।

প্রখর প্রতিভার অধিকারী নরেন্দ্রনাথ উক্ত গুণীদের কাছে শিক্ষালাভের ফলে কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। উস্তাদের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবনের মধ্যে এবং ফার্স্ট আর্টস্ ক্লাসের কলেজ-ছাত্র অবস্থায় তিনি গীতশিল্পীরূপে সুপরিচিত হ'তে আরম্ভ করেন। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত মহলে, ব্রাহ্মসমাজে, শিমুলিয়া-পল্লী ইত্যাদিতে। তাঁর গানের গুণমুগ্ধ চক্রের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। এমন কি অনেকস্থলে তাঁর প্রধান পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গীতে। উস্তাদদের শিক্ষা তিনি বছর চারেক পেয়েছিলেন।

॥ গায়করূপে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্বে, নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন— প্রথমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সমাজে এবং পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে

তখনই তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল গায়করূপে। হৃদয়গ্রাহী ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীতের জন্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। সেখানে সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে তাঁর গান হত, একথা তাঁর একাধিক জীবনীলেখক উল্লেখ করেছেন। আরো জানা যায় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলা ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের ("সঞ্জীবনী'-সম্পাদক) বিবাহ-অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের "দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিত যদি" গানখানি গেয়েছিলেন (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে)।

উক্ত বছরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে নিতান্ত ঘটনাচক্রে এবং সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ হয়েছিল সঙ্গীত। তাঁদের যোগাযোগের হেতু হন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীশিষ্য ও সেবক। মিত্র মহাশয় সেদিন (১৮৮১ খ্রীঃ, নভেম্বর) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে নিজের বাড়ীতে এনে একটি আনন্দোৎসবের অয়োজন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গান ভালবাসেন বলে সেই অনুষ্ঠানে তাঁকে গান শোনাবার জন্যে নরেন্দ্রনাথকে আনা হয়, অন্য গায়ক না পাওয়ার ফলে। সেখানে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দুটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত—'মন চল নিজ নিকেতনে' (সুরটমল্লার, একতালা) ও 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' (ভীমপলশ্রী, একতালা) শুনিয়েছিলেন। (গান দুখানির রচয়িতা হলেন যথাক্রমে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়)।

সেদিন তাঁর কণ্ঠে ওই গান শুনে এবং গায়ককে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণও করেন। সেদিন থেকে তাঁদের দু'জনের আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত। এমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যোগাযোগে মধ্যস্থতা করেছিল সঙ্গীত। তারপর থেকে তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যায়, তা হল—সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটি থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছু আগে পর্যন্ত তাঁদের দুজনের যতবার দেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে—সঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণবিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতজ্ঞান বিষয়ে একটি কথা বলা উচিত মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভাবে যদি তাঁর জীবনের গতি সন্ন্যাসের পথে যাত্রা না করত, তিনি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ-রূপে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণী বলে প্রতিষ্ঠিত হতেন, সেই তরুণ বয়সে ধ্রুপদাঙ্গের গায়করূপে তিনি এমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গান শুনে শ্রোতারা কতদূর পরিতৃপ্ত

ও অভিভূত হতেন, তাঁর বহু উদাহরণ তাঁর জীবনীগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে, স্থানাভাবে এখানে সেসব উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবসম্মিলনের এক প্রধান যোগসূত্র হল সঙ্গীত। তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎকারের যত দিনের বিবরণ পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগ দিনেই নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি ভালবাসতেন তাঁর কণ্ঠের গান শুনতে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর গান অবশ্যই শুনবেন, এই ছিল যেন রীতি। সেজন্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতেন—তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ বিনা তানপুরায়, সুর সহযোগিতা ভিন্ন কখনো গান গাইতে সম্মত হতেন না,—শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও না। এটি তাঁর ও উস্তাদেরা অধীনে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার ফল।

দক্ষিণেশ্বরে কিংবা বলরাম বসু প্রভৃতির মতো কোন ভক্তের বাড়ীতে, যেখানেই তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয়েছে, গুরুর অনুরোধে তাঁকে গান গাইতে হয়েছে। তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটেছে, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গান শোনাতে বলেন নি, এমন বিবরণ কদাচিৎ পাওয়া যায়। নরেন্দ্রের গান শুধু শোনা নয়, সে গান শোনবার ফলে প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হয়ে যেতেন। তাঁর গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে কতখানি অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, তার বহু দৃষ্টান্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত আছে, এখানে সে সমস্ত বিবরণের পুনরুল্লেখ সম্ভবপর নয়। শুধু একটি দিনের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করি, যা থেকে বোঝা যাবে নরেন্দ্রনাথের গান কি গভীরভাবের উদ্রেক করত। সেদিন (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯, আগষ্ট) তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি (খয়রা তালের) সুললিত কীর্তন শুনিয়েছিলেন—"সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে"। গানখানি বিখ্যাত গীতরচয়িতা পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। নরেন্দ্রনাথের গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে তিনি সেদিন তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে নরেন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সত্যকার গীতশিল্পীর কণ্ঠে শোনা গান ভিন্ন তা করা যায় না"। "শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" থেকে সেই বিবরণের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

"নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন:

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।

* * "আনন্দ অমৃতরূপে" এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারান্দায় চলিয়া গিয়াছেন।...শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ, সকলে তাঁহার দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: 'আগুন জেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল'' ।

এই দুই মহামানবের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক যোগাযোগে গানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বরাবর ছিল। তাঁদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের দিনে অনেক সময় এক বিচিত্র ও অপূর্ব সাঙ্গীতিক পরিবেশের সৃষ্টি হত। নরেন্দ্রের গান শোনবামাত্র অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি হত শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। তাঁর গানে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র সত্তা যেন অনুরণিত হয়ে সাড়া দিত। গান জাগাত গান। সুর ফোটাত সুর। ভাব মেলাত ভাব। নরেন্দ্রের গান শুনে আত্মহারা হয়ে তিনি কখনো কখনো ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গান গাইতে আরম্ভ করতেন।

নরেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধ্রুপদাঙ্গের গায়ক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায় সমস্ত রকম গান শুনিয়েছেন, কখনো নিজের অভিরুচিতে কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং ধ্রুপদাঙ্গের গান ভিন্ন সুরদাস, কবীর, নানক প্রভৃতির ভজন গীতাবলী, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, আগমনী, কীর্তন ইত্যাদি নানা ধরনের গান তিনি গেয়েছেন। কীর্তনে তাঁর আখর প্রয়োগ করে গাইবার দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, প্রণালীবদ্ধ সংকীর্তনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর) তাঁর খোল বাজাবার বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানও তাঁর গাইবার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। যথা, "গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে" (জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল—গুরু নানকের ভজন 'গগনময় থাল রবিচন্দ দীপক বনে'-র বঙ্গীয়করণ), "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" (আলাইয়া, ঝাঁপতাল), "মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ", "দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন" (ধুন, কাওয়ালী), "এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের "দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি" গানখানিও ইতঃপূর্বে নরেন্দ্রনাথের গাইবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত গানই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের অর্থাৎ ২০-২২ বছর কালের রচনা। রবীন্দ্রনাথের গান যে তখনই নরেন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দেড় বছর বয়ঃকনিষ্ঠ) গাইতেন, একথা বিশেষ

ভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষার সৌকুমার্য ও উৎকর্ষতা সম্ভবত নরেন্দ্রনাথকে তাঁর গানের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বরানগর মঠে অবস্থানকালেও তিনি রবীন্দ্রনাথের "আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন" (খট্, ঝাঁপতাল) প্রভৃতি গান গাইতেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ এবং নরেন্দ্রনাথের জীবনেরও একটি পর্বের অবসান হয়।

॥ সন্ন্যাস ও পরিব্রাজক-জীবনে সঙ্গীত ॥

কিন্তু সঙ্গীতচর্চার অবসান স্বামিজীর হল না, কোনদিনই হয় নি। পারিবারিক বিপর্যয় এবং সন্ন্যাসের পথে জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হওয়ায় নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা অবশ্য আর সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে তিনি কখনোই সঙ্গীত-ক্রিয়া থেকে একেবারে বিরত হন নি। তবে যে রাগসঙ্গীত তিনি কলেজ-জীবনে নিয়মিত শিক্ষা করেছিলেন, তা' গাইবার উপযুক্ত পরিবেশ সব সময়ে তাঁর উত্তর জীবনে সম্ভব ছিল না। সেজন্যে রাগসঙ্গীত গাইবার সুযোগ সর্বদা তাঁর হত না, যদিও গান তিনি প্রায় বরাবর, বহু বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও গেয়েছেন, তাঁর পরিব্রাজক ও সন্ন্যাস-জীবনে। গান তাঁর মানস জীবনের ভাব-প্রকাশের বাহন হওয়ায় তিনি গাইতেন বিশেষ ধরনের গান, যা তাঁর তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। কখনো তিনি গাইতেন ধ্রুপদাঙ্গ ও অন্যান্য ব্রহ্মসঙ্গীত, কখনো কীর্তন, কখনো ভজন, কখনো শ্যামাসঙ্গীত, কখনো স্বরচিত গান, কখনো বা গিরীশচন্দ্রের বৈরাগ্যের গান। সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে গিরীশচন্দ্র-রচিত ('বুদ্ধদেব' নাটকের) "জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই" গানখানি তিনি প্রায়শ গাইতেন গভীর অনুভবের সঙ্গে।

উত্তরকালে তাঁর অন্তর্লোক এবং পরিবেশে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটায় রাগ-সঙ্গীত তেমন বেশি গাইতেন না, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু রাগ-সঙ্গীত তিনি যে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি, সেকথার উল্লেখ দেখা যায় তাঁর জীবনের নানা সময়ে। যথা, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে, পরিব্রাজক-জীবনে খেতরীরাজ্যের রাজসভায়, ভগিনী নিবেদিতাকে দীক্ষা দেবার দিন সকালে বেলুড় মঠে, ইত্যাদি। তা' ছাড়া, শেষ জীবনে বেলুড়মঠে অবস্থানকালেও তিনি মাঝে মাঝে ধ্রুপদ গান গাইতেন এবং অন্যের গানের সঙ্গে মৃদঙ্গে সহযোগিতা করতেন জানা যায়।

সন্ন্যাস অবলম্বনের অব্যবহিত পূর্বেও সঙ্গীত তাঁর চিত্ত কতখানি অধিকার করে বর্তমান ছিল, তার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন আছে। তখনো যে তিনি সঙ্গীত-ক্রিয়ায় মাঝে মাঝে মগ্ন হতেন, শুধু তা-ই নয়। সে সময় তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার বিশিষ্ট স্বাক্ষর বহন করে রচিত হয় তাঁর একটি সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ। পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। কিন্তু রচিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তকটির পরিচয় পরে দেওয়া হবে। এখানে আলোচ্য বিষয় হল, সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের সর্বপর্বে স্বামিজীর গান গাইবার প্রসঙ্গ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পিতার আকস্মিক মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে ও অন্তর্জগতে প্রবল দ্বন্দ্ব ও আলোড়নের যুগ। তখন একদিকে পারিবারিক বিপর্যয় রোধ করবার জন্যে সংসারের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও নির্মম জীবনসংগ্রাম; অন্যদিকে নিরন্তর মানসিক আন্দোলন, প্রবল বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের পথে প্রচণ্ড গতিপ্রবণতা। তাঁর এই দ্বিধা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব চলেছিল বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ সন্ন্যাস অবলম্বন করে মঠ-জীবনের সূত্রপাত পর্যন্ত। এই পর্বেও নানা দিনে তাঁর গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়ে তিনি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব-চরিত' প্রভৃতি নাটকের গানগুলি গাইতেন। জয়দেব-প্রণীত 'গীতগোবিন্দ'-এর গান, 'কথামৃত'-গ্রন্থকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর গাইবার কথাও জানা যায়। তাঁর স্বরচিত বিখ্যাত "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" গানখানিও তিনি এই যুগে রচনা ও গান করেন।

তারপর বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা করে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে সেখানে অবস্থানের যুগ। মঠে নরেন্দ্র প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সাধন-ভজন ও কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর ও কালী তপস্বীর প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে সেখানে বিদ্যাচর্চার উদার আবহ সৃষ্ট হল। বরানগর মঠের আর একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গেল সেখানকার সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে। সঙ্গীতচর্চা মঠে নিষিদ্ধ ছিল না, বরং নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। সঙ্গীত ছিল মঠে সাধন-ভজনের অন্যতম অঙ্গ এবং তার পরিবেশ সৃষ্টির মূলে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রভাবে বরানগর মঠের কঠোর ও পরিপূর্ণ ত্যাগের জীবনের মধ্যেও সঙ্গীতচর্চা বিদ্যমান ছিল এবং এখানে শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দ) তিনি সঙ্গীতশিক্ষাও দিয়েছিলেন।

মঠের সন্ন্যাসীরা নিয়মিত গান গাইতেন। ভজন, কীর্তন, ব্রহ্মসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি নানাপ্রকার গান হত। সঙ্গীত-বিষয়ে সকলের

৩৪

এত আগ্রহ ছিল যে, গানের খাতা ছিল এবং সন্ন্যাসীদের প্রিয় গানগুলি লিখিত থাকত গাইবার প্রয়োজনে। নরেন্দ্রনাথ অনেক সময় একক গান গাইতেন এবং তাঁর ধ্রুপদাঙ্গের গান গাইবার উল্লেখও পাওয়া যায়। মিলিত কণ্ঠে বা সদলে কীর্তন গান হত মাঝে মাঝে।

বরানগর মঠ থেকে একবার তিনি (১৮৮৮ খ্রীঃ) পশ্চিমাঞ্চলে যান। সে যাত্রায় বৃন্দাবনের সন্নিকটে হাথ্‌রাস স্টেশনে রেলকর্মচারী শরৎচন্দ্র গুপ্ত তাঁর প্রথম শিষ্য হয়েছিলেন বার বার স্বামিজী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও। এক্ষেত্রে শরৎ গুপ্তের সংসার ত্যাগ করে স্বামিজীর শিষ্য হওয়ার সংকল্প ও সন্ন্যাস গ্রহণের উপলক্ষ হয় স্বামিজীর সঙ্গীত। তিনি হাথ্‌রাস স্টেশনে বসে "মন চল নিজ নিকেতনে" গানখানি গাইবার ফলে উক্ত ঘটনা ঘটবার মনোজ্ঞ বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন ("শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী" গ্রন্থে): "নরেন্দ্রনাথ আপনা-আপনি গান করিতে লাগিলেন, 'সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে' ইত্যাদি। তাঁহার মুখের গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারীর যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল—তাহার আর চাকুরী করা বা বাড়ী ঘরদোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন সকলই তার ছিল; কিন্তু সে তখন যেন অন্য প্রকার হইয়া উঠিল। সংসারের কোন বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।... তারপর গুপ্ত স্থির করলে, কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে"।

তিনি বরানগর মঠে এসে যোগ দেন এবং পরে সুপরিচিত হন স্বামী সদানন্দ নামে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ থেকে পর্যটনে নির্গত হলেন এবং তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের আরম্ভ। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৮৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত বরানগর মঠের কাল। ওই বছর মঠ স্থানান্তরিত হয় আলমবাজারের একটি বাড়িতে, সেজন্যে ১৮৯২ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ করে স্বামিজীর আমেরিকা হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হল আমলবাজার মঠের অস্তিত্ব। স্বামিজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর আর বরানগর মঠে অবস্থান করেন নি এবং আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন আলমবাজার মঠের শেষপর্বে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ক্রমান্বয়ে তিন বছর পরিব্রাজক-জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন স্বামিজীর জীবনে এক যুগান্তকারী অধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে উজ্জীবনের কাল। এই পর্বে একদিকে তাঁর ভারতদর্শন এবং অন্যদিকে আত্মদর্শন ও আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে—যার পরিণতি ও পূর্ণপ্রকাশ

দেখা যায় আমেরিকা ও পরে য়ুরোপে তাঁর ঐতিহাসিক কার্যধারায়। সে প্রসঙ্গ তাঁর জীবনী-পাঠকদের সুবিদিত।

তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে সমগ্রভারত-পরিক্রমার মধ্যেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আছে। এখানে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় না দিয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করা হবে। এই পর্বে, প্রথমে প্রয়াগে তাঁর ভজনাদি গান করবার কথা জানা যায়। তারপর রাজস্থানের খেতরীরাজ্যের সঙ্গীতপ্রিয় রাজা (পরে স্বামিজীর শিষ্য-সেবক) অজিতসিংহের দরবারে স্বামিজী গান করেছিলেন রাগসঙ্গীত। রাজার বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী দরবারী কানাড়া, ইমন্ কল্যাণ ইত্যাদি রাগে ধ্রুপদ গান গেয়েছিলেন। খেতরীর রাজসভাতেই স্বামিজী সেই নর্তকীর মুখে সুরদাসের বিখ্যাত ভজনটি ('প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হাম হায় তিহারো, চাহ তো পার করো') শোনেন এবং পরবর্তীকালে কখনো কখনো তিনি নিজেও গানখানি গাইতেন। তারপর জুনাগড়, মাদ্রাজ প্রভৃতি আরো কয়েক-স্থানে তাঁর গান গাইবার কথা জানতে পারা যায় স্বামিজীর নানা জীবনগ্রন্থ থেকে।

মাদ্রাজ থেকে তাঁর আমেরিকা-যাত্রার ব্যবস্থাদি হয় এবং সেখান থেকে বোম্বাই গিয়ে মাদ্রাজে সমুদ্রযাত্রা করেন আমেরিকার উদ্দেশে। সেখানে চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে স্বামিজীর বিজয়-বৈজয়ন্তীর কথা সর্বাধিক সুপরিচিত। আমেরিকা প্রবাসের পরে তিনি যখন লণ্ডনে বাস করছিলেন, তখনকার দু'একদিনের প্রসঙ্গে স্বামিজীর আপন মনে (বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে' প্রভৃতি) গান গাইবার কথা তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

য়ুরোপ থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর এবং বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্বে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্বামিজী পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। সে যাত্রায়ও তাঁর গান গাইবার কথা জানা যায় শ্রীনগর, মরি প্রভৃতি স্থানে। তার পরের বছর বেলুড় মঠ থেকে হিমালয় অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠা ও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁর সদলে গমনকালেও সঙ্গীত-প্রসঙ্গ আছে। সে বছর বেলুড় মঠে ভগিনী নিবেদিতাকে দীক্ষা দিবার দিন (২৫ মার্চ, ১৮৯৮) স্বামিজী ধ্রুপদাঙ্গের গান গেয়েছিলেন। উক্ত বছরে বেলুড় মঠে অবস্থান করবার সময়ে তাঁর নানাদিনের গানের প্রসঙ্গ ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামিজীর অন্যান্য চরিত-গ্রন্থ-লেখক উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে দেখা যায়, জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত স্বামিজী গান গেয়েছেন এবং যতদুর সম্ভব, কোনকালেই সঙ্গীত-বর্জিত ছিলেন না। তাঁর অন্তিম পর্বের সঙ্গীতের সঙ্গী তাঁর হাতের তানপুরা ও পাখোয়াজ যন্ত্রটি বেলুড় মঠে তাঁর স্মৃতি-কক্ষে সযত্নে রক্ষিত আছে।

॥ গান-রচনা ॥

স্বামিজীর সঙ্গীত-প্রতিভা যে বহুমুখী ছিল, তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত গীতাবলীতে। তাঁর রচনার সংখ্যা অবশ্য অল্প এবং তার কারণও স্পষ্ট। গান-রচনার অনুকুল পরিবেশ তাঁর জীবনে না থাকায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে জীবনের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় আর তা' সম্ভব ছিল না। যে মানসিক অবস্থায় তিনি গান কয়টি রচনা করেছিলেন, তা' তাঁর তুল্য প্রতিভাধর এবং সঙ্গীতবিদ কবিপ্রাণের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর গানগুলি রচনার তারিখ সঠিকভাবে জানা না গেলেও, বেশির ভাগই তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের পূর্বে রচিত। বিশেষ তাঁর শ্রেষ্ঠ গান "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" এবং "তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা" ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। সংখ্যায় অধিক না হলেও তাঁর গান ক'টি রচনার উৎকর্ষতায় ও সঙ্গীত হিসাবে অতি উচ্চাঙ্গের এবং স্বামিজীর প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন। গানগুলি তিনিই প্রথম গেয়েছিলেন রচনা করবার পর এবং সুর সংযোজনাও তাঁর।

স্বামিজীর রচিত গান একাধারে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সাধনভাবের বাহক এবং তাঁর গীতশিল্পীসত্তার পরিচায়ক। গানের মাধুর্য এবং সাঙ্গীতিক মূল্য, শোন্‌বার সময়ে ধারণা করা যায়। তাঁর একটি গানের প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ("শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী") বিবরণ উদ্ধৃতিযোগ্য: "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" এই গানটি স্বামিজী এই সময় রচনা করেন। গ্রীষ্মকাল, প্রাতে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে স্বামিজী গিয়াছিলেন এবং উপরকার হাতের গরাদের কাছে বসিয়া গুণগুণ করিয়া গানটি গাহিতেছেন। অতুলবাবু (গিরীশবাবুর ভাই, জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হ্যাঁ হে, এ গানটা নতুন দেখছি যে, কার বাঁধা? মেজদাদার (গিরিশবাবুর) নয় ত?' নরেন্দ্রনাথ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন: 'ওহে, ভাল করে একবার গাও না!' শুনিয়া মোহিত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন: 'এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক—এই একটা গানের জন্যে সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে'। নরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন এবং কিছুই বলিলেন না। অতুলবাবুর গানটা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন। অতুলবাবু নরেন্দ্রনাথের তীব্র মেধাশক্তিতে আগেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই গানটিতে যে নরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে ও উপলব্ধি আছে ইহা তাঁহার ধারণা হইল"।

এই বিবৃতি থেকে ধারণা করা যায় স্বামিজীর গান শ্রোতাদের মনে কেমন প্রভাব বিস্তার করত।

তিনি নিম্নলিখিত গানগুলি রচনা করেন,

(১) মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥…ইত্যাদি
(গানখানি শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক রূপে গীত হয়)

(২) কর্ণাট—একতাল

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বোম্ বব বাজে গাল।…ইত্যাদি

(৩) সাহানা-কানাড়া—সুরফাঁকতাল

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি ॥…ইত্যাদি

(৪) মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া যানেকো দে।
যানেকো দে রে সেঁইয়া যানেকো দে (আজু ভালা) ॥…ইত্যাদি

(৫) খাম্বাজ বা বড়হংস—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায় ॥…ইত্যাদি

(৬) বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥…ইত্যাদি

॥ সঙ্গীত-সম্পর্কে মতামত ॥

এপর্যন্ত স্বামিজীকে সঙ্গীতজ্ঞের নানা ভূমিকায় দেখা গেল—গায়ক, সঙ্গীত-শিক্ষক, গান-রচয়িতা, সুর-সংযোজক, পাখোয়াজ-বাদক প্রভৃতি। এবার তাঁর আর একটি পরিচয় দেওয়া হবে। তিনি ছিলেন সঙ্গীত-ভাবুক, তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীত-চিন্তা ছিল। সঙ্গীতবিষয়ে তাঁর এই দার্শনিক দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেইসব রচনা ও পত্রাদি থেকে তাঁর কয়েকটি সঙ্গীতবিষয়ক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল: "গান হচ্ছে,

কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য তা' ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম্? সে কি আঁকা-বাঁকা ডামাডোল, বত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ! তারওপর মুসলমান উস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে নাকের মধ্যে দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধ্‌রাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের কথা নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে"। (—ভাববার কথা, পৃষ্ঠা ১০)।

"সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, এবং যাঁরা তা' বোঝেন, তাঁদের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা"। (জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত পত্রাংশে "পত্রাবলী", দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৭৭)।

একদিন তাঁর এক বন্ধুকে পেশাদারের মতন গাইতে শুনে বললেন: "শুধু সুর আর তাল বজায় রাখাটাই গানের সব কথা নয়। গান অবশ্যই একটা ভাব প্রকাশ করবে। কৃত্রিম ভঙ্গীতে গাওয়া গান কি কারো ভাল লাগে? গানের ভেতরকার ভাব গায়কের অনুভূতিকে জাগাবে, কথাগুলি পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং সুর ও তালের ওপর ঠিক ঠিক লক্ষ্য রাখতে হবে। যে গান গায়কের মনে অনুরূপ ভাব জাগাতে না পারে; তা' গানই নয়"। (Life of Swami Vivekananda, by his Eastern & Western Disciples, pp. 20 থেকে অনূদিত)।

(মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে হিন্দুজাতির নানা অবনতির দৃষ্টান্ত দেবার সময়ে স্বামিজী বলেন): "সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতে আর হৃদয়গ্রাহী গভীরভাব রহিল না, পূর্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্ত্রভাবে আপন পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, অথচ সম্পূর্ণ ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল। আমাদের সঙ্গীত নানাবিধ সুরের ভাল খিচুড়ি স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রের অবনতির চিহ্নস্বরূপ"। (—ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ১৮৬)।

"এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, কর্মবাড়ীর কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে—নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবত গুষ্টীর সপীণ্ডকরণ করিতেছে।...চোবেজী তীব্র বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: "বলি, বাপু হে—ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ?" ক্ষিপ্র

উত্তর এলো: "সুর তালের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি"। চোবেজী: "হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মুক কি না? পাগল তুই,—আমাকেই, ভিজুতে পারিসনি—ঠাকুর কি আমার চেয়ে বেশী মূর্খ?" (—ভাববার কথা, পৃঃ ৪৩)।

॥ সঙ্গীততত্ত্বের ভাষ্যকার ও 'সঙ্গীত-কল্পতরু' ॥

স্বামিজী যে শুধু ক্রিয়া-সিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়েও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীতের একটি ভাষ্য-পুস্তক রচনা করেছিলেন, সেকথা পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সে বইখানির নাম, 'সঙ্গীত কল্পতরু'। পুস্তকটির বটতলাস্থিত জনৈক প্রকাশক যুগ্মরচয়িতারূপে নিজের নাম মুদ্রিত করলেও গ্রন্থটি আসলে স্বামিজীরই রচনা। পুস্তকটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে বিপুল সংখ্যক গানের সংকলন, তার মধ্যে স্বামিজীর প্রিয় গানগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা আছে। আর আছে পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়া বিষয়ে একটি রচনা এবং প্রকাশক জানিয়েছেন যে, এটি "নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ." রচিত।

স্বামিজীর সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান, তাঁর সঙ্গীতচিন্তা, সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়াংশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর যথোপযুক্ত ধারণা, সঙ্গীতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত-সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ জ্ঞান ইত্যাদির পরিচায়ক এই সঙ্গীতকল্পতরু গ্রন্থটি। পুস্তকটির আলোচনা অংশে সূচী উল্লেখ করে স্বামিজীর বর্তমান সঙ্গীত-প্রসঙ্গের উপসংহার করা হবে। এই সূচীপত্র থেকে বোঝা যাবে, পুস্তকটিতে আলোচিত বিষয়ের পরিধি কত বিস্তৃত:

সঙ্গীত ও বাদ্য। সঙ্গীত পরিমাপক। স্বরগ্রাম। নাম প্রকরণ। উদারা মুদারা তারা। কোমল সুর। তীব্র অথবা কড়ি। হারমণি। কম্পন। আরোহ ও অবরোহক্রম। গমক ও মূর্ছনা। গিট্‌কারী। যন্ত্র বাঁধিবার নিয়ম। সেতার। এস্রাজ। বেহালা। মৃদঙ্গ। তবলা ও বামা। গীত। তাল। রাগ ও রাগিনী। চৌতাল। ঝাঁপতাল। সুর ফাঁকতাল। ধামাল। তেওরী। মধ্যমান। আড়াঠেকা। ঠুংরী। তিওট। স্বরসাধন। স্বরলিপি। ধ্রুপদ। খেয়াল। টপ্পা। ভৈরব রাগের স্বরলিপি। ভৈরব কাওয়ালীর স্বরলিপি। ছায়ানট, ঝাঁপতাল—স্বরলিপি। ভূপালী, সুর ফাকতা—স্বরলিপি। ইমন কল্যাণ, সুর ফাকতা—স্বরলিপি। কানাড়া, আড়া—স্বরলিপি। বাজনা ও বোল্। ঠেকা। বাজাইবার অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম। তেহাই। লয়। বিলম্ব

লয়। দ্রুত লয়। বাজাইবার ধ্বনির নিয়ম। আড়ি বাজান। চৌতালের ঠেকা ও বিভিন্ন বোল্। সুর ফাকতালের ঠেকা ও নানা বোল্। আড়া চৌতালের ঠেকা ও বিভিন্ন বোল্। ঢিমে তেতালার নানা বোল্। আড়াঠেকার নানা বোল্। ত্রিতালীর নানা বোল্। একতালার ঠেকা ও বিভিন্ন বোল্। তিওটের ঠেকা ও বোল্। ঝাঁপতালের ঠেকা ও কয়েকটি বোল্॥
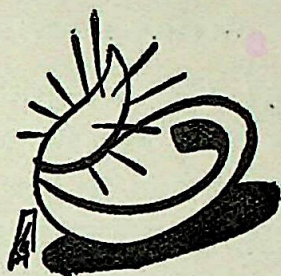
॥ দ্বাত্রিংশ অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দের হাস্যরস ॥

মহাপুরুষদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লঘু হাস্যপরিহাসের প্রতি একটা প্রবণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জীবনের গুরু ও গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন বলিয়াই বোধ হয় জীবনের হাল্কা ও তরল ছদ্মরূপ ধারণ করিতে মাঝে মাঝে তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। আকাশের ঘনীভূত মেঘজাল যেমন সূর্যের সুচিক্কণ আলোকস্পর্শে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, মহাপুরুষদের ভাবগম্ভীর সত্তাও তেমনি হাস্যকৌতুকের বহিরাবরণে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের সহজ ও ঘনিষ্ঠ রূপ ধরা পড়ে হাস্যকৌতুকের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে। মহাপুরুষদের অমেয়, রহস্যঘন সত্তা এই হাস্যকৌতুকের প্রত্যক্ষ উপায়টির মধ্য দিয়াই সাধারণ লোকের ধারণা ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। রামপ্রসাদ গভীর ভক্তিভাব একটা লঘু ও পরিচিতি পরিবেশের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মের গুহ্য তত্ত্বগুলি হাল্কা ও সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ও কঠিন জীবনসমস্যা নানাপ্রকার সরস টীকা টিপ্পনী ও তরল ঠাট্টা রসিকতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য জীবনে প্রগাঢ় জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের অদম্য ভাবাবেগের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার অমূল্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই জাতীয়-জীবনের কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের চিন্তায় অথবা কোনো সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহার ভাবনাগভীর ও কর্মবহুল জীবনে অলস অবকাশ ও শিথিল বিশ্রাম সুদুর্লভ ছিল। কিন্তু তবুও যে তাঁহার হৃদয়প্রসন্ন অনুভূতির রসে স্নিগ্ধ এবং তাঁহার গম্ভীর বদনমণ্ডল কৌতুকের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে

জানা যায়, তাঁহার অন্তরসমুদ্র গভীর ভাব ও চিন্তায় আলোড়িত হইলেও হাস্য-কৌতুকের হাল্কা ফেনাগুলি তাঁহার কথাবার্তার মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে; স্বামিজীর হাস্যরসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনা ও পত্রাবলীর মধ্যে, শিষ্যদের সঙ্গে বহু কথোপকথনে এবং অনুরাগী ভক্তদের স্মৃতিকথার মধ্যে।

স্বামিজীর কৌতুকপ্রিয়তা ও পরিহাস-রসিকতা সম্বন্ধে আমরা তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের লেখায় অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। 'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' নামক পুস্তকে নিবেদিতা লিখিয়াছেন: 'তারপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম'।[১] স্বামিজী যে কত লঘু বিষয় লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতেন তাহা 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-এর একাধিক স্থানে লিখিত রহিয়াছে। একস্থানে লেখা হইয়াছে: 'প্রথম হইতে স্বামিজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টাতামাসা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহ-সংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত'।[২] স্বামিজীর আর এক শিষ্যের লেখায় আমরা জানিতে পারিয়াছি, তিনি কিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া শিক্ষা দিতেন। সেই শিষ্য লিখিয়াছেন: 'স্বামিজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত,—ইহার ভিতর এত শক্তি"।[৩]

স্বামিজীর হাস্যরসসৃষ্টিতে পটুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার কথোপকথন ও রচিত-সাহিত্য উভয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। তাঁহার কথা ও লেখার মধ্যে তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার অজস্র নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে।

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৩১১

২ ঐ ঐ পৃঃ ২১১

৩ ঐ ঐ পৃঃ ৩৬৭-৬৮

সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ লোক ব্যতীত তাঁহার আলাপ-আলোচনার রস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। ভক্ত-শিষ্যদের স্মৃতিকথনে তাঁহার হাস্যকৌতুকপ্রিয়তার বহু উল্লেখ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেই হাস্যকৌতুক-প্রিয়তার বিশেষ রূপটি কি ছিল, কিভাবে তিনি শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাঁহার বর্ণনাভঙ্গিটি কিরূপ ছিল, লোকেদের সহিত আলাপ করিবার সময় কি উপায়ে তিনি তাঁহাদের আগ্রহ ও কৌতূহল ঘনীভূত করিয়া অবশেষে কৌতুকের তরল আঘাতে তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেন, তাঁহার টীকা-টিপ্পনী, ঠাট্টা-তামাসা, শ্লেষ-বিদ্রূপ কি বিশিষ্ট রীতিতে প্রকাশ পাইত—সেসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমরা পাই নাই। শুধু কেবল 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'-এর ন্যায় দুই একখানি গ্রন্থে স্বামিজীর নিজস্ব উক্তিগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। সেজন্য ঐ স্বল্পসংখ্যক রচনায় তাঁহার ব্যক্তিজীবনের হাস্যরসের নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু হাস্যরসসৃষ্টিতে তিনি যে কতখানি দক্ষ ছিলেন তাহার যথার্থ পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাঁহার নিজস্ব রচনার মধ্যে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, গম্ভীর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনাও তাঁহার হাস্যকৌতুকের বিমল আলোকচ্ছটায় কতখানি সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছি যে, তাঁহার রমণীয় রচনাভঙ্গীর মধ্যে হাস্যরস কিভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার তির্যক মন্তব্যগুলির উপরে উপরে কৌতুকের কণাগুলি কিভাবে ঝলমল করিতেছে।

স্বামিজী কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। সেজন্য পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের কথা লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে তিনি বেশ মজা বোধ করিতেন। এই বিষয়ে স্বামিজীকে আর একজন ধর্মাবতারের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি হইলেন নবদ্বীপের নিমাই। নিমাই-এর মতই স্বামিজী আমোদপ্রিয় ও চঞ্চলচিত্ত ছিলেন এবং নিমাই-এর মতই তিনি তাঁহার ভক্ত-শিষ্যদের পিছনে লাগিয়া, তাহাদিগকে রাগাইয়া বিব্রত করিয়া মজা পাইতেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন বলিয়া স্বামিজীর কাছে তাঁহাকে প্রায়ই নাস্তানাবুদ হইতে হইত। একদিন স্বামিজীর জন্য শিষ্য রন্ধন করিতেছিলেন, স্বামিজী তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন: "দেখিস মাছের 'জুল' যেন ঠিক বাঙালদিশি ধরনে হয়"।[৪] পূর্ববঙ্গে শব্দের আদিতে যে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয় এবং ও-কার উ-কারে পরিণত হয়, 'জুল' কথাটির মধ্যে তাহারই আভাস দিয়া স্বামিজী এখানে কৌতুক উদ্রেক

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ২৩

করিয়াছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের একস্থানে তিনি পূর্ববঙ্গীয় একটি বহুপ্রচলিত উক্তি উল্লেখ করিয়া বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। "ব্যাতন না জানলে বোত্র অবোত্র বুঝবো ক্যামনে?"[৫] ঠাট্টাচ্ছলে এই উক্তিটি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ঠাট্টা দ্বারাই তিনি একটি গুরু সামাজিক তত্ত্ব বিশদভাবে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে লইয়া ঠাট্টা করিবার সুযোগ পাইলে স্বামিজী আর ছাড়িতেন না। একদিন তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন: "আর এক কথা শুনেছেন, 'আজ এই ভটচাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে খেলি?'[৬] এই উক্তির মধ্যে হিন্দুধর্মের ছুঁৎমার্গের প্রতি শ্লেষ আছে; কিন্তু কৌতুকসৃষ্টির চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, মিষ্টান্ন-খাওয়া অপেক্ষাও জল-খাওয়ার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার মধ্যে। শরৎচন্দ্রের অবিস্মরণীয় চরিত্র সেই টগর বোষ্টমীর একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া যায়, "বিশ বছর ঘর করেছি বটে, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি কি?"

স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও প্রায়ই হাস্য-পরিহাস করিতেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনব নামকরণের মধ্যেই তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রকে তিনি ডাকিতেন জি. সি. বলিয়া। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার ধর্মবিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইত। স্বামিজী ছিলেন জ্ঞানমার্গীয় বেদান্তধর্মে বিশ্বাসী, আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন নির্বিচার ভক্তিবাদী। গিরিশচন্দ্রের এই অন্ধ ভক্তিবাদ লইয়াও তিনি কম ঠাট্টা-তামাসা করেন নাই। একদিন তিনি ঠাট্টা করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন: "কি জি. সি. এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে"।[৭] অবশ্য স্বামিজীর পরিহাসে কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার মত বিসর্জন দেন নাই।

স্বামিজীর কথাবার্তার মধ্যে নানা সরস ও শাণিত মন্তব্যের মধ্য দিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্তব্যগুলি একটু তির্যক ও শ্লেষাত্মক রূপ ধারণ করিত। গোরক্ষিণী সভার জনৈক প্রচারক একদিন স্বামিজীর কাছে আসিয়া বলিলেন: 'গরু আমাদের মাতা'। এই কথার উত্তরে স্বামিজী যাহা বলিলেন তাহা বিশেষ

---

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ১৮৫
৬ ঐ (৯ম খণ্ড), পৃঃ ১২৩
৭ ঐ ঐ পৃঃ ৪৩

উপভোগ্য। তিনি বলিলেন: 'হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা' না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?'[৮] ধর্মসাধনার পূর্বে যে ক্ষুধা-নিবারণ প্রয়োজন তাহা বুঝাইতে যাইয়া স্বামিজী একদিন যে সরস উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন: 'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম'।[৯] পেটকে কূর্মাবতারের সঙ্গে তুলনা করিয়াই তিনি এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। কথার ঈষৎ বিকৃতির মধ্যে অনেক সময় অর্থের গুরুতর ব্যবধান ঘটিতে পারে। স্বামিজীও প্রায়ই কোনো শব্দকে এমনিভাবে বিকৃত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে লঘু রসের সঞ্চার করিতেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার নাম তিনিই দিয়াছিলেন, অথচ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যকে এই পত্রিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার সময় পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, 'উদ্বন্ধন দেখেছিস'?[১০] ওকাকুরাকে (Okakura) তিনি বলিতেন 'অক্রূর খুড়ো'।[১১]

স্বামিজীর লিখিত রচনার মধ্যে যে হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ভাষার মধ্যে তাঁহার রৌদ্রকরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। সেই ভাষা তাঁহার সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হইয়া রহিয়াছে। উহাতে তাঁহার এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতা ও সহজ অকৃত্রিমতা রহিয়াছে যে তাহা পড়ামাত্রই আমরা লেখকের প্রতি এক অনিবার্য আকর্ষণ বোধ করি এবং তাঁহার বিষয়বস্তু ও রসসৃষ্টির সহিত একাত্ম হইয়া পড়ি। সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত যিনি ছিলেন তিনি চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে তদ্ভব-শব্দ ও বাগ্‌রীতি আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভাষার মধ্যে এক অপূর্ব স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা সঞ্চার করিলেন। তাঁহার একখানি পত্র হইতে এই ভাষার নিদর্শন দেওয়া হইল: "তোমার ঠ্যাঙ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ ক'রছ তাও শুনছি। ···আমার শরীর ঠিক চলছে না। যোদ্দা কথা, আমারও আতুপুতু করলেই রোগ হয়। রাঁধছি, যা-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমুচ্ছি"।।[১২]

---

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৯

৯ ঐ ঐ পৃঃ ১৩৩

১০ ঐ ঐ পৃঃ ১৭৩

১১ ঐ (৮ম খণ্ড), পৃঃ ২০০

১২ ঐ ঐ পৃঃ ৮৯

উপরি-উদ্ধৃত ভাষার মধ্যে বোধ হয় 'শরীর'-শব্দটি ছাড়া আর কোনো তৎসম শব্দই নাই। এই ধরনের ভাষায় পত্রের দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা সরস ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চিঠিপত্রের অনেকস্থলে তিনি তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ উপরি-উক্ত পত্রখানার মধ্যেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। যথা: "Awakened ('প্রবুদ্ধ ভারত')-ও ঘুমিয়েছে বুঝি? আমায় তো আর পাঠায় না। যাক, দেশে তো 'পিলগ্ হইছন্তি'—কে আছে, কে নেই রে রাম!!" Awakened কথাটির শব্দগত অর্থ ধরিয়া তাহার বিপরীত শব্দ 'ঘুমিয়েছে'-র ব্যবহার এবং পরিহাসচ্ছলে 'পিলগ হইছন্তি'-এরূপ উৎকলী বাক্যপ্রয়োগের মধ্য দিয়া স্বামিজী এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

স্বামিজীর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থখানিকে ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যায়। গ্রন্থখানির মধ্যে জায়গার বর্ণনার সহিত বিভিন্নপ্রকার নর-নারীর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু বিচিত্র ও সরস মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। এই হাস্যরস উদ্ভূত হইয়াছে লেখকের তির্যক সমালোচনার দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত জগৎ ও মানবচিত্রের মধ্যে এবং তাঁহার শাণিত বাগ্‌চাতুর্যের মধ্যে। সিংহলীদের চেহারার বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি তাঁহার শ্লেষাত্মক, সূচীমুখ বর্ণনাকে কিভাবে সরস করিয়া তুলিয়াছেন তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: "ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা! আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্ছে গা?"[১৩]

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে সিংহলীর কথা বলিতে যাইয়া লেখক অলস, বিলাসী, মেয়েলিভাবাপন্ন বাঙালী যুবকদের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

নেটিভদের প্রতি সাহেবদের ঘৃণা এবং সাহেবদের খোসামোদ ও অনুকরণ করিবার দাস-মনোবৃত্তিও স্বামিজীর হাতে বহুস্থানে তীব্র কশাঘাত লাভ করিয়াছে।

---

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৮৮

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: "দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় ক'রে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা। 'সাধ ক'রে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখ্‌ৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক"।[১৪]

স্বামিজী তাঁহার কথা ও লেখার বহুস্থানে অনেক সরস গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। এই গল্পগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক আচারব্যবহার ও রীতি-নীতির আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি এ-ধরনের গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত গঙ্গাকে পাঁঠা মানা প্রসঙ্গে স্বামিজী এমনি একটি গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই: 'কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুর বাড়ী যায়; সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও'। জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে। এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা, শ্বশুর গঙ্গা পেলেন'।

স্বামিজী তাঁহার লেখায় শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের চাতুর্য দেখাইয়া অনেক স্থানে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। তদ্ভব শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ করিয়া যে কিরূপ হাস্যরসাত্মক করা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: 'কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দ্বালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁবকাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলি —চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা'।[১৫]

---

১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৭৬

১৫ ঐ ঐ পৃঃ ৬০

সাধারণ বস্তু লেখকের উদ্ভট কল্পনাস্পর্শে এবং নানা অতিশয়িত ভাষার আড়ম্বর ও অলঙ্কার প্রয়োগে কিরূপ কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত স্বামিজীর লেখার অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের গোড়াতেই জাহাজে সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনার কথাই ধরা যাক: 'আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে, ওছল পাছল ক'রে, খোঁটা খুঁটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ ক'রে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা'।[১৬]

স্বামিজী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কতখানি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সমাজিক মতামত বোধ হয় সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থখানির মধ্যে আমাদের সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের বহু দোষত্রুটি, বহু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া তিনি সে-সমাজের ভালো ও মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-ভাববিলাসী দেশী সমাজের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে তিনি সেজন্যই তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। লেখক প্রাচীন ও সনাতন ভাবাদর্শ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মত এত তীব্র ও জোরালো যে, বিপক্ষবাদীদের প্রতি তাঁহার ধিক্কার অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন: 'ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান অড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?'[১৭]

---

১৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৫৯-৬০

১৭ ঐ ঐ পৃঃ ১৫১

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥
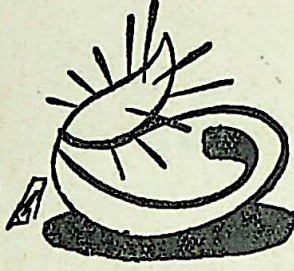
॥ প্রথম অবদান ॥

॥ দক্ষিণভারতে স্বামী বিবেকানন্দ ॥

To love India one must know her—ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে হলে তাকে জানতে হবে। কথাটি প্রায়ই বলতেন স্বামিজী। আর সেই জানার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তাঁর ভারতভ্রমণের সূত্রপাত। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেশ পরিক্রমার রীতি চলে আসছে অনেক দিন থেকে। দেশভ্রমণের মধ্য দিয়েই তাঁরা ভারতকে জানতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে শৈব-বৈষ্ণব দ্বৈত-অদ্বৈতের কোন ভেদ ছিল না। বীর বিবেকানন্দের জীবনে সন্ন্যাসধর্মের অনেক প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত হলেও তরুণ বয়সেই আমরা তাঁকে পাই ভারত-পরিব্রাজক রূপে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে তাঁর যাত্রারম্ভ। তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ ইহলোকে। প্রথম প্রথম স্বামিজী দিনকয়েকের জন্য অদৃশ্য হতেন। আজ বৈদ্যনাথ-শিমুলতলা, কাল গাজিপুর-বুদ্ধগয়া—এইভাবে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। প্রত্যেকবার বলে যেতেন: 'এই শেষ, আর ফিরছি না'। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁকে অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আসতে হত।

ইতিমধ্যে পরমহংসদেব দেহরক্ষা করেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। স্বামিজীর প্রকৃত পরিব্রাজক-জীবন শুরু হয় আরও দু'বছর পরে—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেবারে তিনি ভ্রমণ করেন কাশী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন এবং হিমালয়ের কয়েকটি জায়গা মাত্র। অর্থাৎ উত্তরভারতের অংশবিশেষে তাঁর ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল।

আরও দু'বছর কেটে গেল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আটাশ বছরের যুবক বরানগর মঠ থেকে বেরোলেন অনেক দিনের জন্য। প্রথমে সঙ্গী নিয়ে, পরে নিঃসঙ্গ। সেই একক যাত্রা শুরু হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। এইটেই স্বামিজীর ঐতিহাসিক ভ্রমণ। এই ভ্রমণকালে তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছেন তার দীনাতিদীন বেশে, আবার দেখেছেন মহৈশ্বর্যরূপে। রাত কাটিয়েছেন ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এসে পৌছলেন দক্ষিণভারতে। তখন তাঁর বয়স তিরিশ।

বেলগাঁও থেকে সমুদ্রতটবর্তী পর্তুগীজ উপনিবেশের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-ভারতে স্বামিজীর প্রথম পদার্পণ হয় মৈসূরু বা কর্ণাটকের ভূমিতে। বেঙ্গলূরে এসে পরিচিত হন মৈসূরপতি চামরাজ ওডেয়র-এর সঙ্গে। ওডেয়র এবং তাঁর দেওয়ান শেষাদ্রি অয়্যর স্বামিজীর বিশেষ গুণমুগ্ধ হন। সম্ভাব্য আমেরিকা-যাত্রা নিয়ে আলোচনা ওঠে এবং রাজা তার ব্যয়ভার বহনে সম্মতির কথাও প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বামিজী রাজার দেওয়া কোনো কিছু না নিয়ে রওনা হলেন কোচ্চি অর্থাৎ কোচীনের অভিমুখে। সেখান থেকে তিরুঅনন্তপুরম্ অর্থাৎ ত্রিবান্দ্রম্।

ত্রিবান্দ্রমে এসে যাঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন, সেই তামিলভাষী ব্রাহ্মণ কে. সুন্দররাম অয়্যর্ এবং তাঁর ছেলে কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী স্বামিজীর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বামিজীর আগমনের কয়েক মিনিটের মধ্যে গৃহকর্তা সামান্য আলাপেই বুঝতে পারেন—এই সন্ন্যাসী একজন মহান্ ব্যক্তি। সেদিন আর ভদ্রলোকের কর্মস্থলে বেরুনো হল না। স্বামিজীর উপস্থিতি, তাঁর কণ্ঠ, তাঁর চোখের দীপ্তি এবং অনর্গল বাক্য-প্রবাহ ও চিন্তাধারায় ভদ্রলোক অভিভূত হয়ে পড়েন। সেদিন সন্ধ্যায় ত্রিবান্দ্রমের উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে স্বামিজী পরিচিত হলে উপস্থিত সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সুন্দররাম অয়্যর্-এর গৃহে স্বামিজী ন' রাত্রি বাস করেন। ইতিমধ্যে সারা শহরে প্রচার হয়ে যায় উত্তরভারত থেকে এক প্রতিভাবান সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা। সংবাদ শুনে অনেকেই স্বামিজীকে দেখতে আসেন গৃহকর্তার বাড়ীতে। মদ্রাস থেকে এই সময়ে ত্রিবান্দ্রমে আসেন এক বাঙালী ভদ্রলোক—যিনি ছাত্রজীবনে ছিলেন স্বামিজীর সহপাঠী—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ছেলে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য। মন্মথবাবু তখন মদ্রাসে সরকারী কাজে নিযুক্ত। তাঁর ত্রিবান্দ্রম্ আসার পরে স্বামিজী প্রতিদিন সকালবেলাটা কাটাতেন তাঁর বাড়ীতে। মধ্যাহ্ন ভোজনও সেইখানেই সাঙ্গ হত। স্বামিজী একদিন রসিকতা করে সুন্দররামকে বলেছিলেন: "আমরা বাঙালিরা একটু স্বজন-প্রিয় জাত (We, Bengalies, are a clannish people); তা'ছাড়া দক্ষিণভারতে আতিথ্যগ্রহণের পরে অনেককাল মাছ-মাংস খাওয়ার সুযোগ ঘটেনি"।

একদিন সুন্দররাম স্বামিজীকে অনুরোধ জানালেন শহরের কোনো জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এ'জাতীয় বক্তৃতার অভ্যাস নেই বলে স্বামিজী অসম্মত হলেন।

—তা'হলে শিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে আপনি কী করবেন?

—ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন যথাসময় আমার শক্তি যুগিয়ে দেবেন।

ন'দিন পরে স্বামিজী ত্রিবান্দ্রম্ থেকে বিদায় নিলেন। গৃহকর্তা লিখছেন: "To everyone of us he was all sweetness, all tenderness, all grace."

কন্যাকুমারীতে এসে ভারতপথিক বিবেকানন্দ শিশুর মতো উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ভারত-মৃত্তিকার শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখলেন—মহান্ সিন্ধু শততরঙ্গ-

ভঙ্গে মাতৃবন্দনায় উচ্ছ্বসিত। আত্মহারা স্বামিজী তীরসন্নিহিত জলবেষ্টিত শিলাখণ্ডের উপরে গিয়ে ধ্যানাসীন হলেন। মানসচক্ষে দেখলেন সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের বিশাল বিচিত্র রূপ। সেই শিলাখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আজও ভারত-সন্তান উদ্বুদ্ধ হবে। কল্পনায় দেখতে পাবে এক মহিমময় দৃশ্য :

সম্মুখে অনিলান্দোলিত বীচিবিক্ষোভময়ী উচ্ছ্বসিত সুনীল জলধি, পশ্চাতে শৈলকাননকান্তার-পরিশোভিত শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ, আর তাহার সর্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে সমাসীন নব্যভারতের মন্ত্রগুরু পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ !

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—আসমুদ্র-হিমাচল ভারতভ্রমণ সম্পূর্ণ হল, স্বামিজী যথার্থ ভারতপ্রাণ হলেন। পরবর্তীকালে নিজেই একসময়ে বলেছেন যে এখানে এসে তিনি হলেন—a condensed India.

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতের নানা জায়গায় অসামান্য প্রতিভাধর রূপে শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হলেও তাঁর জীবন ও বাণীর মহত্ব যথার্থরূপে উপলব্ধ হয় মদ্রাসে। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর মদ্রাসে স্বামিজীকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয় তা' অভূতপূর্ব হলেও অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ ইতিমধ্যে তিনি জগৎ-জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এক অখ্যাতনামা বাঙালী সন্ন্যাসী একরকম অজ্ঞাত অবস্থায় যে কয়েকমাস মদ্রাস শহরে কাটালেন সেই সময়ের কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মদ্রাসে রটে গেল—এক অদ্ভুত ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী এসেছেন। ইংরেজীর কী মহিমা! সত্য কিনা জানিনা, আমার মনে হয় স্বামিজীর বিপুল খ্যাতির মূলে রয়েছে ইংরেজী ভাষায় তাঁর আশ্চর্য অধিকার।

স্বামিজীর মতো সন্ন্যাসী প্রথম স্বীকৃতি পেলেন মদ্রাসে—ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর। কারণ, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে মদ্রাস তথা দক্ষিণভারত যতটা রক্ষণশীল, স্বামিজী ঠিক ততটাই প্রচলিত সন্ন্যাসজীবনের বিপরীত পন্থী।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণভারতীয় জনসমাজের একাংশে এখনকার মতো তখনও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, উত্তরাপথের হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় জাতির কোনো সম্পর্ক নেই। ত্রিবান্দমে অবস্থানকালে সেখানকার জনৈক অধ্যাপকের মুখে এই ধরণের মন্তব্য শুনে স্বামিজী তাঁর গৃহকর্তা সুন্দররামকে বলেছিলেন যে, দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ইতিপূর্বেই কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে তিনি এই অপ্রীতিকর জাতি-বৈর (আর্য-দ্রাবিড়-মনোভাব) লক্ষ্য করেছেন।

তৃতীয়ত, দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণসমাজে মাছ-মাংস অতিনিষিদ্ধ বস্তু। আর স্বামিজী কিনা সেই নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য বাঙালিসুলভ কাতরতা প্রকাশ করেছেন! ত্রিবান্দ্রমে তার পরিচয় পেয়েছি আমরা। দক্ষিণীদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যে কতদূর ভয়ানক আমরা ঠিক অনুধাবন করতে পারব না। অনেকে স্বামিজীর মুখের উপর আমিষ-ভক্ষণকে ঘৃণ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই অসহিষ্ণুতা সহজবোধ্য। কারণ আমরা মৎস্যপ্রাণ বাঙালিরাও প্রত্যাশা করি—সাধু-সন্ন্যাসী নিরামিষাশী

হবেন। ধূম্রপানে তাঁর আসক্তি নিন্দনীয়...ইত্যাদি। অথচ মদ্রাসে ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনার সময়ে দেখা যেত স্বামিজী অবিরত ধূম্রপানে রত।

চতুর্থত, দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণসমাজে স্বামিজীর শ্রদ্ধালাভের সবচেয়ে বড় বাধা তাঁর ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মলাভ। মদ্রাসে একদিন জাতিবর্ণসমস্যা প্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন যে, কেরলের নায়র্-সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ বহুকাল ধরে সেখানকার নম্বুতিরি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যেভাবে তারা প্রতিলোম বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ, তাতে মনুস্মৃতি অনুযায়ী তারা ব্রাহ্মণপদবাচ্য। কিন্তু স্বামিজীর এই অভিমতে ব্রাহ্মণসমাজের সম্মতি দূরে থাক, উপস্থিত নায়র্ ভদ্রমহোদয়গণও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

এ-হেন মদ্রাসের পক্ষে দত্তকুলোদ্ভব নরেন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার করে নেওয়া বড় সহজ কথা নয়। বস্তুত প্রথম মদ্রাস-দর্শনকালে স্বামিজীর প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হলেও সেখানকার নেতৃস্থানীয় প্রবীনসমাজ কিন্তু তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন। তখন যাঁরা স্বামিজীর চারপাশে এসে জমেছিলেন, তাঁরা সমাজের নেতৃস্থানীয় কেউ নন। তাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীনদল—ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকীল, মধ্যবর্গের কর্মচারী প্রভৃতি। অর্থাৎ যাঁরা মনে-প্রাণে তরুণ, বিশেষ ধরণের গোঁড়ামী যাঁদের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মদ্রাসের এই যুবসমাজ স্বামিজীর উদার ধর্মমতে বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। স্বামিজীর শিকাগো-যাত্রার জন্য তাঁরা বিপুল উৎসাহে অর্থসংগ্রহের আয়োজন করেন, এঁদেরই সাহচর্যে স্বামিজীর বিদেশযাত্রার সংকল্প একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। বিদেশে গিয়েও কপর্দকহীন স্বামিজী টাকার জন্য যাঁদের উদ্দেশ্যে কেব্‌ল্ পাঠিয়েছিলেন তাঁরা এই মদ্রাসের বন্ধু। তখনও কিন্তু সেখানকার প্রবীন সম্প্রদায় স্বামিজীর অনুগামী দলকে "অত্যুৎসাহী বিভ্রান্ত" বলে বিজ্ঞের হাসি হেসেছিলেন।

১৮৯৩-৯৪-৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামিজী দেশে ফিরে এলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে স্বামিজী-সম্পর্কে মদ্রাস তথা সমগ্র ভারতের মনোভাবের রূপান্তর ঘটে। কলম্বো থেকে আরম্ভ করে পথে পথে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে স্বামিজীর অভ্যর্থনা হতে থাকে,—রামেশ্বর, রামনাথ, মাদুরা, কুম্ভকোণম্—ত্রিচিরা-পল্লী......। তার মধ্যে অবশ্য অতি স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে জমকালো হয়েছিল মদ্রাসের সম্বর্ধনা। ১৭টি বিজয়তোরণ নির্মাণ করে বিভিন্ন ভাষায় ২৪ খানা মানপত্র দিয়ে মদ্রাস স্বামিজীকে সম্মান জানালো।

এবারে কিন্তু পূর্বপরিচিত তরুণ বন্ধুদের পক্ষে স্বামিজীর কাছে আসা শক্ত হল। কারণ, ভীড় করে এগিয়ে এলেন নাগরিক জীবনের মাতব্বর সম্প্রদায়। এর থেকে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মানুষ ও মতের যথার্থ মূল্য দিতে পারে তরুণ সমাজ।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামিজী ন'টি দিন মদ্রাসে অবস্থান করেন।

সমুদ্রতীরবর্তী সেই বাড়ীটি Kernan Castle নামে সুপরিচিত। এ' বাড়ীতে তখন জন-সমাগম হয়েছিল তীর্থযাত্রীর মতো। দর্শনার্থীর ভীড় লেগেই আছে। আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। যেন তারা মন্দিরে আসছে দেব-দর্শনের অভিপ্রায়ে। দক্ষিণভারত প্রধানত শৈবধর্মের দেশ। তামিলনাডের শৈবসাধকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তরুণ সাধক সম্বন্ধর্-কে—যিনি মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন বলে জনশ্রুতি। বর্তমানযুগেও তাঁর অসামান্য প্রভাব। মদ্রাস শহরে রটনা হয়ে গেল—শ্রেষ্ঠ শৈবাচার্য সম্বন্ধর্ আবার ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে। দক্ষিণের নরনারী কথাটি মেনে নিয়েছিল পূর্ণ বিশ্বাসে, এবং স্বামিজীকে চোখে দেখার পরে তাদের সে বিশ্বাস ভাঙেনি, বরং দৃঢ়তর হয়। বিবেকানন্দের সম্মুখে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদিত হত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের দ্বারা। পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে তারা আশীর্বাদ ভিক্ষা করত এই "নবীন সম্বন্ধর্"-এর।

স্বামিজীর বিরোধিতা করবার মতো লোকও ছিল। কোনো সন্ন্যাসীর সাধনা বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে স্বভাবতই স্থানীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টা হয় সেই নবাগত আগন্তুকের মহত্ত্ব যাচাই করা। মদ্রাসেও এরূপ চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কেউ আসতেন পাণ্ডিত্য পরীক্ষায়, কেউবা করতেন বেদান্তের কূটতর্ক, কারও বা উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলসূত্র নিয়ে আলোচনা। তাছাড়া বিবেকানন্দের যুগোচিত মনোভাবের বিরোধিতা তো ছিলই। আমেরিকা-যাত্রার আগে জনৈক গোঁড়া পণ্ডিতের সঙ্গে স্বামিজীর সাক্ষাৎ হয়—যিনি সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক ম্লেচ্ছভাষীদের নিকট স্বামিজীর হিন্দুধর্মপ্রচারের সংকল্পের কথা শুনে বিষম চটে যান এবং তারপরে স্বামিজীর সকল কথায় ঘাড় বেঁকিয়ে কেবল "কদাপি ন, কদাপি ন" বলতে থাকেন। অপর একজন ব্রাহ্মণ তো স্পষ্টই বললেন: "শাস্ত্রে কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য সন্ন্যাসের বিধি রয়েছে। আপনি তো ব্রাহ্মণ নন। সুতরাং আপনার সন্ন্যাস অশাস্ত্রীয়"। অবশ্য সমস্ত রকম প্রশ্নের জন্যই স্বামিজী তৈরী ছিলেন। দ্রুত ও তীক্ষ্ণ উত্তর যোগাতে তাঁর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হত না। একবার এক তামিল পণ্ডিত স্বামিজীর সংস্কৃত উচ্চারণের ত্রুটি ধরাতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছিলেন: "The fellow who cannot pronounce Jnana properly has the cheek to criticize my pronunciation of Sanskrit. (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, তামিল রসনায় 'জ্ঞান' শব্দটির সাধারণ উচ্চারণ 'ঞান')।

কিন্তু এই ধরণের লোকের সংখ্যা স্বভাবতই কম ছিল এবং এ' ভাবের মনোভাব নিয়ে এলে সাধারণ দর্শনার্থীও তাকে বড় একটা প্রশ্রয় দিত না। এইসময়ে যাঁরা কাছে থেকে স্বামিজীকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর "বিমিশ্র প্রকৃতি" (composite nature) দেখে। একজন অনুরাগী বিবেকানন্দের বাঙালি-দুর্লভ দৈহিক গঠনের উল্লেখ করে লিখছেন: "আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, এমনকি মেজাজে পর্যন্ত তাঁকে সর্বদা সন্ন্যাসী বলে মনে হত না—In manner Vivekananda was natural, unaffected and unconventional.

There was none of that solemn gravity, measured utterance, and even temper that we usually associate with a sage. .

Kernan Castle-এ নিরতিশয় কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যে অল্পকিছু অবসরের মুহূর্তে স্বামিজীর হাল্‌কা দিকের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন মদ্রাসী অনুরাগীরা। একদিন তাঁরা স্বামিজীকে অনুরোধ জানালেন "গীতগোবিন্দম্"-এর অষ্টপদী গাইতে। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে গীতগোবিন্দ! স্বামিজী গাইলেন, খুশী হয়ে গাইলেন। দরদ-ভরা কণ্ঠে রাগ-তালের সমতা বজায় রেখে।

বিবেকানন্দের দক্ষিণী অনুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সকলের কথা বিস্তৃতভাবে জানা যায় না। কেউ লিখে রেখে গেছেন স্বামিজীর কথা, কেউবা নীরব ছিলেন। কারো কারো কথা জানা যায় অন্য বিবরণ থেকে। এইপ্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে মনে পড়ে শ্রীঅলসিঙ্গ পেরুমালের কথা। মদ্রাসী বন্ধুরা তাঁকে আদর করে ডাকতো—'অচিঙ্গ'। ব্রাহ্মণ যুবক, দর্শনের অধ্যাপক। আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। বাপ-মা-স্ত্রী এবং চারটি সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামিজীর সমর্থনে দক্ষিণভারতে যা কিছু করা হয়েছে তিনি ছিলেন তার 'লাইফ এণ্ড সোল্'। কথাটা বলেছেন বিবেকানন্দের অপর এক অনুরাগী। স্বামিজীকে আমেরিকা পাঠাবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন অলসিঙ্গ পেরুমাল। বিবেকানন্দের জনৈক মার্কিন শিষ্যা বলেছেন : "Perhaps without him we never would have met Vivekananda. এই অলসিঙ্গ-কে স্বামিজী একবার বম্বে পাঠিয়েছিলেন তাঁর আমেরিকান শিষ্যা জোসেফাইন মেকলিয়ড্ এবং আরও কয়েকজন নবাগতকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য। জোসেফাইন তাঁর অনভ্যস্ত চোখে তামিল বৈষ্ণব-সন্তান অলসিঙ্গের ললাটে সুদীর্ঘ তিলক-টানা দেখে মনে মনে না হেসে পারেন নি। পরববর্তীকালে একদিন তিনি স্বামিজীর কাছে আক্ষেপ জানিয়ে বলেছিলেন : "What a pity that Mr. Alasinga wears those Vaishnavite marks on his forehead! নিশ্চয়ই তিনি মনে মনে স্বামিজীর সমর্থন প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু ফল হলো উল্‌টো। দৃঢ় কঠোর কণ্ঠে স্বামিজী বলে উঠলেন : "Hands off! what have you ever done? ভক্তের প্রতি গুরুর মনোভাব যে কত শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল তা' বোঝা যায় স্বামিজীর এই সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগর্ভ উক্তি থেকে।

বিবেকানন্দের অপর একজন অনুরাগী ছিলেন কে. সুন্দররাম অয়্যর—ত্রিবান্দ্রমে যাঁর বাড়ীতে স্বামিজী ন'দিন ছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পরে মদ্রাসে নয়দিনব্যাপী অবস্থানকালেও তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন সুন্দররাম। 'নবরাত্রি' দক্ষিণভারতে বিশেষ জনপ্রিয় উৎসব। সুন্দররাম স্বামিজীর সঙ্গে তাঁর এই দুই নবরাত্রির বিবরণ লিখে গেছেন। বিবেকানন্দ যখন মদ্রাস থেকে কলকাতা-গামী জাহাজে উঠলেন, সুন্দররাম জিজ্ঞাসা করলেন : "স্বামিজী, আবার কবে আমরা আপনাকে দক্ষিণভারতে দেখতে পাব?" স্বামিজী উত্তরে বলেছিলেন :

"কোনো সন্দেহ রেখোনা। হিমালয়ের কোলে কিছুদিন বিশ্রাম করে আমি দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব—I shall burst on the country everywhere like an avalanche"। সুন্দররাম লিখছেন : "দক্ষিণভারত সম্পর্কে স্বামিজীর সে আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয়নি—This was not to be, and I wever saw the Swami again"। এইভাবে শেষ হল স্বামিজীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় নবরাত্রির বিবরণ।

সুন্দররামের পুত্র রামস্বামী শাস্ত্রীও বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইনিও নিজের চোখে দেখা স্বামিজীর মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম সাক্ষাৎ ত্রিবান্দ্রমে। তখন রামস্বামী আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। দ্বারে গেরুয়াধারী অপরিচিত পুরুষকে দেখে বাবার কাছে গিয়ে বললেন : "আমাদের বাড়ীতে একজন মহারাজ এসেছেন, বাবা"।

—পাগল তুমি! মহারাজ আসবেন আমার বাড়ীতে?

পরে স্বামিজীর পরিচয় পেয়ে সুন্দররাম তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন : "তুমি ঠিকই বলেছ। ইনি যে মহারাজ তাতে সন্দেহ নেই। তবে ক্ষুদ্র ভূমিভাগের অধীশ্বর নন, সীমাহীন অধ্যাত্ম জগতের অধিপতি"।

একদিন রামস্বামী সংস্কৃত পড়ছিলেন। স্বামিজী সেই ঘরে এলেন।

—কী বই পড়ছ?

—কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ।

—হিমালয়-বর্ণনার প্রথম শ্লোকটি শোনাও।

তারপরে স্বামিজী নিজেই আরম্ভ করলেন তাঁর অত্যাশ্চর্য সুমিত সুরেলা কণ্ঠে : অস্ত্যুত্তরস্যাং......।

এইভাবে আলাপ শুরু। তারপরে ঘনিষ্ঠ সহযোগ হয়েছিল মদ্রাসে। পিতার ন্যায় পুত্রও ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী স্বামিজীর নিত্যসঙ্গী।

রামনাথের রাজা ভাস্কর সেতুপতির প্রসঙ্গ সুবিদিত। ইনি আমেরিকা-ফেরৎ স্বামিজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন রাজকীয় ভঙ্গিতে।

আমি ইতিপূর্বে কখনও কখনও ভেবেছি—যে-বিবেকানন্দের ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে লণ্ডনের ইংরেজদের স্বীকার করতে হয়েছে তাঁর "Surprising command of the English language", যিনি অনর্গল হিন্দী বলা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, সংস্কৃতেও যাঁর দক্ষতা কিছু কম ছিলনা, প্যারিসের শ্রোতাদের সুবিধা হবে ভেবে যিনি অল্পকালের মধ্যে ফরাসী ভাষাও রপ্ত করে নিয়েছিলেন, দক্ষিণভারতের বিশিষ্ট ভাষা তামিল সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কীরকম ছিল! এ' সম্পর্কে সুন্দররাম অয়্যর্ লিখেছেন : "The Swami learnt a number of Tamil words and took delight in conversing in Tamil". এর ফলে স্বামিজী অয়্যর্ পরিবারের আরও আপনজনে পরিণত হলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, মনে হল যেন অয়্যর্ পরিবারের মঙ্গল-প্রদীপ নিভে গেল—it seemed for a time as if the light had gone out of our home.
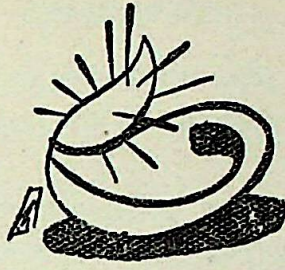
॥ দ্বিতীয় অবদান ॥

॥ ইউরোপে স্বামী বিবেকানন্দ ॥

বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, ভারতভূমি তাঁহার নিকট ছিল পুণ্যভূমি। ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ছিল তাঁহার কাম্য, জীবনের সাধনা। অতীন্দ্রিয় স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহার নিকট আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল বলিয়া তিনি পার্থিব সম্পদ গ্রাহ্য করিতেন না, বিলাস-সামগ্রী স্পর্শ করিতেন না। জ্ঞান ও মুক্তির পথে আজীবন আত্মনিবেদন করিয়া সাধনমার্গে নিয়ত বিচরণ করিতে যারপরনাই প্রয়াস পাইতেন। মাতৃভূমির প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ তিনি অকৃত্রিম অধ্যবসায়ের সহিত ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐকান্তিক সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হন। প্রাচীন গৌরবে সমৃদ্ধ মনপ্রাণ লইয়া ভারতীয়-গণ কিভাবে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা দেশবিদেশের জনসাধারণকে জানাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার অমিতসাহস, প্রগাঢ়জ্ঞান, দেশমাতৃকার প্রতি নিবিড়শ্রদ্ধা তাঁহার এ' সাধুসঙ্কল্প জয়যুক্ত করিতে সাহায্য প্রদান করে। তাই তিনি বিলাতে প্রচারার্থ গমন করিলে ধর্মব্যাখ্যার সুনিপুণ ভাষণ, ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণ, বেদান্তশাস্ত্রের সুললিত আলোচনা, হিন্দুধর্মের মর্মবাণী সরল-সুবিন্যস্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ইংলণ্ড-বাসীকে বিমুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্দেশবাসী সকলে তাঁহার বাগ্মিতা, তত্ত্বকথা-পরিস্ফুটনে অসীমপ্রজ্ঞা, ধীশক্তি ও বাচন-ভঙ্গীদর্শনে চমৎকৃত হইয়া-ছিলেন।

॥ ইংলণ্ডে ॥

ইউরোপখণ্ডে যেসকল বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশ্বপ্রেমে নিবেদিতাত্মা বিবেকানন্দের জগদ্বাসীকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির আবেদন ছিল। তিনি নির্ভীকভাবে সকলকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে বলিতেন। বাঁচিবার দৃঢ়সঙ্কল্প সকলের জাগ্রত করা প্রয়োজন। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও কর্মকুশলতা অর্জন করা দরকার। স্বকর্মসাধনে দৃঢ় প্রত্যয়, পরসেবা প্রভৃতি অভীষ্ট লক্ষ্যে লইয়া যাইবে। নির্ভীক বীর সন্ন্যাসী

বলিতেন : "কষ্টের মধ্যেও নিজের শক্তি ও সাহস বজায় রাখিতে হইবে। স্বকীয় মনোবৃত্তি সুন্দর ও প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে সাফল্য সকল কার্যে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে"।

স্বামিজীর সহোদর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে গমন করেন। লণ্ডনে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যার আয়োজন হইলে বহুলোক সমাগম হইতে দেখা যাইত। মিস্ মূলার, মিঃ ষ্টার্ডি প্রভৃতি ৫৭নং সেণ্ট জর্জ ষ্ট্রীটের ভবনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইতেন। ধর্মবাখ্যা তাঁহার ছিল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। বেলা ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত বক্তৃতার কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রায় মাসাবধিকাল এইভাবে কাটিলে, বক্তৃতার স্থান পরিবর্তিত হইতে দেখা গেল। সুবিখ্যাত পিকাডেলী নামক স্থানে রয়েল ইনষ্টিটিউটের চিত্রশালার একটি রমনীয় কক্ষে (Water Painting Gallery of the Royal Institute) বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই বক্তৃতাগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'Class Lectures'। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। বেদান্তসূত্র, দর্শনশাস্ত্র, রাজযোগ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিতে করিতে প্রখরমেধা স্বামিজী প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ফিজিক্স, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নীতিগুলির অবতারণা ও বিশদব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। পরিশেষে প্রশ্ন করিবার রীতি ছিল। পণ্ডিতপ্রবর স্বামিজী যথাযথ উত্তরদানে সকলকে তখন প্রীত করিতেন।

স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন : "১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর লণ্ডনের "প্রিন্সেস হলে" এক জনসভায় তাঁর ইংরাজবন্ধুগণ তাঁকে সাড়ম্বরে যে বিদায়-অভ্যর্থনা জানান তার কথা আমি কোনদিন ভুলব না"।

আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত কর্ণধার ও ধর্মব্যাখ্যাতা স্বামী অভেদানন্দ আরও বিবৃত করিয়াছেন : "ইংলণ্ডে সাধারণের কাছে তাঁর (বিবেকানন্দের) সাধনবাণী প্রচার হওয়ার পর অধ্যাত্মমনা লোকদের মনে একটা উদাত্ত সাড়া পড়ে যায়। এই ভাষণগুলি প্রথমে ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয় এবং পরে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি সেগুলিকেই 'জ্ঞানযোগ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন"। [শ্রদ্ধাভাজন স্বামী অভেদানন্দ-কর্তৃক "স্বামী বিবেকানন্দ" পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য]

লণ্ডনের কয়েকটি স্থানে কতিপয় বক্তৃতা ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার ফলে বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুধর্মের সারকথা এমন সুষ্ঠুভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আপামর জনসাধারণকে তিনি বুঝাইলেন অপূর্ব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কল্যাণের পথে মানবসম্প্রদায়কে আগাইয়া লইয়া যায়। জীবনে জড়তা আসিয়া দেখা দিলে কর্মপ্রবণতা নষ্ট হইয়া যায়, অন্তরের সৌন্দর্য কর্মশক্তির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া পড়ে, মানবীয় ঔদার্য ক্ষুণ্ণ হয়। বহির্জগতের বিরাট কোলাহল ও প্রতিকূল

আবহাওয়ার ঝঞ্ঝাবাত্যার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্জনসাধনা ও সমাজসেবা। সেকারণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আর্তত্রাণ ও দুর্গতজনের সেবা পরমার্থ-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইউরোপের বিভিন্নস্থানে জার্মানী এবং সুইটজারল্যাণ্ডের শিক্ষিত সমাজকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন : "নিরলস অধ্যবসায় গুণে দরিদ্রনারায়ণের সেবা বাঞ্ছনীয়, শিষ্টাচার রক্ষা করিতে গিয়া সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিলে চলিবে না। সত্যই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, সত্যসাধনার উপর অনন্ত সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। মানব-জাতি স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে চায়, নিজের দুর্বলতা দমন করিতে পারে না, স্বজন-বান্ধবের বিরুদ্ধাচরণ করে,—ফলে আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে।

॥ জার্মানীতে ॥

জার্মানীর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে তিনি বলিয়াছিলেন : "প্রয়োজনবোধে আমরা যে সকল কাম্যবস্তু লাভ করি তাহা প্রকৃতির বুকে সযত্নে সঞ্চিত আছে। রূপরসগন্ধভরা বিচিত্র এ' জগতে যে সকল সুন্দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অকৃপণ হস্তে ঢালিয়া দেওয়া আছে তাহা যথাসম্ভব আহরণ করিয়া অভাব মিটাইতে হইবে। মানবসমাজ হইতে প্রেম-মৈত্রীর সাহায্যে, সহানুভূতি ও অনুরাগের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতে হইবে। পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বজনীন প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এক সম্পদায়, এক মানবজাতির কল্পনা ও সংগঠন দুঃসাধ্য মনে হইবে না। সহযোগিতা, ঐক্যবোধ বিশ্বপ্রেমের মূলমন্ত্র। প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের বিনিময় দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে জগতে, তথা ইহ সংসারে স্বর্গ রচনা করা যায়"।

গভীর চিন্তাক্ষেত্রে এইপ্রকার অনুশীলন ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের ফলে ভারতীয় দর্শনের ও হিন্দুসাধনার মূর্ত্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত বোধ করিলেন। বিশ্রামহেতু শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থানে গমনের বাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন বন্ধুর আহ্বান আসিল। ঈশ্বরপরায়ণ বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সে আমন্ত্রণ বিধিনির্দিষ্ট নিমন্ত্রণ বলিয়া গণ্য করিয়া অপার তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাঁহার তিনজন বিশিষ্ট সুহৃদের নিকট হইতে আহ্বান-লিপি আসে। তাঁহারা স্বামিজীকে ইউরোপে ভ্রমণ ও অবসরবিনোদনের জন্য অনুরোধ জানাইলে শিশুসুলভ সরলতা-পূর্ণ বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান ও শ্রীমতী জে. এইচ. সেভিয়ার (J. H. Sevier) এবং কুমারী হেনরিয়েটা মুল্যর (Miss Henrietta Muller) তাঁহার ইউরোপখণ্ডে ভ্রমণ ও বিশ্রামের পরিকল্পনা স্থির করিয়া স্বামিজীর সহিত পরিভ্রমণে সঙ্গ লয়েন। এ' প্রস্তাবে স্বামিজী ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সম্মতি প্রদান করেন। সুইটজারল্যাণ্ড দেখিতে সমধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া স্বামিজী বলিলেন : "আমি সুমনোহর তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী ও বিস্ময়কর পার্বত্য পথগুলি দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসিয়া আছি"।

॥ সুইটজারল্যাণ্ডে ॥

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে এক শুভ্র আপরাহ্নে স্বামিজী বন্ধুগণসমভিব্যাহারে লণ্ডন মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ছাত্রবর্গ ও শিষ্যগণ অন্তরের সহিত বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সুন্দর সুইটজারল্যাণ্ডের এক নিভৃত পল্লীর মনোরম পরিবেশে স্বামিজী আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক শুভমুহূর্তে তিনি একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। এই হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রখানি তাঁহার পরিভ্রমণের পরিকল্পনা আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

সুইটজারল্যাণ্ডের অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পল্লীশ্রীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ প্রেমপূর্ণ আহ্বান লিপিখানি প্রাপ্ত হন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পল ড্যসেনের নিকট হইতে। Paul Deussen (1845-1919) ছিলেন জার্মানী দেশের অন্তঃপাতী কিড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক। ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় চিন্তাধারার সুমনোহর অনুবাদ ও সুবিজ্ঞ ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ভিন্ন এই মনীষী সোপেনহারের (A. Schopenhauer) একনিষ্ঠ শিষ্য হিসাবে সোপেনহার-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ পল ড্যসেন ॥

অধ্যাপক ড্যসেন কিছুকাল ধরিয়া স্বামিজীর বক্তৃতা ও দার্শনিকতত্ত্বের বিশদব্যাখ্যা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সেকারণ লণ্ডনের ঠিকানায় স্বামিজীকে পত্রযোগে স্বকীয় ভবনে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। স্বামিজীকে তিনি মৌলিক চিন্তার এক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভাবান পুরুষ মনে করিতেন। তাঁহার নিজের বেদান্তদর্শনের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়া এবং স্বয়ং সম্প্রতি হিন্দুস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য তিনি স্বভাবতই স্বামিজীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে এবং তাঁহার সহিত ভারতীয় দর্শনের কতিপয় দুরূহ সমস্যা আলোচনা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

স্বামিজী সেজন্য ইংলণ্ডদেশে ফিরিবার পূর্বে কীয়েল (Kiel) নগরীতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু তাঁহার গৃহস্বামী বা অভিভাবকগণ তাঁহাকে সুইটজারল্যাণ্ড-ভ্রমণ সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িতে চাহিলেন না এবং বলিলেন কীয়েল-যাত্রা করিবার পূর্বে পথে জার্মানীর আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

সেকারণ স্বামিজী তৎপরে পর্যবেক্ষণ করেন শফহ্যান (Schaffhansen)। এ'স্থান হইতে রাইননদীর সুদৃশ্য জলপ্রপাত সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি মুগ্ধনেত্রে দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তিনজন ভ্রমণকারী হাইডেলবার্গ (Heidelberg) অভিমুখে যাত্রা করেন। এইস্থান প্রসিদ্ধ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেন্দ্রস্থল। কীয়েলে দুইদিন অতিবাহিত করিয়া এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং নগরীর উপর প্রাসাদ-দুর্গ অবলোকন করিয়া তাঁহারা কোবলেনজে (Coblenz) আসেন। একরাত্রি এখানে কাটাইয়া পরদিন ষ্টীমারযোগে ভ্রমণ-

কারীগণ মনোরম রাইননদীর উৎপত্তির দিকে গমনপূর্বক কোলন নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মহতী নগরীতে তাঁহারা কয়েকদিন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। পুলকনেত্রে স্বামিজী বিরাট কোলন-গির্জার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সেখানের প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন। এই পবিত্র ধর্মস্থান দেখিয়া স্বামিজী প্রীত হইয়াছিলেন।

শ্রীমান ও শ্রীমতী সেভিয়ার (Sevicr) তাঁহাদের প্রিয় অতিথিকে (স্বামিজী) কোলন থেকে একেবারে কীয়েল লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বার্লিন মহা-নগরী দেখিতে বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করায় তাঁহারা তাঁহার মনস্তুষ্টিবিধান উদ্দেশ্যে পর্যটনতালিকার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এইভাবে স্বামিজীর পরিক্রমার প্রসার বাড়িয়া যায় এবং ড্রেসডেন প্রভৃতি নগরীগুলি পরিদর্শন করিয়া পরমতৃপ্তিবোধ করেন। দেশের সাধারণ সমৃদ্ধি এবং বহুবিধ সহরের অগণিত আধুনিক বাসভবন দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। বার্লিন-মহানগরীর সুপ্রশস্ত পথঘাট, সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ, রমণীয় উদ্যান প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বামিজী ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ প্যারিস সহরের সহিত তুলনা করিলেন।

ড্রেসডেন তাহার পরবর্তী গন্তব্যস্থান বুঝিয়া স্বামিজী মৃদুস্বরে দ্বিধাপূর্ণভাবে বলিলেন : "অধ্যাপক ড্যসেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমাদের অধিকদিন দেরী করা উচিত হইবে না"। এজন্য তাঁহারা সদলবলে একেবারে কীয়েল-নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই যাত্রার যে একটি সুললিত বিবরণ শ্রীমতী সেভিয়ার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি-য়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার স্বামী শ্রীমান সেভিয়ারের (Sevier) সহিত স্বামিজীর সঙ্গে ড্যসেন পরিবারে কীয়েলে (Kiel) নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন : "আমার স্মরণে আছে কীয়েল জার্মানীর একটি সহর—বলটিক সাগরে অবস্থিত। এই সুন্দর সহরের স্মৃতি আমার নিকট উজ্জ্বল-ভাবে রহিয়াছে। ঐস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পল ড্যসেনের (Paul Deussen) সঙ্গে একদিন আমরা বিপুল আনন্দের সহিত কাটাইয়াছি। তাঁহার দার্শনিকতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার শক্তি ছিল অসীম ও অসাধারণ। ইউরোপীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে।

স্বামিজী হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পত্র প্রেরণ করেন যে, পরদিন প্রভাতে যেন অনুগ্রহপূর্বক স্বামিজী তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে প্রাতরাশে যোগদান করেন। অতিবিনয়সহকারে আমাকে ও আমার স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত আহারে যোগদান করিতে বিশেষ অনুরোধ জানান। পরদিন প্রভাতে ঠিক দশটার সময় আমরা তাঁহার ভবনে গিয়া উপস্থিত হই। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের গ্রন্থাগার-কক্ষে লইয়া গিয়া আমাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর তিনি আমাদের ভ্রমণ ও স্বামিজীর পরবর্তী কার্যতালিকা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অনন্তর অধ্যাপক টেবিলের উপর খোলা একটি

পুস্তকের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থবিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করেন। জ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন : "উপনিষৎ এবং বেদান্তসূত্রে প্রতিষ্ঠিত বেদান্তদর্শনের প্রণালী মানবজাতির সত্যসন্ধানে বিরাট প্রতিভার এক মূল্যবান অবদান। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যগুলি অপূর্ব মেধা ও শক্তিমান ধী, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির পরিচায়ক। বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যক্ষফল সর্বোচ্চ ও সুনির্মল নৈতিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ। অধ্যাপক মহাশয় আরও বলিলেন : "আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন উৎসমুখে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার এক প্রচেষ্টা চলিতেছে। সে আন্দোলন ভারতবর্ষকে সকল জাতির আধ্যাত্মিক নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে,—জগতের সর্বোচ্চ ও মহত্তম প্রভাবকেন্দ্র রূপে গণ্য করিবে"।

ডঃ ড্যসেন স্বয়ং যেসকল অনুবাদ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন হইতে করিতেছিলেন, স্বামিজী তৎপ্রতি গভীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, কতিপয় দুর্বোধ্য ও দুরূহ বাক্যের সঠিক তাৎপর্য ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা সুরু হইল। স্বামিজী দেখাইলেন সংজ্ঞা বা definition-এর স্পষ্টতা মুখ্য এবং পরিপাট্য, লালিত্য বা সুন্দর প্রকাশভঙ্গী (elegance of diction) গৌণবস্তু-রূপে প্রয়োজনে আসে। এমন দৃঢ়তা ও বোধগম্য-রূপে প্রাচ্য শাস্ত্রব্যাখ্যাতা (স্বামিজী) উপলব্ধির সূক্ষ্মতা বুঝাইলেন যে, জার্মান বিজ্ঞপ্রবর (অধ্যাপক ড্যসেন) অবিলম্বে উহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। স্বামিজী এইভাবে তাঁহার হৃদয় জয় করিলেন"।
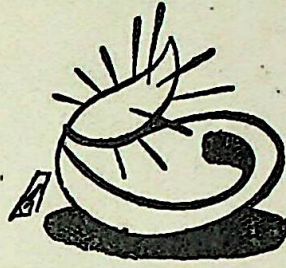
॥ তৃতীয় অবদান ॥

॥ দূরদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

মাত্র উনচল্লিশটা বছরে একটা মানুষ সারাবিশ্বে কী ভাবে ধর্ম, কর্ম ও সমাজ-সেবার ঢেউ তুলতে পারেন, বিশ্বের মানুষকে কী ভাবে মুগ্ধ-বিস্ময়ে হতভম্ব করে রাখতে পারেন, নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে কী ভাবে অনায়াসে মানুষকে স্ববশে আনতে পারেন—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজের জীবন দিয়ে আমাদের তা' দেখিয়ে গিচেন। তিনি দেখিয়ে গিচেন : এই পৃথিবীতে এসে শুধু নিজের পুজোতেই ব্যস্ত থাকা আর ভালমন্দের টানাপড়েনে পড়ে হাসতে-হাসতে আর কাঁদতে-কাঁদতে জরা-জীর্ণ দেহখানা নিয়ে একদিন চিতায় উঠাই জীবনের চরমকাম্য নয়। ওটা জন্তু-জানোয়ারের যোগ্য কার্য। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ কর্মে। স্বামিজী বলতেন : আগে কর্ম, পরে ধর্ম। আগে সমাজসেবা, পরে আত্মসেবা। আর একটা মোক্ষম কথা তিনি বলেছিলেন : 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'।

এই 'চালাকি'-ই আমাদের সর্বনাশ আজও করচে। উঠতে বসতে আমাদের চালাকি। লেখাপড়ায় আমাদের চালাকি, তাই এত মেড-ইজি, শর্ট-কার্ট, শিওর-সাকসেস। কথায়-বার্তায় আমাদের চালাকি, তাই এত ব্লাফ আর বাজে কথা। সভা-সমিতিতে আমাদের চালাকি, তাই এত চীৎকার ফাঁপা কলসীর মতই। রাজ-নীতিতে চালাকি, তাই এত দলাদলি আর গালাগালি। পূজা-পার্বনে আমাদের চালাকি, তাই এত চাঁদা, মাইক আর মেরাপ। চাকরিতে আমাদের চালাকি, তাইতো অন্যেরা এসে আমাদের চেয়ার দখল করেচে। ব্যবসায়ে আমাদের চালাকি, তাই ক্রমাগত দোকানের সাইনবোর্ড বদল। সাজ-সজ্জায় আমাদের চালাকি, তাই পথে-ঘাটে এত ভড়ং। শিল্পে আমাদের চালাকি, তাই চারিদিকে এত হ-য-ব-র-ল। সঙ্গীতে আমাদের চালাকি, তাই হরেকরকম্বা সুরের আর স্বরের সারমেয় ডাক। সাহিত্যে আমাদের চালাকি, তাই কবিতা অস্পষ্ট ও অখাদ্য। উপন্যাস, সাবানের ফেনা ছাড়া কিছু নয়।

আসলে সব তাতেই আমাদের চালাকি। আমরা অতি চালাক। আমাদের মতে, আর সবাই বোকা। তাই আজ অতি চালাকের গলায় দড়ি। বাঙ্গালী

স্বামিজী বাঙ্গালীর ধাত জানতেন, তাই বাঙ্গালীকেই লক্ষ্য করে বুঝি তিনি পরম সত্যটি জানিয়েছিলেন : 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'।

স্বামী বিবেকানন্দের ঐ বাণীটির মত কোন বাণীই আজ বাসি হয়নি। তিনি প্রায় সত্তর আশি বছর আগে যেসব কথা, যেসব সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আজকের বাঙ্গালীর জীবনে তার সবগুলোই প্রায়ই প্রযোজ্য। এতে এইটুকুই বোঝায়, আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। জাতীয় উন্নতি আমাদের এককণাও হয়নি। হতে পারে, সেদিনের কলকাতা আজ লোকারণ্যে পরিণত। হতে পারে সেদিনের ভারত আজ স্বাধীন। হতে পারে, সেদিনের বঙ্গীয় আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন, সমাজ-সাহিত্য বদলে গেচে, কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব-চরিত্র আজও লাট্টুর মতই একই জায়গায় ঘুরচে শুধু। অবিশ্বাস, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, দলাদলি সব যেন গলাগলি করে রয়েচে বাঙ্গালীর জীবন-প্রাঙ্গণে। এ লক্ষণ অসুস্থতার, এ লক্ষণ মারাত্মক।

আশ্চর্য, একশো বছর আগেকার পুরোন স্বামিজী যা করেছিলেন বা ভেবেছিলেন আজ আমরা তাই-ই করি—মানে, কিছুটা করেই ভাবচি, আমরা নতুন কিছু করলাম। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের উদ্বোধন কোন্ কালে তিনি করে গেচেন কোনো এক অস্পৃশ্যের এঁটো হুঁকো টেনে। আজ আমরা দেশে বিদেশে গিয়ে ভারতের জয়ধ্বনি করচি, কিন্তু স্বামিজী অনেক আগেই সে পথ দেখিয়ে দিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন : 'যা, তোরাও সব বাইরে গিয়ে দেখে আয়, দেখিয়ে আয়'।

আজ আমরা বলচি—স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই। এবং স্বামিজী সে কথা আগেই বলেচেন : 'ওরে, ঠাকুর দেবতা এখন তাকে তুলে রেখে, শরীরটাকে বাগিয়ে তোল্। নইলে ভাঙ্গা মন্দিরে ঠাকুরকে বসাবি কোথায়?' আমরা আজ ভাবচি, সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহার করে ভাষায় কী গতিই না এনেচি! স্বামিজী তাঁর তেজস্বী লেখনীর মাধ্যমে অনেক আগেই বাংলা ভাষার পোষাকী-পোষাক খুলে দিয়ে আটপৌরে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়ে আমাদের বৈঠকে বসিয়ে গেচেন। সে দিন একাজ বড় সহজ ছিল না। অসম সাহসের দরকার ছিল।

আর, আজ আমরা মর্মে মর্মে বুঝচি শিক্ষার অভাব। সে অভাবও স্বামিজী বুঝেছিলেন অনেক আগেই। বুঝেছিলেন—সুশিক্ষার অভাবে কোন জাতই বড় হতে পারে না। সবদেশেরই উন্নতির কারণ সুশিক্ষা। জাতির ভাবী-সম্পদ যারা তাদের শিক্ষা ও শৃঙ্খলার দিকে যদি নজর দেওয়া না হয় তবে ড্যাম-ব্যারেজ, পাঁচশালা, পরিকল্পনা ও নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা কোন কিছুতেই কিছু হয় না। টাকা থাকলে বা টাকা ধার করে অট্টালিকা-এমারত গড়া যেতে পারে; কিন্তু সে প্রাসাদকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই শিক্ষা। দেশকে ভালবাসা শেখানো আইন করে হয় না—অন্তরে আগ্রহ জাগাতে হয়। স্বামিজী একথা বুঝেছিলেন বলেই তিনি ধর্ম-মার্গের মানুষ হয়েও কাঁসর-ঘণ্টা না ধরে কলমের দিকেই হাত বাড়ালেন। বললেন্ : 'আগে শিক্ষা, দীক্ষা পরে। দীক্ষা

আসবে আপনা থেকেই'। তাই তাঁর শিষ্যদের দিলেন এই নির্দেশই : বাপুরা, আগে মানুষ তৈরী কর্, পরে মনুষ্যত্ব আশা করিস্।

কিন্তু তাঁরাই বা কতটুকু করবেন? চারিদিকে গোয়াল আর খাটাল—মাঝখানে একটা তিনতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে 'বাঃ বেশ, আহা মরি' করবার কিছু নেই। চারিদিকে দুর্গন্ধময় ধোঁয়া, সেখানে একটা ধূপকাঠির কাছে আমরা কতটুকু সৌরভ আশা করতে পারি? তবে হতাশ হবারও কিছু নেই। মহাকালের রথের চাকা আজও সচল। বাঙ্গালী একদিন রথের চাকার উপর দিকটায় উঠেছিল, আজ হয়তো স্বাভাবিক নিয়মেই নেমে এসেচে নীচের দিকে। আবার উঠবে। উঠতেই হবে। এ চাকা যে থামে না। আর যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে। আমরাও উঠবো। যে জাতির মধ্যে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন এবং আরো বহু মনীষীর আবির্ভাব, সে জাতি দীন নয়, ক্ষীণ নয়, নিষ্ফলাও নয়। আজ আমাদের সব কিছুতেই আন্তরিক হতে হবে। হুজুগ ছাড়তে হবে। নিজের জাতকে ভালবাসতে হবে। তবেই সব হবে।

স্বামিজীর জন্মশতবার্ষিকী যদি আমরা ঘটা করে নাও করি, তাতেও ক্ষতি নেই। কারণ লোক দেখানোটাই বড় কথা নয়। আমরা যদি ঘনিষ্ঠ হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে স্বামিজীর উপদেশাবলী নিয়ে আলোচনা করি, তাঁর নির্দেশ পালন করবার চেষ্টা করি, তবেই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করা সার্থক হবে। আজ শুধু সভাসমিতি করে নয়—ঘরে ঘরে স্বামিজীর বাণী পাঠ করা দরকার। বোঝা দরকার তাঁর বক্তব্য, চলা দরকার সেই মত।

আজ বড় দুর্দিন। রোগটা ক্রনিক। ওষুধ কিন্তু সামনেই আছে। বড় ডাক্তার অনেক আগেই প্রেসক্রিপসন করে গেচেন। এখন সে ওষুধ না খেয়ে রোগ পুষে রাখা বোকামি—পাগলামী।

তবে পাগলেও কিন্তু নিজের ভাল বোঝে।

।। চতুর্থ অবদান ।।

।। বিরাটপুরুষ বিবেকানন্দ ।।

যুগেযুগে দেশেদেশে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কখনো সাধারণ ঘরে কখনো সম্পন্নঘরে আবার রাজার ঘরেও জন্মাবেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের মতই তাঁদের খেলাধুলা আমোদ-আহ্লাদ এবং পড়া-শোনাও হয়। ঘরের লোক, পাশের মানুষ তাঁদের নিজেদের মতই মনে করে। যেন গাছতলায় ছড়ানো অসংখ্য বীজের মতই তাঁরা তাদের মধ্যে মিশে থাকেন। কিন্তু সহসা একদিন সেই ছড়ানো বীজের অঙ্কুরের মাঝথেকে একটী বিরাট মহীরুহ দেখা দেয়। সেদিন সকলে অবাক হয়ে ভাবেন, কেমন করে এমন হল !

কিন্তু তাই হয় যুগেযুগে। রাজপুত্র তো কত লক্ষ লক্ষ জন্মেছেন, কিন্তু রামচন্দ্র একজনই জন্ম নিয়েছেন। রাজার মেয়ে তো কেউ ছিলেন, কিন্তু রাজকন্যার ছেলে শ্রীকৃষ্ণ একটীই আছেন জগতে। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবও রাজ্যত্যাগী এক রাজপুত্র। চিরকালের ইতিহাসে মাত্র একজনই। যিশুখ্রীষ্ট একজন সাধারণ সূত্রধরের পুত্র। কিন্তু দু'হাজার বছরের মধ্যে এমন সূত্রধর পুত্র আর একটীও পাওয়া যাবে না। ইসলাম-ধর্মপ্রবর্তক হজরৎ মহম্মদ পশুপালক রাখাল বালক ছিলেন, কিন্তু ইসলামধর্মের ইতিহাসে এমন মানুষ আর কেউ আসেন নি। শ্রীচৈতন্যদেবও সাধারণ ঘরের অতি দুরন্ত বালক ছিলেন, কিন্তু এই ৪০০ বছরেও অমন আবির্ভাব আর একটীও দেখা যায় নি।

শ্রীধাম কামারপুকুরেও শতাধিক বর্ষ আগে এমনি একজন মানব শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতিসাধারণ গৃহস্থঘরে জন্ম নিয়েছিলেন—যাঁর শিক্ষা দীক্ষা অতি সাধারণ গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণের মতই ছিল। বংশগৌরব, ঐশ্বর্য কিছুই ছিল না। কিন্তু কেমন করে যে তিনি মানুষের মনোজগতে মহারাজার সিংহাসন পেতে বসেছেন, বিরাটপুরুষ পরমপুরুষের আকার ধরেছেন, কেউ বলতে পারবেন না। কিন্তু তাই হয়েছে। এই বিরাটপুরুষের পাশে যিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই এক আশ্চর্য বিরাট মানুষ, তিনি আমাদের আজকের আশ্চর্য পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা সকলেই প্রায় জানেন। একটী সম্পন্নঘরের দুর্দান্ত সাহসী তেজস্বী ছেলে। পড়া-শোনার, গান-বাজনার, কুস্তী-খেলার আয়োজন

সেসময়ের বহু গৃহের মত তাঁদের বাড়ীতেও ছিল। পিতা বড় উকীল। লোকজন, গাড়ী, ঘোড়া স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণও কম ছিল না।

কিন্তু এত সব জিনিষের মাঝে কিশোর বয়স থেকে কেমন করে কোথায় লুকিয়ে ছিল তাঁর ঈশ্বর-দর্শনের কামনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে, 'ঈশ্বর কেমন, দেখেছেন কিনা'—সে প্রশ্নও করেন।

এইটিই তাঁর বিরাটের অঙ্কুর। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। সমাজের সভ্যও ছিলেন। অতি সুকণ্ঠ গায়ক, সেজন্য নানা স্থানে ডাকও পড়ত।

সহসা ঐ ১৮।১৯ বছরের সময় ছেলেটীর একদিন দেখা হয়ে গেল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। গান গাইলেন। ঠাকুর মুগ্ধ হলেন। ঠাকুর যেন চিনলেন তাঁকে তাঁর আপনজন বলে। তিনি কিন্তু ধরা দিলেন না। বিশ্বাসও করলেন না ঠাকুরের আকৃতি কিন্তু তবুও প্রশ্ন করলেন : 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন…?'

এসব কথাও আপনাদের প্রায় জানা কথা।

আমি বলছি তারপরের ইতিহাস। কিথেকে কি হল, কি পেলেন নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ, কিভাবে সে আশ্চর্য জাগৃতি বিরাটপুরুষের। যেন গভীর নিদ্রামগ্ন সিংহের সহসা ঘুম ভেঙ্গে উঠে আকাশ অরণ্য বিদারণ করা গর্জন।

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর. বরানগরের মধ্যে প্রায় অনাহারে থাকা কটী বালক-যুবকের জীবনকথাও আজ আর কারুর অজানা নাই। কিসের জন্য, কি পাবার জন্য, কিন্তু তাঁরা যে ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিলেন তাও স্পষ্ট কারো জানা নেই। অবশেষে সেই কি বস্তু পাবার জন্য তাঁরা কেউ কেউ সেই অর্ধাশনের আশ্রমও ছাড়লেন। তার আগেই আঁটপুরে তাঁদের গৈরিক নেওয়া হয়ে গেছে। সহসা বেরিয়ে গেলেন স্বামিজী অর্দ্ধাশনে অনশনে ভিক্ষা করে তীর্থের পথে পথে কখনো হেঁটে কখনো ভিক্ষা করে পাথেয় সংগ্রহ করে। এই হল তাঁর ভারতদর্শন। ভারত যে কত দরিদ্র, কত দীন, কত মূঢ়, কত অলস, আবার কত সৎ, কত শান্ত, স্বামিজী তা দেখলেন। নিজের সুখের আরামের কথা একবারো ভাবেন নি সেই ভ্রমণে। কি ভেবেছিলেন—কি ভাবতেন তিনি?

সেই তখন নগণ্য সন্ন্যাসীর অতুলনীয় আশ্চর্য ভাবনার প্রথম প্রকাশ—প্রথম দান জগৎ সহসা একনিমেষে দেখতে পেল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম-সভায় একটি বক্তৃতায়।

সেই এক মুহূর্তেই বিশ্ববাসী দেখতে পেল এক বিরাটপুরুষ বিবেকানন্দকে। প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধদেবের পর এই গৈরিকবাস সন্ন্যাসী যিনি ভারতের বেদান্তদর্শনকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন, বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নিলেন, বিশ্বের কৌতূহল জাগ্রত করে দিলেন।

আর আশ্চর্য, তারপর থেকে শুধু ধর্ম নয়, শুধু বেদ-বেদান্ত নয়, কোথায় কোন্ বিষয়ে—ইতিহাসে, সাহিত্যে, কলা-শিল্পে, সঙ্গীতে, স্থাপত্য থেকে. দেশের শিক্ষা-সংস্কারে, দারিদ্র্যে, পরাধীনতার বেদনায়, সমাজের অন্যায়ে, অনাচারে, নরনারী

জাতিবর্ণনির্বিশেষে কোন্ সমস্যায় তাঁর চিন্তার স্বচ্ছ আলো পড়ে সেই অন্ধকার দিকগুলি উজ্জ্বল করে আলোকিত করে নি বলা শক্ত। স্বামিজীর রচনায় তাঁর মুখের উক্তি যেখানে পাওয়া যাবে সেইখানেই তাঁর চিন্তা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

স্বামিজীর সম্বন্ধে অ্যানি বেসান্টের উক্তি পাই 'যোদ্ধা সাধু'।

তাঁর মানসপুত্রী নিবেদিতাও বলেন : 'আমার আচার্যদেব ছিলেন বীর সন্ন্যাসী'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি আছে। নারায়ণ দরিদ্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সেবা পেতে চান।......একেই বলে বাণী।......এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের মনকে উদ্বোধিত করেছে কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে, মুক্তির বিচিত্র পথে। যদি ভারতকে জানতে হয়, তবে তাঁহার বাণী পড়। তাঁর বাণী সর্বাংশে প্রাণপ্রদ, মোটেই নিষেধাত্মক নয়।

সুভাষচন্দ্র বলেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দুটি প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মত আমিও মনে করি রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ একটি অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুটি রূপ'।

নিবেদিতার লেখায় পাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : নির্জন জেলে তাঁর সঙ্গী ছিল গীতা আর উপনিষদের বাণী ও ধ্যান। এবং তিনি ১৫ দিন ক্রমান্বয়ে বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ও সান্নিধ্য অনুভব করেছেন।

তাঁর সম্বন্ধে মহামানবদের কথা ছেড়ে দিলেও অসংখ্য সাধারণের কাছে স্বামিজীর এক একটি উক্তিই আলোচনাই যেন মূর্তিমতী বাণী। যেন মন্ত্রের মত আশ্চর্য উক্তি। সেই কয়েকটি বাণী একটু বলি। এই দেশের দুঃসময়ে আমাদের মনে নতুন আশা ও বল সঞ্চার করবে। এখন দেশের এই দুর্যোগের দিনেও বেশী করে সকলের মনে জাগছে ঐ ৬০ বছর আগে অন্তর্হিত বীর সন্ন্যাসীর বজ্রকণ্ঠের বাণী যেন আজকেই বলা উক্তির মতই একটি সজীব সতেজ বলিষ্ঠ সেই বাণী : 'হে ভারত, আগামী পঞ্চাশ বছর আর তোমাদের কোন দেবতার প্রয়োজন নেই। দেশই তোমাদের একমাত্র দেবতা হোক'।

উন্নতিপ্রসঙ্গে—'উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। উন্নতির মুখ্য সহায় হল স্বাধীনতা। পাশ্চাত্যজাতির জীবনের স্তম্ভ হচ্ছে চরিত্র। আমরা যতদিন না এরূপ শতশত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারছি, ততদিন আমাদের কোন শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করে লাভ নেই'।

তেজপ্রসঙ্গে—'বীর্যই পুণ্য, দুর্বলতাই পাপ। উপনিষদে এমন একটি শব্দ আছে, যা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশি ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে, তা হচ্ছে অভী। এক হস্তে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্তে অন্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিতে চাও কর'।

শিক্ষাসম্বন্ধে—'বিদ্যা কাহাকে বলে ? বই পড়া, নানাবিধ জ্ঞানের জন্য ? তাহা নহে। যে শিক্ষায় ইচ্ছাশক্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফল হয় তাহাই শিক্ষা। পাঁচটি

সৎভাবকে যদি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার তাহলে যিনি সমগ্র লাইব্রেরী কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন তাঁর চেয়ে তোমার শিক্ষা বেশী'।

ধর্মবিষয়ে—'মনে রেখো সত্যই ধর্ম আর ধর্মই সত্য। চালাকী দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ আর মহাবীর্যের দ্বারাই সব কাজ হয়'।

ভাবসম্বন্ধে—'আমাকে বিশ্বাস কর। আমার মত হবে। আরো বড় হবে'।

ঔদার্যবিষয়ে—'বিস্তারই জীবন। প্রেমই জীবন। সঙ্কোচই মৃত্যু। দ্বেষই মৃত্যু'।

ত্যাগসম্পর্কে—'সংসার ত্যাগ করা মানে অহং বুদ্ধি ত্যাগ করা'।

আত্মবিশ্বাসে—'নিজেকে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তাতেই সব হবে। নিজেকে বিশ্বাস না করলে কোনো কাজই সফল হবে না'।

স্ত্রীজাতির প্রসঙ্গে বলেছেন: শাস্ত্র স্মৃতি নিয়ম-নীতিতে মেয়েদের দমবন্ধ করে রেখে একেবারে যেন যন্ত্র বানিয়ে ফেলেছে। মহামায়ায় সাক্ষাৎ প্রতিমা মেয়েদের এখন না তুললে আর উপায়ান্তর নাই। মনু বলেছেন, যেখানে নারীর পূজা হয় সেখানে দেবতারা বাস করেন। রামকৃষ্ণদেব স্ত্রীগুরু গ্রহণ করেছিলেন। নারী-ভাব ও মাতৃভাবে সাধন করেছিলেন। মেয়েদের ধর্ম শিক্ষা বিজ্ঞান ঘর-করনা শরীর-পালন সব শিক্ষা দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সংঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাই, মীরাবাই এঁদের জীবনকথা শোনাতে হবে, জানাতে হবে, তবেই এঁরা নিজেদের সেইমত উপযুক্ত জীবন গঠন করতে পারবেন। বীর জননী হবেন। আবার অন্যত্র বলেছেন: একটী ডানাতে যেমন পাখীর উড়তে পারা সম্ভব নয় তেমনি মেয়েদের উন্নতি অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণ সম্ভাবনা নেই। এই জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব প্রচার আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের উদ্যোগ—যাতে গার্গী, মৈত্রেয়ীদের মত অথবা আরো উচ্চ ভাবের নারী হতে পারে।

জাতির সম্বন্ধে তাঁর উক্তি: বুদ্ধাবতারে প্রভু বলেছেন এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ জাতি। জন্মগত, ধনগত, গুণগত সর্বপ্রকার ভেদই দুঃখের কারণ। আত্মায় জাতি নাই, স্ত্রীপুরুষের বর্ণাশ্রম ভেদ নাই। বল সব ভারতবাসী আমার ভাই। মুচি মেথর দরিদ্র হীন চাষাভূষো সব ভারতবাসী আমার রক্ত, আমার ভাই। তারা বেরিয়ে আসুক তাদের কুটীর থেকে ঝোপড়ী থেকে। যারা নীরবে সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সহ্য করেছে। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে।

স্বামিজী তীর্থ-সম্বন্ধে বলেছেন: তীর্থে সাধুরা বাস করেন বহু পবিত্রভাব সেখানে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও একটীও মন্দির না থাকে, শুধু সাধুরাই থাকেন তাহলে তাকেই তীর্থ বলতে হবে। আর কোথাও যদি শত শত মন্দির থাকে আর অসাধু লোক বাস করে তাহলে সেটা আর তীর্থ থাকে না।

মাত্র উনচল্লিশ বছর স্বামিজী বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁর উক্তির যেন শেষ নেই। যে বইয়ের যেখানটা খুলি, যতবার পড়ি, নতুন মনে হয়। সব উক্তিই স্পষ্ট বলিষ্ঠ

সংক্ষিপ্ত অথচ চিরন্তন বাণীমন্ত্র। এই জগৎব্যাপী তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে কত জ্ঞানী গুণী তাঁর কথা বলছেন, কিন্তু সে বলা তাঁর কথাতেই যেন তাঁকে বলা। তাঁর বাণীর প্রদীপের আলোতেই তাঁকে দর্শন করা। একেই লোকে বলেন, 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'। এমন হৃদয় ও মস্তিষ্ক, মমতা ও দয়া, বলিষ্ঠ বিচার, স্বার্থহীন চিন্তা, সর্বময় ভাব, সর্বভূতময় আত্মদর্শন যেন সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বস্তু।

বলেছিলেন : একটী বস্তু যার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে, সেটী হচ্ছে পরমত-সহিষ্ণুতা—যা এলে সে শান্তিলাভ করবে, সম্পূর্ণতা পাবে।

যৌবনে একদিন তিনি ঈশ্বরদর্শনের আকাঙ্খায় ঈশ্বর খুঁজে বেড়িয়েছেন, যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। সে দর্শন কি তাঁর হয়েছিল?

তাঁর সেই মহা-অন্বেষণ, মহা-জিজ্ঞাসা সার্থক হয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনের মাঝে, কর্মের মাঝে, ধর্মের মাঝে, বাণীর মাঝে, সেই জীব শিব ঈশ্বরই লাভ করেছিলেন, দর্শন করেছিলেন।

তাঁর সব উক্তির সার ও সংহত উক্তি হল :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।
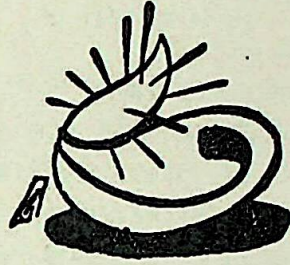
॥ পঞ্চম অবদান ॥

॥ বেদের দেবতা ইন্দ্র ॥

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের এক সম্মেলনে বেদের দেবতা ইন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, যদিও ইন্দ্র ঋগ্বেদে অন্যতম প্রধান দেবতারূপে কীর্তিত হয়েছেন তা' হলেও দ্যৌ, বরুণ, মিত্র এবং আদিত্য, বসু বা রুদ্র ইত্যাদি অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের মতই ইন্দ্রকে সাধারণ প্রকৃতিভিত্তিক দেবতা বলে গণ্য করা যায় না। দেবতা হিসাবে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্র নবীন ; এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে ইন্দ্রের বিবর্তন খুবই উল্লেখযোগ্য। ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্র যে ঋগ্বেদোক্ত নানাজাতির অন্যতম কোন এক জাতির বীর সন্তান, এবং পরে ঐ জাতি এবং শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রসারণশীল বৈদিক জাতিগুলির অবিশংবাদী নেতৃ দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত ছিল। সভায় আলোচনায় এই প্রসঙ্গের নূতনত্ব, আগ্রহের সঙ্গে অনুসৃত হলেও প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই খুব রুচিপ্রদ হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে বেদের দেবতা ইন্দ্র সম্পর্কে আরও কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাহিত্যকর্ম ভারতধর্মসমূহের মূল উৎস বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কাল এবং অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের বিচারে ঋগ্বেদের মূল্য এখনও সম্পূর্ণভাবে নির্ণিত হয় নাই। একসময় অনুমান করা হত, ঋগ্বেদে উল্লিখিত মন্ত্রের রচয়িতারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক ১৫০০ বছর আগে ভারতভূমিতে অনুপ্রবেশ করেন। এঁদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে বহুগবেষণার পর য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা একসময় সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, এঁরা মধ্য য়ুরোপ থেকে ভারতের দিকে আসেন। এরপর কিছুদিন আগে পূর্বতুরস্কে পাওয়া কয়েকটি লিপিতে ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য ইত্যাদি বেদের দেবতার নাম পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি খ্রীষ্টের জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বেকার রচনা। হালে একদল পণ্ডিত (Stuart Piggot-Prehistoric India) প্রচার করতে চাইছেন যে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছরের কাছাকাছি কোন সময়ে ইন্দ্রপরিচালিত আর্যেরা প্রখ্যাত

সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োকে বিধ্বস্ত করেছিল। বেদের দেবতা ইন্দ্র ও আর্যদের সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসের অনেকগুলি সমস্যা সম্পর্কেই একটা স্থিরতায় পৌঁছানো যাবে এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্বান্বসন্ধানী পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে এই সিদ্ধান্তের পরিপোষণ করায় ভারতের সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাসের গবেষকরা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ইতিহাস সন্ধানী পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এর ফলে প্রাচীন ইতিহাস অন্বেষণের ক্ষেত্রে একটা স্থিতাবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ভারতের সরকারী ইতিহাস অন্বেষণকারীরা প্রাচীন ইতিহাসের বৈদিক জাতিগুলির সঞ্চরমাণতা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। যেন ঐ দায় য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের জন্য উদ্ধার করে রেখে গিয়েছেন! সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এখন প্রধানত প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকারী ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের সম্বন্ধে অন্বেষণেই যেন বেশী তৎপর। যদিও মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে নিত্যনূতন গবেষণা ও আবিষ্কারের সংবাদ পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে তা'হলেও পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বিস্ময় ও রহস্যের আধার বৈদিক ইতিহাস সম্পর্কে স্বাধীনতা লাভ করবার পরেও ভারতবর্ষে গবেষণা এক পাও অগ্রসর হয় নাই।

পিগটের মতে, অর্ধসভ্য আর্যজাতিগুলির হাতেই সিন্ধুসভ্যতার বিলুপ্ত ঘটে। ঋগ্বেদের পরাক্রান্ত ইন্দ্রই ছিলেন এই আর্যভাষাভাষী জাতিগুলির নেতা। অবশ্য একথা সত্য বলে গৃহীত হলে এই ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সমগ্র বেদান্ত সাহিত্য (ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ) পাণিনির ব্যাকরণ ও যাবতীয় প্রাক্‌বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সামান্য চার'শ বছরে এই বিস্তৃত সংস্কৃতি গড়ে ওঠা সম্ভব কিনা এ'বিচার এখনও হয় নাই। অন্যদিকে পূর্বতুরস্কের ইন্দ্র বরুণাদির নাম সম্বলিত প্রাচীন লিপির রহস্যেরও কোন সমাধান করা সম্ভব নয়। তার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্রেরা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে পারঙ্গম হলেও ভারতইতিহাসের আদিবিন্দু সম্পর্কে অনবহিতই রয়ে যাচ্ছে।

পিগট আর যাই করে থাকুন একটা বিষয় সম্পর্কে পিগটের মত উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করছি। তাঁর অভিমত অনুসারে ইন্দ্র ছিলেন আর্যভাষাভাষী জাতিগুলির নেতা। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে বিচার করলে ইন্দ্রের এই নেতৃরূপ ধরা না পড়ে পারে না, এবং এই নেতা হিসাবে ইন্দ্রকে সেই জন্যই প্রথমে মানুষ এবং শেষে সমাজে দেবতা রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায়।

ঋগ্বেদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র সম্পর্কে বহু মন্ত্র এবং বহু স্তুতি পাওয়া যায়। সংখ্যায় ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্পর্কে স্তুতি অন্য যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতি অপেক্ষা বেশী। ইন্দ্র-সম্পর্কিত স্তুতির সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। এ' ছাড়া অন্যান্য

দেবতাদের সঙ্গেও ইন্দ্রের নাম আরও প্রায় ৫০টি সূক্তে উল্লেখ দেখা যায়। ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যাক্‌ডোনেল ইন্দ্রকে বর্ষণের দেবতা এবং আর্যেতর অধিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রামে আর্যদের জয়লাভে সহায়তাকারী দেবতা রূপেই প্রধানত বর্ণনা করেছেন।

॥ বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র ॥

ঋগ্বেদ এবং তৎপরবর্তী সাহিত্যে ইন্দ্রের সঙ্গে যে সমস্ত রূপক কাহিনী (Mythology) জড়িত আছে তার মধ্যে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধই প্রধান। ঋগ্বেদের মতে বৃত্রের বধের জন্যই ইন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। অবশ্য ইন্দ্র ছাড়া অগ্নি এবং সোম নামে অন্য দুই জন দেবতাকেও বেদে বৃত্রের নিধনকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই দুই দেবতার মধ্যে অগ্নিকে বজ্রের দাহিকা শক্তি এবং সোমকে ইন্দ্রের শক্তির উৎস উদ্ভিজ্জ পানীয় রূপেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয়দের যেমন বেদ, প্রাচীন পারসিকের (বা ইরানবাসীদের) তেমনি জেন্দ আবেস্তা; এই আবেস্তাতেও বৃত্রনিধনকারী এক দেবতার উল্লেখ আছে। এই দেবতাকে বলা হয়েছে বেরেত্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন)। সমস্ত আবেস্তায় দুইবার ইন্দ্রেরও উল্লেখ আছে; আবেস্তার ইন্দ্র অশুভশক্তির প্রতীক। আবেস্তার মতে দেব শব্দও অশুভ শক্তির প্রতীক; আবেস্তার প্রধান দেবতা আহুর মাজদা শুভশক্তির প্রতীক উজ্জ্বল অসুর। আবেস্তায় বর্ণিত গুণাবলীর অনুসরণ করে পণ্ডিতেরা অসুর মাজদাকে ঋগ্বেদে বর্ণিত অন্যতম প্রধান দেবতা বরুণের ইরাণীয় প্রতিরূপ বলে গ্রহণ করেছেন। ঋগ্বেদেও বরুণকে অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত ঋগ্বেদে দেবতাদের প্রায়শঃই অসুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায়। তবে বরুণ, মিত্র, সূর্য ইত্যাদি দেবতাদের যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুররূপে বর্ণনা করা হয়েছে ইন্দ্রকে তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেব বলে বর্ণনা করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বার দু'এক ইন্দ্রকেও অসুর বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের জন্মের উল্লেখ আছে; ইন্দ্রের পিতামাতার উল্লেখও দেখা যায়। অন্যান্য দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত হেঁয়ালীতে পূর্ণ। সকল সৃষ্টির আধার সীমাহীন অন্তরীক্ষকে বৈদিক মানস 'দ্যৌ' এই নামে কল্পনা করেছেন; এই দ্যৌ সকল দেবতার পিতা, আর পৃথিবী দেবতাদের মাতা। পৃথিবীকে অদিতিও বলা হয়েছে; এই সূত্রে দেবতাদের অন্য নাম আদিত্য। ঋগ্বেদে আদিত্যদের মধ্যে বরুণকেই প্রধান বলে উপলব্ধি করা যায়। ইন্দ্রকেও ক্বচিৎ আদিত্য রূপে উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য দেবতার মত ইন্দ্রকে যে সাধারণত দ্যৌ ববং পৃথিবীর সন্তান বা আদিত্য বলে গণ্য করা হত না এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের জন্মকালে সমস্ত দেবতারা ভীত হয়ে পড়েছিল, ঋগ্বেদে এই কথার উল্লেখ আছে (ঋ ৫।৩০।৫)। তাঁর পূর্বে যারা জন্মেছেন বা তাঁর পরে যারা জন্মাবেন মানুষ বা দেবতা কেউই ইন্দ্রের সমকক্ষ হবেন না (৪।১৮।৪; ৭।৩২।২৩; ৬।৩০।৪; ৫.৪২।৬ ইত্যাদি)। ইন্দ্রের এই প্রতিদ্বন্দ্বী-হীনতার প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে পূর্বতন (পূর্বে) দেবতাদের শক্তি ও প্রাধান্য ইন্দ্রের দৈবী মহিমা ও রাজকীয় মর্যাদার দ্বারা ম্লান হয়ে গিয়েছিল (৭।২১।৭)।

এমনকি বরুণ এবং সূর্যকেও প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তে ইন্দ্রের আজ্ঞাবহ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১।১০১।৩)। এই ধরনের আরও অনেক প্রমান থেকে ইন্দ্রকে অন্যান্য দেবতাদের থেকে স্বতন্ত্র বলে সহজেই অনুমান করা যায়। বৃত্রকে সংহার করে ইন্দ্র বৃত্রের অধিকার থেকে স্রোতস্বতীদের মুক্ত করেছিলেন, বৃত্রবধের রূপক কাহিনীর এইটিই হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য। ঋগ্বেদের বহু সূক্তেই ইন্দ্রের এই পরমাশ্চর্য, অলৌকিক এবং প্রবল শক্তির দ্যোতক কর্মতৎপরতার পরিচয় উল্লিখিত আছে। এই রূপক কাহিনীকে পণ্ডিতেরা বর্ষণবিমুখ মেঘের গায়ে বজ্রের আঘাত ও বারিসিঞ্চনের কাল্পনিক চিত্র রূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। দেবতা রূপে ইন্দ্রের বিবর্তনে প্রধানত এই প্রাকৃতিক ঘটনাটিই ইন্দ্রের দৈবী প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং ইন্দ্রকে প্রবল শক্তিশালী এবং দেবতা-কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত করা হয়ে থাকলেও প্রধানত ইন্দ্রকে বর্ষণের দেবতা রূপেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল দেখা যায়। যে জনসমাজকে কৃষিকর্মের জন্য প্রকৃতির সদিচ্ছা ও বর্ষণরূপ আশীর্বাদের উপর নির্ভর করতে হয়, সেই সমাজের পক্ষে বর্ষণের দেবতা যে প্রভূত মর্যাদা পাবেন এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। ইরাণীয় সমাজ ছিল প্রধানত মেষপালক ; কৃষিনির্ভর সমাজের পক্ষে বজ্রবিদ্যুৎসহ বর্ষণ যতই কাম্য হউক বিচরণশীল মেষপালের পক্ষে বজ্রবিদ্যুৎ ও বর্ষণ প্রবল অশুভ ও মৃত্যুরই দ্যোতক। তাই মূলত এক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হলেও এই দুই সমাজ প্রধানত ইন্দ্রদেবতা তথা বজ্রবিদ্যুৎ ও বর্ষণের অন্তর্নিহিত শক্তির কাম্যতা ও অকাম্যতা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

॥ ইন্দ্রের প্রকৃত স্বরূপ ॥

পূর্ববর্ণিত প্রসঙ্গ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইন্দ্র ভারত-ইরাণীয় সমাজে খুব আদৃত ছিলেন না। পরে কৃষিনির্ভর সমাজে ইন্দ্র ক্রমে সকল প্রাচীন দেবতাদের (অসুরদের) অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই কৃষিনির্ভর সমাজ ভারতেই অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকলেও সম্রাট ডেরিয়াসের আমলেও যে পারস্য দেশে দেবপূজক বা ইন্দ্রানুরাগী সমাজের অস্তিত্ব ছিল বেহিস্তানে প্রাপ্ত ডেরিয়াসের শিলালেখ থেকে তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। এই কৃষিনির্ভর সমাজের এক অংশই সুদূর পূর্বতুরস্কেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, বোগাস কোই লেখ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমাজে বরুণাদি পূর্বগামী দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলেও ইন্দ্র তাদের অতিক্রম করে দেবতাবর্গের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। বোগাস কোই লেখেও বরুণাদি বৈদিক দেবতার নামের আগে ইন্দ্রের নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারত য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর য়ুরোপে উপনিবিষ্ট জনসমাজে প্রাচীন দ্যৌ (গ্রীক্‌জিউস্‌ Zeus), সূর্য (গ্রীক্‌ হেলিয়স Helios), বরুণ (গ্রীক্‌ ঔরেনাস্‌ Ouranos), মিত্র (গ্রীকোরোমক মিথ্রাস Mithras) ইত্যাদির পরিচয় জ্ঞাত থাকলেও ইন্দ্র সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলে মনে হয় না। অতএব ইন্দ্রকে ভারত-ইরাণ ও মিতান্নিয় সমাজের বিবর্তনকালে উদ্ভূত বলে অভিহিত করা

যেতে পারে। আবার ভারত ও মিতান্নিয় সমাজে ইন্দ্রকে শুভশক্তির প্রতীক বলে গ্রহণ করা হলেও জোরোয়াষ্ট্রিয় আবেস্তিক সমাজ ইন্দ্রকে শুভশক্তির প্রতীক বলে গ্রহণ করে নাই।

ইন্দ্রের গুণাবলীতে দৈবী প্রবণতা যেমন লক্ষ্য করা যায়, দেবতাদের পক্ষে বিহিত নয় এমন গুণও ইন্দ্রে আরোপিত দেখা যায়। ঋগ্বেদের ইন্দ্র প্রভূত সোমপায়ী, কখনও সোমপানের ফলে উন্মত্ত, ক্রোধপরায়ণ এবং বৃত্রদ্বেষী। পরে শতপথ ব্রাহ্মণে গৌতমপত্নী অহল্যা সম্পর্কে ইন্দ্রের আসক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। অথর্ববেদের ইন্দ্র শচীপতি হওয়া সত্বেও অসুরনারীতে আসক্ত (অথর্ব ৭।৩৮।২) এবং কাঠক সংহিতায় বিলিস্তেঙ্গা নামে দানবীর সঙ্গে ইন্দ্রের প্রণয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও কোনও সূক্তে ইন্দ্রকে দ্যৌ এবং পৃথিবীর সন্তান (৬।৫৯।২) বা আদিত্য বলা হয়েছে তা' হলেও ইন্দ্রকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই যে ইন্দ্রকে অন্যান্য দেবতাদের মত দ্যৌর সন্তান বলা হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ অন্যত্র ত্বষ্টাকে ইন্দ্রের পিতা এবং নিষ্টিগ্রীকে মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১।৮০।১৪ ; ১০।১০১।১২)। সায়ন নিষ্টিগ্রীকে অদিতির অন্য নাম বলে অভিহিত করলেও স্বভাবতঃই নিষ্টিগ্রীকে ভিন্ন বলে মনে হয়। অথর্ববেদে (৩।১০।১২) প্রজাপতির কন্যা একাষ্টকাকে ইন্দ্রের জননী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র প্রজাপতি সকল দেবতার পিতা, সকল দেবতার কর্তা, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এই নূতন দেবতার নাম পাওয়া যায় ; প্রজাপতিকে প্রাচীন দেবতা সবিতৃর সঙ্গে এক বলে বলা হয়েছে (৪।৫৩।২)। অথর্ববেদে কৌশিক সূত্রে ত্বষ্টৃকে প্রজাপতি ও সবিতৃর সঙ্গে এক বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায়। ঋগ্বেদেও সবিতৃ ও ত্বষ্টৃকে এক বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৩।৫৫।১৯ ; ১০।১০।৫)। ইন্দ্রের পিতারূপে অভিহিত এই ত্বষ্টৃর ব্যক্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট কৌতূহল দেখা যায়। কারণ অন্যান্য দেবতাদের মত ত্বষ্টৃর দেবত্ব খুব স্বপ্রতিষ্ঠ নয়। দেবতা হিসাবে ত্বষ্টা ও সবিতা অভিন্ন ; কিন্তু কার্যকলাপের দিক থেকে ত্বষ্টার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ত্বষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নির্মাণ-পটুতা বা হস্তকৌশল। তিনি কৌশলী কারুশিল্পী (১।৮৫।৯ ; ৩।৫৪।১২)। তিনি অন্যান্য বহু বিচিত্র বস্তু ও সেই সঙ্গে ইন্দ্রের বজ্রও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দশম মণ্ডলে তাঁকে সকল কিছুর-ই রূপের স্রষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১০।১১০।৯)। তার কন্যা সরণ্যুর সঙ্গে মনুষ্যজাতির আদি পুরুষ বিবস্বতের পরিণয় হয় ; এই সরণ্যুর সন্তান যম ও যমী বেদের প্রথম মানব দম্পতি (১০।১৭।১)। ত্বষ্টাই সোমের স্রষ্টা (১।১১৭।২২)। সর্বোপরি ত্বষ্টার তিন পুত্র, অগ্নি (১।৯৫।২), ইন্দ্র (১।৮০।১৪) ও বিশ্বরূপ (১০।১০।৫ ; ২।১১।১৯)। বিশ্বরূপকে বেদে গোসমূহের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে (২।১১।১৯)। গো ঋগ্বেদে ঐশ্বর্যের প্রতীক। কিন্তু ঐ বেদেরই দশমমণ্ডলে বিশ্বরূপকে তিনটি মাথা ও ছয়টি চক্ষু সম্বলিত ইন্দ্র কর্তৃক নিহত অন্যতম এক দানব বলেও অভিহিত করা হয়েছে (১০।৯৯।৬)। এই দানব বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র, প্রভূত গাভী ও অশ্বের

মালিক (১০।৭৬।৩)। যদিও বিশ্বরূপকে অসুরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তা' হলেও তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিশ্বরূপকে দেবতাদের পুরোহিত রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়। শেষপর্যন্ত মহাভারতে (৫।২২) স্পষ্টই বিশ্বরূপকে বলা হয়েছে বৃত্রের সঙ্গে অভিন্ন ও এক।

এইসব প্রমাণ থেকে ইন্দ্রের উদ্ভব ও ইন্দ্র-বৃত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বজ্রকে একস্থানে পাথরের তৈরী (৭।১০৩।১৯) ও অন্যত্র ধাতু (লৌহ)-ময় বলে (১।৫২।৮) বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয় প্রস্তর যুগেই ইন্দ্রের পরিকল্পনা হয়েছিল। পরে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতিয়ারেরও বিবর্তন হয়েছিল। ঋগ্বেদে স্পষ্টই উল্লেখ আছে : ইন্দ্র তপস্যার দ্বারা স্বর্গে স্থানলাভ করেছিলেন (১০।১৬৭।১)। অন্যকোন দেবতাকে তপস্যার দ্বারা স্বর্গ অধিকার করতে হয় নাই। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃহত্যা ইন্দ্রের মানবীয় সত্বার পরিচায়ক। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ত্বষ্টা সম্ভবত বিশ্বরূপের পক্ষপাতী ছিলেন ; ইন্দ্রের হাতে তাই পিতাও রক্ষা পান নাই। ইন্দ্র ক্রোধবশে পিতাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেন নাই। ঋগ্বেদের অন্যকোন দেবতাকে ভ্রাতা বা পিতার হত্যাকারীরূপে বর্ণনা করা হয় নাই। ইন্দ্রের ভ্রাতৃহত্যার ঘটনা পরবর্তীকালে রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকলেও পিতৃহত্যার কাহিনীর কোন রূপক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বেদের দেবতারা (অসুরেরা) ঋত বা ন্যায়নীতির পরিপোষক রূপেই কীর্তিত হয়েছেন। ইন্দ্রকে কোনমতেই খুব ন্যায়নীতির পরিপোষক বলা যায় না। তা' সত্বেও তাকে দেবতা-পদে বরণ করা হয়েছিল; আবার শুধু সাধারণ দেবতাই নয়, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে ইন্দ্রকে অন্যান্য প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে কৌশিক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে (১।১০।১১)। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কৌশিকেরা ইন্দ্রের প্রীতির পাত্র বলেই ইন্দ্রকে কৌশিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান হয় যে, কৌশিকরা ইন্দ্রেরই উত্তরপুরুষ, এই সূত্রেই তারা নিজেদের গোত্র ইন্দ্রে আরোপ করেছিল। ইন্দ্রের পুত্রের নাম কুৎস। কুৎসকে দেবতা অপেক্ষা মানুষ বলেই অনুমান হয়। কুৎসের মতই আয়ু এবং অতিথিগ্বের কথা ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে ; এঁরা সকলেই ইন্দ্রের অতি প্রিয়পাত্র। অনুমান হয় আয়ু এবং অতিথিগ্ব ইন্দ্রের বংশেরই অধস্তন পুরুষ। অতিথিগ্ব ঋগ্বেদে দিবোদাস নামেও পরিচিত। দিবোদাসের পুত্র সুদাস ঋগ্বেদে প্রখ্যাত দাশরাজ্ঞ সংগ্রামের বীর বিজেতা। এইসব নানা উপকরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব দুরূহ নয় যে, ইন্দ্র হয়ত প্রারম্ভে কোন বিশিষ্ট বৈদিক উপজাতির নেতা ও প্রখ্যাত বীর রূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, পরে পরিপূর্ণভাবে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হন।

॥ ষষ্ঠ অবদান ॥
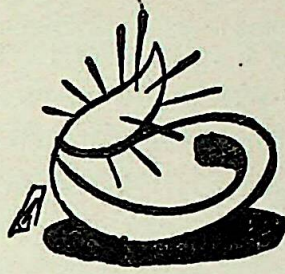
॥ ভারতের শিল্পসাধনা ও অজন্টা ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভারতবর্ষকে চিনতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে অবশ্যই জানতে হবে"। বস্তুতঃ ভারতের সাধনা, জীবন ও ধর্মের এরূপ মহত্তম প্রতিভূর পূর্ণবিকাশ জগতের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। এই মহামানবের ভারতবর্ষেই সুদূর এক গৌরবময় অতীতে যে মহিমান্বিত সংস্কৃতির অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাকে অতুলনীয়ও বলা চলে। সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এবং বিশেষভাবে শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে অজন্টার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামিজী বলেছেন: "যেমন সঙ্গীতে একটা করে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরই এক-একটা মুখ্য ভাব থাকে"। ভারতের এই মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। তাই ভারতের যা-কিছু সমস্তই ধর্মভিত্তিক। এই ধর্মগত পরিবেশকে কেন্দ্র করেই ভারতের শিল্পপীঠগুলি গড়ে উঠেছিল। অজন্টার যেখানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জনপদের অন্তরালে সে একটি নিভৃত গিরিকন্দর। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার যে শাখাটি উত্তরদিকে বিস্তৃত হয়ে খান্দেশের ঠিক সীমান্তে এসে পড়েছে সেখানে তার নাম হয়েছে ইন্দ্যাদ্রি। এই ইন্দ্যাদ্রির বুকের উপর অজন্টার গুহাশ্রেণী নির্মিত হয়েছে। পাহাড়টার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি এরূপ সৌন্দর্যশ্রীমণ্ডিতা ও সুষমাময়ী এবং সংস্থান-গুহা-নির্মাণের এ-রকম উপযোগী যে, সেরূপ উপযুক্ত স্থান পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় আর নেই। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি স্থানে এবং সানুদেশ হতে প্রায় আড়াই-শো ফুট উপরে খরস্রোতা স্রোতস্বিনী বাগ্‌হুরা পূর্বদিক্ হতে নেমে এসে পাহাড়টার কোল ঘেঁষে ঘুরে গেছে। ইন্দ্যাদ্রির অন্তরালে গিরিমালার এক নিভৃত উৎস হতে নদীটার উৎপত্তি। পাহাড়ের বন্ধুর গাত্র বেয়ে নামতে নামতে সহসা বাগ্‌হুরা প্রায় একশো ফুট নীচে সপ্তধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সপ্তধারায় সাতটী কুণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। মনে হয় যেন কুণ্ডগুলির স্বচ্ছ নির্মল জল পার্বতীয় স্রোতের দুর্বার গতি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য; আবার সেগুলির জল তাদের পথ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে। বাগ্‌হুরার বুকে যখন বর্ষার ঢল নামে, তখন তার গতি চপল স্রোতে উচ্ছলতর তীব্রতর হয়ে ওঠে, উদ্দামতাও শতগুণে বৃদ্ধি পায়—তখন আর বাগ্‌হুরা অতিক্রম করে সহজে গুহাগুলিতে যাবার

উপায় থাকে না। তার সপ্তধারা যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে, তারই সন্নিহিত প্রস্তরস্তূপ-গুলির মাথায় মাথায় হংস-বলাক-কলাপী-বনকপোত-সরিদ্‌বিহঙ্গের নিত্য আসর বসে। এই অভূতপূর্ব মনোরম দৃশ্য কবি ও রূপশিল্পীর কল্পনার মতই সুন্দর। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যেই দেড় হাজার বছরেরও আগে সে-যুগের বিরাট্‌তম শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

অজন্টার এই পটভূমিকা নিয়েই একদিন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যে-কথা বললেন এখনও তা হৃদয়ে গ্রথিত আছে। তিনি বলেছিলেন: "শিল্পীর রাজা যিনি, তিনি তো জগৎজোড়া সৃষ্টি করেছেন। সেখানে কত রস, কত আনন্দ! আর আমাদের শিল্পীরা মনের আবেগ, দৃষ্টি ও সাধনা দিয়ে তাঁদের বিষয়বস্তুগুলো খুঁজে নিয়েছেন, আর খুঁজে নিয়েছেন তাঁদের সাধনার জায়গা। তাই তো তাঁদের শিল্পসৃষ্টি এত মহিমান্বিত হয়েছে"!

পারিপার্শ্বিকতার দিক্ দিয়ে বিচার করলে অজন্টার পরিবেশের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সে-যুগের সাধক ও সাঙ্ঘিকেরা ছিলেন শান্তিপ্রিয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, লোকলোচনের অন্তরালে এমন কোন নির্জন স্থানে তাঁদের ধর্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে বিশ্বের কোলাহল ও অশান্তিময় জীবনযাত্রা তাঁদের ধর্মাচরণে কোনরূপ বাধা দিতে পারবে না। শুধু যে নির্জন স্থানের সন্ধান করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যও তাঁরা চাইতেন; কারণ মানসিক উৎকর্ষসাধনের মূলে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের যে যথেষ্ট প্রভাব আছে তা তাঁরা ভালভাবেই বুঝতেন। এজন্য নির্জন গিরিকন্দরে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির সন্ধান করা তাঁদের অন্যতম আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জড়জগতে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে সুখ ও দুঃখের যে বেদনা শাশ্বত হয়ে আছে, শান্তি ও সৌন্দর্যের আবহাওয়ায় তাঁরা সেই বেদনাটুকু এড়িয়ে যেতে চাইতেন। এর একটা মুখ্য উদ্দেশ্যও ছিল,—অন্তরকে নির্মল ও সুন্দর করে পরম-সুন্দরের সান্নিধ্যলাভই ছিল তাঁদের কাম্য। তাই এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় গুহাবিহারগুলির আবির্ভাব হয়েছে। শান্ত সৌন্দর্যের পরিবেশে বিহারবাসী সাঙ্ঘিকেরা ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় এবং পরমার্থচিন্তায় নিমগ্ন হবার সুযোগ পেতেন। আর যাঁরা শিল্পী, তাঁরা পার্থিব সঙ্কীর্ণতার বাইরে এসে ভাগবত প্রেমের পরাকাষ্ঠা নিয়ে সুমহান্ শিল্পসৃষ্টিতে ব্রতী হতে পারতেন।

অজন্টার গুহাগুলি যেখানে অবস্থিত, পূর্বকালে সেখানে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে স্বাভাবিক গুহার মত ছিল। খ্রীষ্টজন্মের অনেক আগে বৌদ্ধ যতিগণ এখানে এসে বাস করছিলেন। তাঁদের জ্ঞানসাধনার খ্যাতি ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ভারতের জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী সাধকেরা জ্ঞানার্জন ও মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত করবার জন্য আসতে থাকেন। ফলে অজন্টাতীর্থ এক মহাবিদ্যালয়ে পরিগণিত হয়ে বিশিষ্ট সঙ্ঘারামে পরিণত হলো। সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ও দক্ষিণভারতের রাজা-রাজড়াদের দৃষ্টিও এসে পড়ল। এই নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, শিল্পী ও শিল্পরসিকদের একাগ্র সহযোগিতায়, সন্ন্যাসী ও শ্রমণগণের আত্মত্যাগে এবং শিক্ষার্থী ও জনগণের উৎসাহে

অজন্টার নির্মাণের কাজ ও তার শিল্পসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রগতির শুরু হলো। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর নির্মাণের ও শিল্পসংরক্ষণের কাজ চলেছিল। সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালের পরেই অজন্টার ১০নং চৈত্যগুহাটী নির্মিত হয়েছিল। তারপর কনিস্ক, হর্ষ, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ও অন্যান্য গুপ্ত-সম্রাটদের সময় তার প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি ও গৌরব সর্বোন্নত সীমায় উপনীত হয়। চালুক্যরাজেরা ও বাকাটক নৃপতিরাও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। হর্ষের রাজ্যাবসানের পর বৌদ্ধধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানে ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ছিল, সেই সময়েই অজন্টা-সংস্কৃতির সমাপ্তি। তখনও কিন্তু অনেকগুলি গুহার নির্মাণকার্য শেষ হয় নি—সেগুলি অসমাপ্তই থেকে যায়; হয়তো বা অন্য কোনো কারণেও সেগুলিতে আর হাত দেওয়া হয় নি।

অজন্টার গুহাসমষ্টি সর্বসমেত উনত্রিশটী—নীচে বাগ্‌হুরার বুক থেকে ৩৫ হতে ১১০ ফুট উঁচুতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাইল ধরে সেগুলি তৈরী। আবিষ্কারের পর সেগুলিকে পশ্চিমদিক থেকে সংখ্যানুক্রমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; তাদের মধ্যে ৯, ১০, ১৯ ও ২৬ সংখ্যক গুহাগুলি চৈত্য এবং অবশিষ্টগুলি বিহার। সোপানশ্রেণী দিয়ে উঠলে প্রথমেই পাওয়া যাবে ৭ নং গুহা। এই গুহারই বাঁ-দিকে ৬ নং হতে ক্রমান্বয়ে ১ নং পর্যন্ত ও ডানদিকে ৮ নং হতে তদূর্ধ্বের বাইশটী গুহা। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে যে উত্তর-পূর্বমুখী গুহা ও চৈত্যগুলি তৈরী হয়েছিল, সেগুলিতে অনাগারী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন। তাঁরা সূর্যোদয়ের সমবধারণায় বুদ্ধের আরাধনা করতেন না, তাঁরা বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রতি আত্মসমাহিত হতেন,—আর্য-পল্লীর উত্তরদিকের প্রতীকস্বরূপ রাত্রির তমসাবৃত আকাশ তাঁদের আদর্শ ছিল। চৈত্যগুহাগুলির অনাড়ম্বরতা দেখে তাঁদের বিলাসবিহীনতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। চৈত্যগুহাগুলির ছাদ অর্ধবৃত্তাকার খিলান-দেওয়া—মন্দির-স্থাপত্যের 'বিমানে'র আদর্শ রক্ষিত হয়েছে। দেওয়াল-সংলগ্ন সারিবদ্ধ অনাড়ম্বর স্তম্ভশ্রেণীর উপর খিলান স্থাপিত। কোন কোন চৈত্যের প্রবেশদ্বার তিনটী, আর উপাসনাগৃহের শেষপ্রান্তে বিরাট্ স্তূপ। এই স্তূপই ছিল বৌদ্ধদের পূজ্য। প্রবেশদ্বারগুলি অবশ্য অপূর্ব কারুশিল্পে পরিশোভিত। তিনটী দ্বারের ব্যবস্থা সম্ভবতঃ এজন্য যে, তিনটীর মধ্যবর্তীটী আচার্যদের জন্য, আর উভয় পার্শ্বের দুটী ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারী ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। উপাসনার জন্যই চৈত্যগৃহের ব্যবহার হতো।

গুহাগুলির মধ্যে যেগুলি বিহার বলে নির্দিষ্ট, সেগুলির সম্মুখভাগ উচ্চাঙ্গের তক্ষণশিল্পসমৃদ্ধ সারি সারি স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত বারান্দাসংলগ্ন। বারান্দার পরে চতুষ্কোণ হল-ঘর—উপাশ্রয়-গৃহ। কোন কোন বিহারের বারান্দার উভয় প্রান্তে একটী করে প্রকোষ্ঠ—গর্ভগৃহও নির্মিত হয়েছে। বারান্দা পার হয়েই বিহারের প্রবেশদ্বার। সাধারণতঃ প্রবেশদ্বারের দুই পাশে একটী করে ছোট জানালাও আছে। উপাশ্রয়-গৃহের ছাদ কারুমণ্ডিত সমান্তরাল স্তম্ভশ্রেণীর উপর রক্ষিত; সেগুলির অবস্থান ও সুসঙ্গতি এতই ত্রুটিহীন, যেন গৃহের চারদিক বারান্দাবেষ্টিত বলে মনে হয়।

উপাশ্রয়-গৃহের প্রাচীরগুলিতে আবার গর্ভগৃহশ্রেণী; প্রাচীরগুলিতেই সেগুলির ছোট ছোট প্রবেশপথ; উপাশ্রয়গৃহের মধ্য দিয়ে ভিতরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই গর্ভগৃহগুলি বাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। উপাশ্রয়গৃহের সম্মুখপ্রাচীরে বুদ্ধমূর্তি সংস্থাপিত। এই গৃহতলে বসেই আচার্যগণ অধ্যাপনা, দর্শনের ব্যাখ্যা ও ধর্মোপদেশ দান করতেন।

উত্তর বা উত্তরপূর্বমুখী বিহার ও চৈত্যগুলির সর্বত্রই শিল্প-প্রাচুর্যের সমৃদ্ধিতে অপরিমেয় আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এলুরাকে আমরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করি। কিন্তু অজন্টা চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ হলেও এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য যেন কোন অংশে হীন নয়। স্থাপত্য-রচনায় শিল্পীরা অতি সূক্ষ্ম সঙ্গতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কোন বিহার বা চৈত্যের স্তম্ভশ্রেণীতে সুসঙ্গতির অভাব দেখা যায় না। অধিস্থান, উপপীঠ, স্তম্ভবপু ও বোধিকার একটীর সঙ্গে আর একটীর সঙ্গতি কোথাও বিনষ্ট হয় নি, অথচ এরূপ সুন্দর সূক্ষ্মশিল্পে সেগুলি নির্মিত হয়েছে যে, দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। চৈত্যগুলির সম্মুখের গবাক্ষ-রচনা অতি উন্নত শিল্পকলার নিদর্শন। এছাড়া উত্তীরা বা প্রস্তারের (প্রস্তারাগ্র, প্রস্তারমধ্য ও অধঃপ্রস্তার), ছাদের ও গৃহপ্রাচীরের সকল স্থানেই এমন সুনিপুণ ও পর্যাপ্ত তক্ষণ-শিল্পৈশ্বর্যের সমাবেশ করা হয়েছে যার তুলনা বিরল। এগুলির সঙ্গে চিত্রসম্ভারের সুসংযত সংস্থান সমগ্র পরিবেশটীকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। সর্বত্রই একটা সুন্দর রুচি, অপূর্ব শিল্পসাধনা এবং অদম্য কর্মসাধনা ও অধ্যবসায়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু অজন্টার প্রকৃত পরিচয় তার চিত্রে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রসম্মত সত্য, বৈণিক, নাগর ও মিশ্র—এই চারটী চিত্রকলা-পদ্ধতির মধ্যে প্রধানতঃ সত্য ও বৈণিক চিত্রশিল্প অজন্টায় স্থান পেয়েছে। সত্য ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় চিত্রাঙ্কন করতে হলে প্রথমেই দেবযোনি ও স্বর্গীয় চিত্রেরই পরিকল্পনা করতে হয়। ললিতকলার ক্ষেত্রে ভারতের সর্বত্রই এই নীতি ও রীতি লক্ষ্য করা যায়; কারণ দেবোদ্দেশেই শ্রেষ্ঠ শিল্প গৌরবলাভের সুযোগ পেয়েছে। অজন্টার বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধের সুমহান্ জীবন-কাহিনী, দেবদূতরূপে বোধিসত্ত্ব এবং সম্ভবতঃ ছাদে আঁকা পাক্ষিক স্বর্গের চিত্র—এগুলি সমস্তই সত্য বা আদর্শপন্থী। এই স্বর্গীয় চিত্রাবলী প্রত্যক্ষে বা গৌণতঃ সাধন ও ধ্যানের উপর পরিকল্পিত—একরকম ধ্যানযোগের উপর পরিকল্পিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৈণিক কলাপদ্ধতির দিক্ দিয়ে আমরা জাতকের গল্পগুলির প্রভাব দেখি সর্বাধিক। আর্যশূরের গল্পগুলিও অজন্টার প্রাচীরে স্থান পেয়েছে। জাতকের চিত্রগুলি লোকবৃত্তের অর্থাৎ সংসারচক্রের গতি ও প্রগতির প্রকৃতি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছে। অজন্টা-চিত্রের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলিকে মাত্র চিত্র বলেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না, কারণ এগুলির রসসংবেদ, প্রমাণ ও রূপভেদ এবং শারীর-সংস্থান ও আত্মার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। এছাড়া, এই শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তিগত শক্তির পরিচায়ক নয়, এতে কৌশলেরও সন্ধান পাওয়া
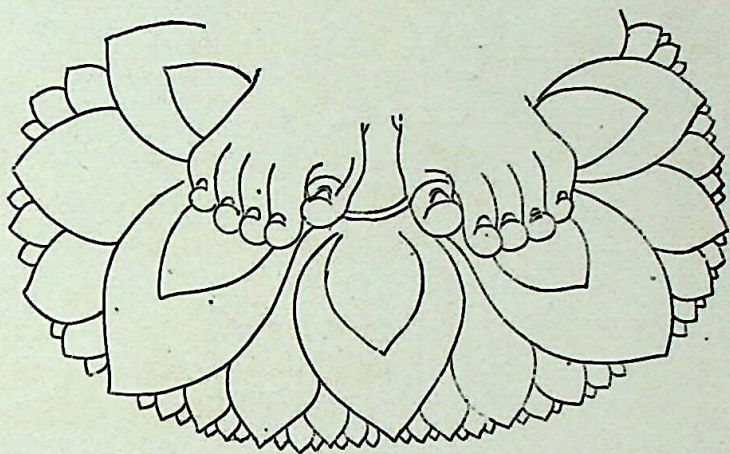
শ্বেতপদ্মদলে বুদ্ধচরণযুগল (২নং গুহা)
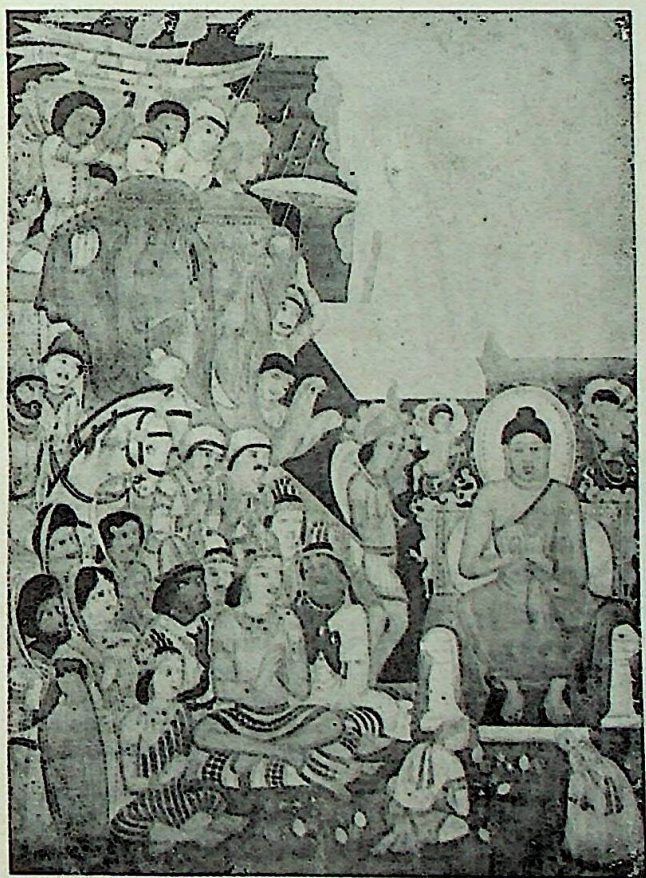
সারিপুত্ত-জাতকে বর্ণিত বুদ্ধের স্বর্গপরিক্রমার পর মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য (১৭নং গুহা)

১নং গুহায় অঙ্কিত পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব

হংসযূথ (মহাহংসজাতক)—২নং গুহা

পরিচারিকাদের সাহায্যে রাণীর প্রসাধন

বুদ্ধসন্দর্শনে রাহুল ও যশোধরা
(১৭নং গুহা)

যায়। কল্পনাদ্যোতক প্রতিভামাত্রই এতে স্থান পায়নি, বিচক্ষণতা ও ব্যুৎপত্তিও স্থান পেয়েছে—কলাবিজ্ঞানসম্মত আভ্যাসিকই এর প্রধান-অবদান। মূলতঃ এই শিল্প সুনিপুণ মননশক্তি ও চিত্রণশক্তির নিদর্শন।

এই চিত্রকলার সঙ্গে সম্যক্‌রূপে পরিচিত হতে হলে নৃত্যকলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী পরিচয় থাকা দরকার; কারণ সে-যুগে অভিনয়ের অভিব্যক্তি যে মাত্র রঙ্গমঞ্চেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল তা নয়, শিল্পকলাতেও তার প্রভাব পড়েছিল। সেজন্য মানবের গতি ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাষা চিত্রেও অনুকৃত হয়েছে। তারই ফলে অভিনয়ের নৃত্যভঙ্গীর অনুরূপ সাদৃশ্যই অজন্টা-চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। রস ও ভাবের যে অভ্যুপগম নাট্যকলায় পরিকল্পিত হয়েছিল, চিত্রে ও ভাস্কর্যেও সেই কল্পনা প্রয়োগ করা হয়েছে। রসাস্বাদনের পক্ষে যে-কোন রসিকের চিত্তে এতে আনন্দের উদ্রেক হতে পারে। যে-কোন রসভাবুক এই চিত্র প্রত্যক্ষ করলে তাঁর মনে সেই উপভোগের ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অজন্টা-শিল্প বিশেষভাবেই সংস্কৃত ও আভিজাত্যপূর্ণ। মূর্তিগুলিতে কমনীয়তা ও সমাহিত ভাব বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চিত্রকলাপদ্ধতির যে ছয়টী বিষয়ঃ 'রূপভেদ', 'প্রমাণ', 'ভাব', 'লাবণ্যযোজনা', 'সাদৃশ্য' ও 'বার্ণিকভঙ্গে'-র উল্লেখ করেছেন, এই চিত্রগুলিতে সেগুলির সম্যক্‌বিচার করা যেতে পারে। রূপভেদ অর্থে 'আকৃতি'-র প্রকারভেদ, ভাব—ভাবের অভিব্যক্তি, লাবণ্যযোজনা—লাবণ্য বা মাধুর্যের প্রয়োগকুশলতা, সাদৃশ্য—জীবনের ত্রুটিহীন পবিত্রতা, এবং বার্ণিকভঙ্গ—বর্ণবৈচিত্র্যের লীলা। বিষ্ণুধর্মোত্তর-আদি শিল্পশাস্ত্র-গুলিতে চিত্রাঙ্কনের সময় নরনারীর আকৃতি ও পরিমাণের যে-সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অজন্টা-চিত্রে সেগুলি যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে। মূর্তিগুলির বিজ্ঞান-সম্মত অঙ্গভঙ্গিমা ও চক্ষুর ভাবব্যঞ্জনা বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক। 'ক্ষয়' ও 'বৃদ্ধি'-র রীতি অনেকটা য়ুরোপীয় foreshortening রীতির মত, এবং তারই সাহায্যে অঙ্গের ভঙ্গিমাগুলি দেখানো হয়েছে। চিত্রলক্ষণে বিশেষ বিশেষ ভাবাভি-ব্যঞ্জনায় এবং দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চোখের যে-সব রচনা-নির্দেশ দেখা যায়, এখানে তার বৈপরীত্য মেলেনি। পাশ্চাত্যের light and shade হতে 'বর্তনা'-র একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেখানকার পদ্ধতিতে যেমন একদিকে আলো ও অপরদিকে ছায়ার টান দিয়ে চিত্রের কোমলতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, এখানে তা করা হয়নি; মাত্র গঠন দেখাবার জন্যই 'বর্তনা'-র ব্যবহার হয়েছে—তাতে চিত্রের স্বাভাবিক কোমলতাও অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

'চিত্রাভাস'-এর সাহায্যে প্রতিকৃতি-রচনার নির্দেশ শিল্পশাস্ত্রগুলিতে খুবই আছে। মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির যে সাদৃশ্যবোধ আসে, শিল্পসৃষ্টিতে চিত্রাভাস তাইই। সাদৃশ্য অর্থে শিল্পশাস্ত্রের প্রদত্ত সংজ্ঞাঃ 'তদ্ভিন্নত্বেসতি তদ্‌গতভূয়োধর্মবত্তম্‌',—অর্থাৎ রূপের ধর্ম একটী ভাবকে নিয়ে, আর রসের ধর্ম স্বতন্ত্র; কিন্তু সদৃশকরণ করতে হলে ভাব ও রস উভয়ের ধর্মকেই অনুসরণ করতে হবে। তাই, একমাত্র চিত্রাভাসের

৫

সমবধারণায় 'রসচিত্র' বা impressional শিল্পের সৃষ্টি সম্ভব। ইংরেজীতে যাকে আমরা observation বলি, সেইরকম 'দৃষ্ট'-বস্তুকে প্রথমেই হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। বাস্তব জগতে যা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে—শিল্পীর অভিজ্ঞতায় যেটুকু চিত্র মানসপটে দেখা দিয়েছে, তার প্রতিরূপ দেওয়া শিল্পসাধনার সবচেয়ে বড় কথা। ভাবের যে বহিঃপ্রকাশ তা সাধারণের মনোরঞ্জন করতে পারে বটে, কিন্তু চিত্রের মর্মটুকু তারা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে না; সেই অন্তর্নিহিত রূপটী রসিকের চোখে ধরা পড়ে। চিত্রের মর্মকথার 'ভাবনা' (impression) যখন রসিকের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে হৃদয়তন্ত্রীতে অভিনব ছন্দের দ্যোতনা নিয়ে আসে, তখন সে ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হয়। রসিক-চিত্তে স্বতঃই ধ্বনিত হবে—'অহো ভাবোপপন্নতা, অহো যুক্তলেখতা'। রসচিত্রের তাৎপর্য এখানেই।

অজন্টার ভিত্তিচিত্র সমস্তই প্রাচীরচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। তখনকার এই ভিত্তিচিত্র অনেকটা ইতালীয় fresco buano রীতির মত। তবে ইতালীয় ফ্রেস্কো-চিত্রের আবির্ভাবের হাজার বছরেরও আগে অজন্টার ভিত্তিচিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এবং বহু শত বর্ষ পরেও সেগুলি এখনও অতি সুন্দরভাবেই আছে। যে রসচিত্র-সৃষ্টির 'আভ্যাসিক' সেযুগে শিল্পসাধনার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, এই ভিত্তিচিত্রে তার সংরক্ষণ করাই সর্বাধিক অনুকুল ছিল। তৈলচিত্রের চেয়ে তার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। এদিক দিয়ে সেযুগের শিল্পীদের জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার মূল্য সামান্য নয়।

চিত্র যাতে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করতে পারে বা তাদের প্রশংসা অর্জন করতে পারে, সেদিকে শিল্পীদের দৃষ্টি ছিল যথেষ্ট। সেযুগে দর্শকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, আর বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুযায়ী চিত্রাঙ্কনের নিয়ম ছিল। বিষ্ণুধর্মোত্তরেও এ-কথা বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠেরা রেখার প্রশংসা করেন, রমণী অলঙ্কারের ঐশ্বর্য পছন্দ করে, আর সাধারণ দর্শক উপভোগ করে বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা। তখনকার শিক্ষাপীঠগুলিতে শিল্পের যে শিক্ষা শিল্পীদের নিতে হতো, শিল্পশাস্ত্রগুলিতে যে-সমস্ত নির্দেশ আছে, সমস্তই অজন্টার চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণিকভঙ্গের রীতি এখানে চূড়ান্ত অনুসৃত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে 'প্রসাধন-শিল্প'-এর (decorative art) প্রাচুর্যে সমস্ত শিল্পসৃষ্টিগুলিকে অপূর্ব ও মনোরম করে তোলা হয়েছে—একরকম শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেও বলা চলে। এই আলঙ্কারিকে চিত্রণে লীলায়িত লতা-পুষ্প, পশু-পক্ষী, অপ্সরগণ, কিন্নর-কিন্নরী, বিচিত্র নর-নারী প্রভৃতির সমাবেশ এক অভাবনীয় আয়োজন। প্রায় দেড় হাজার বছর অবহেলিত হয়ে লোকলোচনের অন্তরালে থেকেও এখনও তার রঙের খেলা সজীব হয়ে রয়েছে। শিল্পী অসিতকুমার হালদার তাঁর 'অজন্তা' গ্রন্থে একটি গুহাবিহারের ছাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন: "অজন্তা গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা এক বিচিত্র কাণ্ড। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য চাঁদোয়া টাঙ্গানো রয়েছে। প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে শ্বেতপদ্ম বিকশিত; আর তার চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিংবা

ময়ূর, অথবা মৃণালদল-মন্থনতৎপর হাতীর পাল; এবং চার কোণে নানারকম লতাপাতার কাজ"। নরনারীর বিলাসচিত্রও যথেষ্ট আছে। সৌন্দর্য-সুষমায় অভিষিক্ত করে অসংখ্য নারীচিত্রে অলঙ্করণের শোভা ও মাধুর্য বাড়ানো হয়েছে; নারী-চিত্রের সৌন্দর্য-সমাবেশ সমস্ত পরিবেশটিকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নারীকে অভিনব ভঙ্গীতে, রূপে ও ভাব-লালিত্যে তাঁরা পুষ্প বা পুষ্পমাল্যের মত রাজদম্পতি ও দেবদেবীর চারিদিক অলঙ্কৃত করেছেন—পথে, গবাক্ষে, অন্তঃপুরে নারীচিত্রের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। প্রসাধক শিল্পে (decoration) নারীচিত্রের এরূপ ব্যবহার অন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

ব্যবসায়ী বা পেশাদারী শিল্পীর কাজ কতখানি অজন্টায় স্থান পেয়েছে সে-কথা বলা শক্ত। তবে অবৃত্তিভোগী রাজবংশীয় ও সাধারণ কলাকুশলীরাও যে চিত্রণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা অনুমান করা হয়েছে। মূর্তিচিত্রের যথাযথ সংস্থানে, রেখার সাবলীলতায়, ছন্দে ও সামঞ্জস্যে, ক্ষয় ও বৃদ্ধির সম্যক্-তাৎপর্যে এবং নিম্নোন্নত রূপদ শিল্পের অনুকরণে 'বর্তনা'-র অর্থাৎ আলো-ছায়ার যথাযোগ্য সমাবেশে তাঁদের শক্তিমত্তা ও কৌশল অনুধাবন করা যেতে পারে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে আমরা দেখি, তখনকার যুগে রাজপরিবার, রাজসভার অভিজাতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করতে হতো। শিল্পীরা ললিতকলার অনুশীলন করতেন স্বীয় বৃত্তির অনুকূলে বা জীবনধারণের পন্থা-হিসাবে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা অভ্যাস করতেন একটা বিলাসের প্রবণতায় বা মনের খোরাক মেটাবার জন্য। রত্নাবলী, রঘুবংশ, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, উত্তররামচরিত প্রভৃতিও রাজপুরুষের চিত্রাঙ্কনের কথা বলেছেন। কামসূত্রেও প্রতি শিক্ষিতজনের গৃহে চিত্রাঙ্কনের মাল-মশলা রাখার কথা আছে। কলানুরাগ-প্রবৃত্তি ও শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সে-যুগের অভিজাতবর্গ ও রাজবংশীয়গণের মধ্যে মহান্ শিল্পীর সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁরাই একক বা সমবেত চেষ্টায় অজন্টা-প্রমুখ কেন্দ্রগুলিকে শিল্পতীর্থে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাত্ত্বিকেরা স্ত্রীসম্ভোগসম্পৃক্ত বা প্রেম-বিষয়ক চিত্র মোটেই পছন্দ করতেন না। এ-ছাড়া ভোগৈশ্বর্যেও তাঁদের যথেষ্ট বৈরাগ্য ছিল। কিন্তু অজন্টার প্রাচীর-চিত্রে এ-রকম চিত্র প্রভূত স্থান পেয়েছে। রাজ-অন্তঃপুরের আভিজাত্য বা অভিজাত অন্তঃপুরিকা-দের অঙ্গরাগলীলা ও প্রসাধন এবং অলঙ্কারাদির ঐশ্বর্য সাধারণ শিল্পীর পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়—অভিজাত ও রাজবংশীয়দের মধ্যেই সেই অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

অবশ্য অজন্টার চিত্রসম্ভার কোন্ কোন্ যুগে কোন্ কোন্ শিল্পী এঁকেছিলেন তা জানবার উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায় যে, বহু চিত্রকর সেখানে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন; কারণ একটি ভিত্তিভূমি বহু অংশে ভাগ করে এক-একটি শিল্পিদলের মধ্যে অংশানুক্রমে আঁকবার জন্য ভাগ করে দেওয়া হতো। প্রতিটী ভিত্তি-গাত্র একটি করে শিল্পিদলের হাতে ছিল। তাঁদের সঙ্গে সহকারীরাও থাকত। এই চিত্রকরেরা প্রথমে ভিত্তিভূমিটি জলে ভিজিয়ে তার উপর বজ্রলেপের আস্তরণ দিয়ে তাকে 'ধবলিত' করতেন। শুক্‌নো রঙ নারিকেলমালার পাত্রে গোলা

হতো। গুহাগুলির স্থানে স্থানে বাটির আকারে গর্ত দেখা যায়,—মনে হয় সেগুলিতেও গোলা হতো। আর প্রতিটী রঙের জন্য স্বতন্ত্র 'বর্তিকা' বা তুলি ব্যবহার করা হতো। ভিত্তিভূমি 'ধবলিত' করার আগে কঠিন লেখনী বা তুলির সাহায্যে রেখাচিত্র বা outline করার নিয়ম ছিল বলে মনে হয়। 'ধবলিত' করার পর যখন রেখাগুলি অস্পষ্ট প্রতিভাত হতো, তখন সেগুলি অবলম্বন করে শিল্পী রঙ বোলাতে আরম্ভ করতেন। এভাবে চিত্রটিকে 'উন্মীলিত' করে তিনি মন দিতেন পটভূমিতে। পটভূমির কাজ শেষ হলে আবার তাঁকে আলেখ্যে রঙের কাজ করে চূড়ান্ত চিত্রণ করতে হতো এবং তখনই তিনি 'নতোন্নত' রূপের অনুকরণে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে 'বর্তনা'-র কাজ শেষ করতেন। এভাবেই হতো তাঁর শিল্পশৈলীর সার্থকতা। হয়তো তাঁকে রাজকোষ হতে যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হতো, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের লালসায় তিনি আপনার প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিতেন না—শিল্পসৃষ্টির সদ্ধর্মের পরাকাষ্ঠায় ও স্বধর্মের অনুপ্রেরণায় তিনি এই কাজে ব্রতী হতেন। তাঁদের অপরিসীম দক্ষতা ও সৃজনপ্রতিভা তাই জগতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বোম্বাই আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্স্ সাহেব তাই বলেছেন (Indian Antiquary, vol. III, 1874, p. 26) : "The artists, who painted them, were giants in execution. Even on the vertical sides of the walls some of the lines which were drawn with one sweep of the brush struck me as being very wonderful ; but when I saw long, delicate curves drawn without faltering, with equal precision, upon the horizontal surface of the ceiling, where the difficulty of execution is increased a thousandfold, it appeared to me nothing less than miraculous".

শিল্পীর দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবনীয় সংযমেরও পরাকাষ্ঠা ছিল। সংশোধন ও পরিবর্তন করার নিদর্শন অবশ্য অজন্টায় অল্পবিস্তর আছে, তবে সংশোধনের প্রয়োজন হলে বিরাট পুনরায়োজনের ব্যবস্থা ছিল—তৈলচিত্র বা এখনকার পেন্সিল-স্কেচের মত তা সহজসাধ্য ছিল না। শিল্পী যখন চিত্রাঙ্কন শুরু করতেন, তখন সমস্ত বিষয়বস্তুর রূপটি তাঁর মানসচক্ষে সম্যগ্ভাবে ফুটে না উঠলে তিনি তুলিতে হাত দিতেন না। বিষয়বস্তুর সমবধারণা আসবার পর তিনি অবাধে তুলির টান চালিয়ে যেতেন। শিল্পী অসিতকুমার হালদার তাঁর 'অজন্তা' গ্রন্থে লিখেছেন : "আমরা যখন গিরিগুহায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারুশিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এইসকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কত শত শিল্পী মিলে এঁকেছেন ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখতে লাগলুম ততই আমাদের মনে হতে লাগল, এই বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পিগণের অন্তর হতে অবলীলাক্রমে যেন নির্ঝরের মত প্রবাহিত। সেগুলি তখন দেখলে মনেই হয় না যে, সে-সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পরিশ্রমের আঁকা। যেন আলাদীনের প্রদীপের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার"। অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্স্ সাহেবের একজন ছাত্র যখন মাচান

॥ অজন্টা গুহা-মন্দির ॥
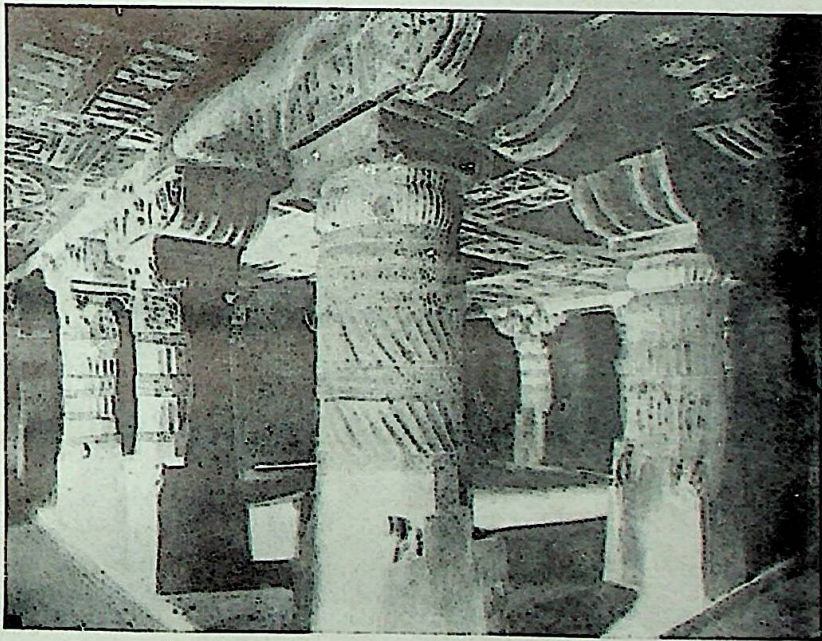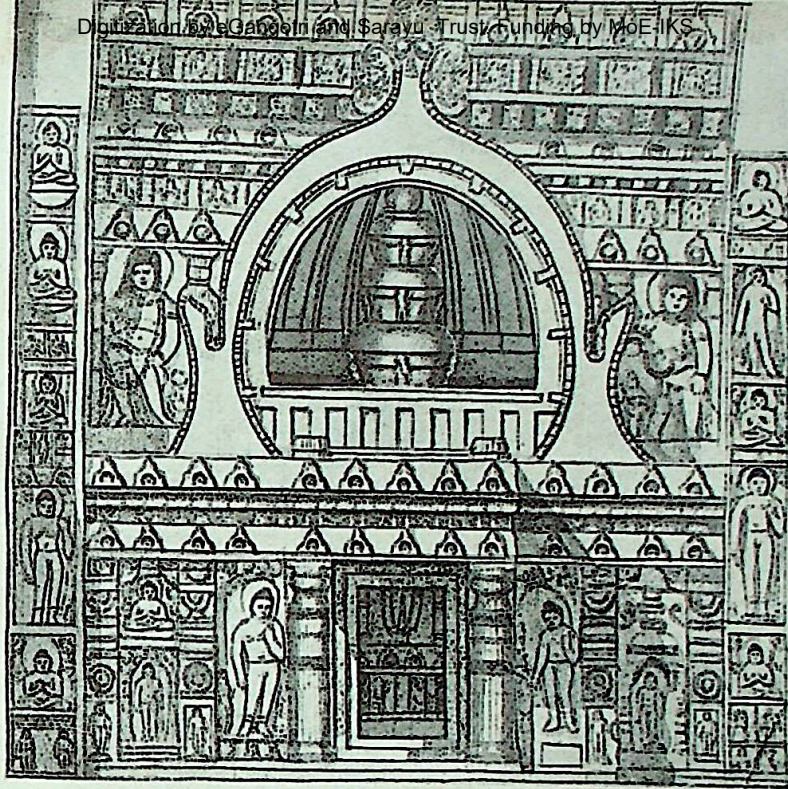
উপরে ঃ ২৯ নং চৈত্যগুহার সম্মুখ-দৃশ্য
নীচে ঃ ২ নং গুহার উপাশ্রয় গৃহের অভ্যন্তর
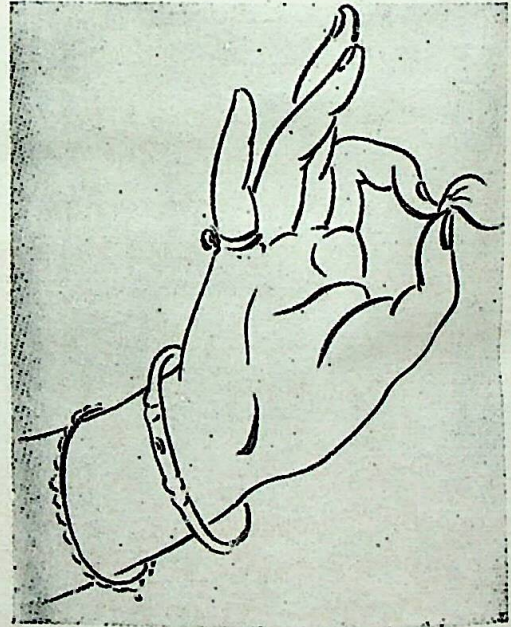
উপরে : শূন্যপথে গন্ধর্ব, অপ্সর ও কিন্নরগণ; নীচে : (বামে) সিদ্ধার্থের গৃহ-ত্যাগদৃশ্যে দর্শক হর-পার্বতী, (ডানদিকে) ১নং গুহার বোধিসত্ত্ব-অবলোকিতেশ্বরের হংসাস্য মুদ্রায় দক্ষিণ করপল্লব

বেঁধে তার উপর হতে একটি ছাদের ছবি নকল করতে যান, তখন তিনি বললেন, কয়েকটি কাজ যেন অনিপুণ কাঁচা হাতের, কিন্তু তিনিই যখন আবার গৃহতল হতে চিত্রটি দেখলেন, তিনি সেই ছবিরই অনন্যসাধারণ রূপটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ শক্তির পরিচায়ক নয়। ২নং গুহার প্রবেশদ্বারের পাশে একটি পূর্ণবিকশিত শ্বেতশতদলের উপর বুদ্ধের চরণযুগল নিয়ে একবার আলোচনার সময় শিল্পরসিক অধ্যাপক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বললেন : পা-দুখানির দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হলো সারা প্রাচীর জুড়ে যেন সেই পা-দুখানির উপরেই অভয়মুদ্রায় বুদ্ধের সুমোহন মূর্তি দণ্ডায়মান। ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, ঠিক এই কথা আরও অনেকের কাছে শোনা গেছে। আমারও এই মনের কথা। জগতের ইতিহাসে শিল্পসৃষ্টির এমন নিদর্শন আর আছে বলে আমার মনে হয় না।

১নং গুহার বুদ্ধের একটী চিত্র খুবই উচ্চাঙ্গের শিল্পকুশলতার পরিচয় দেয়। মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধদেব স্বর্গে গিয়ে সেখানে তাঁর স্বর্গগতা মাতৃদেবীর কাছে আপনার পরিচয় দিচ্ছেন। মাতা দেবকন্যা-পরিবেষ্টিতা হয়ে ছেলের কাছে ধর্মোপদেশ নিতে এসেছেন। পুত্রকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জেনে বাৎসল্যের স্নেহ প্রকাশ করবার সাহস তাঁর নেই—বুদ্ধচরণে নিজেকে নিবেদন করতেই তিনি উদ্গ্রীব। সমাগত দেবকন্যারা ব্যাপার দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছেন—তাঁরা মুক ও নিস্পন্দ। চিত্রটীর মর্ম ও অভিব্যঞ্জনা এতই মনোমুগ্ধকর যে, শিল্পীর দৃষ্টি ও পরিকল্পনার দিকটাই হৃদয়কে মথিত করে তোলে। এই গুহার আর একটী বুদ্ধের চিত্রও খুব উল্লেখযোগ্য। উপাশ্রয়-গৃহের পশ্চাৎপ্রাচীরে একটী বিশাল পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্তি; তাঁর ডান হাতে নীল কমল, আর মাথায় মণিমুক্তাখচিত রাজকীয় মুকুট। তাঁর গঠনে অপূর্ব যৌবনশ্রী ও কমনীয়তা এবং মুখমণ্ডলে অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যঞ্জনা। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম কাঁধের উপর এসে পড়েছে, কণ্ঠে যুঁই-বেল-চামেলীর মালা, অবশ্য সুদৃশ্য মণিমুক্তার কণ্ঠহারও আছে। পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-যাতনার কথা চিন্তা করে তাঁর বিষাদময় দৃষ্টি নীচে লোকবৃত্তের প্রতি নিবদ্ধ। তাঁর একপাশে একজন অনুচরের হাতে তরবারি, অপর পাশে চামর-হাতে আর একজন অনুচর। বামপাশে সঙ্গিনী রত্নালঙ্কারভূষিতা তরুণী রাজরমণী—তাঁরও মাথায় রাজমুকুট। এই রমণীর পিছনের দিকে রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ থেকেই তাঁরা আসছেন। আরও পিছনে পর্বতের পাশে সঙ্গীতরত গন্ধর্ব-কিন্নরদের সমাবেশ হয়েছে। উপর হতে স্বর্গের দেবদেবীরা পৃথিবীতে সংঘটিত এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছেন। দূরে শিব ও পার্বতী বসে আছেন—তাঁরাও এই রাজপুরুষের দিকে চেয়ে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। চিত্রটী যে ঠিক কোন্ বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয়েছিল সে-কথা বলা শক্ত। কেহ কেহ একে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের চিত্র বলে নির্দেশ করেছেন : বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা গৌতম শান্তির সন্ধানে চলেছেন। আবার কেহ কেহ একে দেবরাজ ইন্দ্র বলেও মনে করেন। কারও মতে এটী রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিবাহকালীন চিত্র। যতদূর মনে হয়, এই বিবাহের ব্যাপারে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে উষার কন্যার বিবাহের একটা

সমবধারণা করা হয়েছে। চিত্রটীও প্রায় পূর্বদিকে মুখ করে চিত্রিত,—উষার কন্তার সঙ্গে বিষ্ণুর মূর্তি-সংস্থানের এ' একটা আদর্শ। পৌরাণিক হরপার্বতীর কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীটী সংশ্লিষ্ট বলেই হর-পার্বতীকেও চিত্রে আনা হয়েছে। বিষ্ণুর প্রতীক নীল এবং তিনি পদ্মধারী। এজন্য সিদ্ধার্থ পদ্মপাণি। ব্রাহ্মণ্যদর্শনে বিষ্ণু পালন-কর্তা ও শ্রেষ্ঠ দেবতা; বৌদ্ধ দর্শনে গোতম বুদ্ধ জগতের শান্তি ও মোক্ষের কর্ণধার। বুদ্ধকে বিষ্ণুর সমপর্যায়ে এনেই শিল্পী এই সুমহান্ চিত্রটী এঁকেছিলেন। চিত্রটীর তিনি এমনই সুপরিকল্পিত সংস্থান করেছিলেন যে, প্রতিদিন উষা-সমাগমে প্রথম সূর্যের রক্তিম আলো উপাশ্রয়গৃহের গবাক্ষপথে এসে একেবারে মূর্তির মুখমণ্ডলে এসে পড়ে। সেই আলোয় সমস্ত মুখখানি অপরূপ সৌন্দর্যে ও মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এমন কি, অঙ্কিত মণিমুক্তাগুলিও ক্ষণেকের জন্য ঝলমল করে ওঠে। এ দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, মনে হয় সে-ভাবনা তাঁদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

এই চিত্রের কাছে আরও একটী বুদ্ধচিত্র—বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের বিশাল ছবি আছে। এঁরও অঙ্গ বহুমূল্য রত্নভূষণে অলঙ্কৃত ও মাথায় রত্নখচিত মুকুট। মূর্তিটীর সুঠাম গঠনভঙ্গী ও কমনীয়তা আর মুখমণ্ডলের প্রশান্ত দেবভাবের স্বর্গীয় সুষমা ছবিটীকে মহিমান্বিত করেছে। অগণিত ভক্তমণ্ডলী পূজাঞ্জলি নিয়ে তাঁর সম্মুখে সমাগত, আর তিনি হংসাস্য মুদ্রায় তাদের কাছে পরিনির্বাণের মর্মকথা বিশ্লেষণ করছেন। এই চিত্রটীও একটী শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন। ১৭নং গুহার গর্ভগৃহের প্রাচীরে ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধের এক বিশালকায় ছবি আছে। রাহুল ও যশোধরা তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর করুণালাভের জন্য। চিত্রটী এত সুন্দর ও কমনীয় যে, অনেক শিল্পরসিক এটীকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলে মত প্রকাশ করেছেন। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কাছেও এই কথা শুনেছি। মাতা-পুত্র যশোধরা ও রাহুলের চিত্র এক অপূর্ব মর্মবাণী নিয়ে দর্শকের কাছে উদ্ঘাটিত—র‍্যাফেলের বিশ্ববিখ্যাত মাতা-পুত্রের চিত্রকেও তা হার মানিয়েছে। বুদ্ধত্ব লাভ করবার পর গোতম যখন কপিলবস্তুতে এসে ভিক্ষার্থ নগরপথ অতিক্রম করছেন, তখন যশোধরা পুত্রকে নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন—পুত্রকে পিতার আগমনবার্তা জানিয়ে তাঁর কাছে পৈত্রিক সম্পত্তি প্রার্থনা করতে বললেন। তাই চিত্রে দেখানো হয়েছে, মায়ের নির্দেশে রাহুল পিতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছে। একাধারে পিতার সন্দর্শন ও তাঁর সুমোহন সৌম্য মূর্তি রাহুলের চক্ষে মূক বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে, অপরপক্ষে মায়ের আদেশ সে ভুলতে পারে না। পুত্রের পিছনে দাঁড়িয়ে যশোধরা ভিক্ষুরূপী স্বামীর নয়নভুলানো মুখের প্রতি অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে অপরূপ মাতৃত্বের মহিমা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই একান্ত জীবনধনের কাছে আত্মনিবেদনের সুমধুর ভাব৷ ফুটে উঠেছে। মাত্র নিজের স্বামী বলে নয়, জগৎস্বামিরূপে গ্রহণ করে যেন সমস্ত দেহমন দিয়ে তিনি বুদ্ধের কাছে আপনাকে নিবেদন করতে চান।

গভীর ভাবব্যঞ্জক চিত্রাবলীর মধ্যে ১নং গুহার ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতি মারের

আক্রমণ অন্যতম। এখানে রিপুগণবেষ্টিত বুদ্ধ ধ্যানাসনে বসে আছেন। বৌদ্ধ ষড়্‌রিপুর নায়ক মার সদলবলে বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গে তৎপর হয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের শক্তিগুলি প্রয়োগ করে, কখনও ভীষণাকৃতি মূর্তি ধরে ভয় দেখিয়ে, কখনও কামাতুরা সুন্দরী মোহিনীর মূর্তি দেখিয়ে, কখনও বিলাসের লোভ দেখিয়ে, কখনও বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে, মার বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। বুদ্ধ কিন্তু একান্ত ধ্যানপরায়ণ হয়ে স্তিমিতনেত্রে প্রশান্ত-মূর্তিতে বসে আছেন। তাঁর আত্মা যেন জড়দেহের অনেক দূরে অমৃতময়ী শান্তির রাজ্যে গিয়ে বিচরণ করছে। তাঁর মুখের অপূর্ব দীপ্তি ও স্বর্গীয় পবিত্রতা সহজেই মনকে অভিভূত করে তোলে। এই গুহারই এক জায়গায় স্বর্গে সৌম্যশান্তমূর্তি বুদ্ধদেব একটা বারান্দায় সিংহাসনে সমাসীন। বারান্দার স্তম্ভগুলি মণিমুক্তাখচিত। পিছন হতে দুজন লোক সুদৃশ্য পাত্রে তাঁর কেশদাম সিক্ত করছে এবং তাঁর সামনে চামরহস্তে ব্যজনরতা এক দেবকন্যা। এই দেবকন্যার ভাব ও ভঙ্গী দেখলে মনে হয় যেন তিনি বুদ্ধের আজ্ঞাবহনে প্রস্তুত। একদিকে একটা সিঁড়ি বেয়ে এক বামন থালায় ভরে উপচারাদি নিয়ে আসছে—দেখে মনে হয় যেন অতি কষ্টে উঠছে; তখন এক দেবকন্যা সহানুভূতিপরবশা হয়ে তার হাত হতে থালাটা তুলে নিচ্ছেন। শিল্পী এখানে যে কৌতুকের অবতারণ করেছেন, তা থেকে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সে-যুগের শিল্পীরা অতি গুরুত্বপূর্ণ চিত্রেও কৌতুকের সন্নিবেশ করতে পারতেন।

১৭নং গুহার একটা ছবিতে দেখা যায়, তথাগত যখন পাক্ষিক স্বর্গে ধর্মপ্রচারের পর সোপানশ্রেণী বেয়ে শেষ ধাপে নেমে এসেছেন, তখন তাঁর শিষ্যপ্রধানরা—মোগ্‌গল্লান, উপালি, সারিপুত্র প্রভৃতি তাঁকে অভিনন্দিত করছেন, আর নানা দেশের লোক ও ভক্ত এসে ভীড় করেছে বুদ্ধের দর্শনে নিজেদের জীবন চরিতার্থ করতে। বলতে গেলে, সমস্ত বুদ্ধচিত্রেই শিল্পীর যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় আছে এবং চিত্রণনৈপুণ্যে ভাব ও রসের পরম পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করা যায়, এমন আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ১৭নং গুহাটাকে একরকম জাতকের গুহা বলাও চলে। জাতকমালার নানা কাহিনী অতি সুন্দরভাবে সেখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ১নং ও ২নং গুহাগুলিতেও অবশ্য অনেক জাতকের কাহিনী চিত্রিত আছে। ঐতিহাসিক চিত্রাবলীর একটা ১৭নং গুহার বিজয়সিংহের সিংহল অভিযান ও সেখানে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চিত্র, আর একটা ১নং গুহার চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর রাজসভার চিত্র। পুলকেশীর রাজসভায় পারস্যদূতের আগমন হয়েছে মৈত্রীর বাণী নিয়ে। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ এই পারস্যদূতের অবস্থানকে ভিত্তি করে পারস্যের প্রভাবের অপচেষ্টা করেছেন। বিজয়সিংহের চিত্রাবলী দেখলে মনে হয় সেগুলি বাঙালী শিল্পীদের আঁকা।

১নং গুহার প্রধান চিত্রগুলির মধ্যে জনৈক নৃপতির বৌদ্ধধর্ম গ্রহণান্তর সংসারত্যাগের এক ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টি অতি সুন্দর। একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রতিকৃতিরচনায় সে-যুগের শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একটা দৃশ্যের সঙ্গে আর একটা দৃশ্যের একই লোকের মুখাবয়বে কোনরূপ বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্যের সন্ধান

পাওয়া যায় না। এই চিত্রসমষ্টিতে রাজকীয় বিলাসব্যসনের চিত্র, আভিজাত্য, অন্তঃপুরিকাদের সাজসজ্জা, অন্দরমহলের কথা, নৃত্য-গীত—সমস্তই পারিপাট্যের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। নৃপতি বৈরাগ্যের বশবর্তী হয়ে বুদ্ধের কাছে উপনীত হয়েছেন তাঁর করুণাপ্রার্থী হয়ে। বুদ্ধের মুখে এমন একটী সৌম্যস্নিগ্ধ সস্মিত ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যাতে তাঁর চরণতলে আশ্রয়ের সন্ধান করে জীবন ধন্য করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। বুদ্ধের প্রসাদ গ্রহণ করবার পর তিনি ভোগবিলাস ও আত্মজনের সমস্ত মায়ামমতা ত্যাগ করে কিভাবে অনাসক্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছেন, এই ক্রমিক চিত্রগুলির সেটুকুই প্রতিপাদ্য বিষয়।

লোকবৃত্তের গতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপার, মানবজীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক নানাবিধ ঘটনা, শিকার, যুদ্ধচিত্র, পশুপক্ষীর গতিবৈচিত্র্য, ফুল ও ফল—সমস্তই অজন্টার চিত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা ছাড়াও এখানে পৃথিবীর নানা দেশের নরনারীর চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়। আবিসিনীয়, চীনা, পারসীক, সিংহলী, বাক্‌ট্রিয়ান, অফ্‌গান, য়ুরোপীয় প্রভৃতির চিত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। অজন্টার সমগ্র চিত্রাবলী সম্যক্‌ অনুধাবন করলে বেশ অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে এ-সমস্ত চিত্রের শিল্পীদের বিশেষ পরিচয় ছিল--পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে তাঁদের গতায়াতও ছিল যথেষ্ট। অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌স্‌ও বলেছেন (Indian Antiquary, iii. 1874, 26): "Whoever were the authors of these paintings, they must have constantly mixed with the world"। র‍্যাল্‌ফ ও গ্রিস্‌লী নামে দুজন শিল্পী ছবিগুলি দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়েছিলেন; তাঁরাও চীনা, আবিসিনীয়, ইউরোপীয়, প্রভৃতির প্রতিকৃতি লক্ষ্য করেছেন। গ্রিফিথ্‌স্‌ পারসীক, বাক্‌ট্রিয়ান, অফ্‌গান প্রভৃতির কথা বলেছেন। সিংহলীদের চিত্রে বিজয়সিংহের সিংহল-অভিযানের চিত্র আছে। এদের সকলের বেশভূষায় এবং দেহ ও মুখাকৃতিতে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভা-দৃশ্যে পারসীকের চিত্র দেখা যায়।

গ্রুনভেডেল, ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি অজন্টা-শিল্পে পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখাতে চেয়েছেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেছেন (Journal of the Asiatic Society of Bengal, lviii, 177): সমালোচকের চক্ষে অজন্টা ও বাঘ গুহার শিল্প দেখলে রোমীয় শিল্পের বিশ্বজনীন প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও বলেছেন (Early History of India, 426; History of Fine Arts in India and Ceylon, 388): অজন্টার চিত্রশিল্পে প্রত্যক্ষভাবেই পারস্যশিল্পের অনুকরণ করা হয়েছে এবং পরে গ্রীক প্রভাব তাতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শিল্পাচার্য হ্যাভেল তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন (Indian Sculpture and Painting, 166-8): উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির আদর্শে অজন্টায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বৈশিষ্ট্যের দিক্‌ দিয়ে তা বিশেষভাবেই বিশ্বজনীন। যেগুলিকে বিদেশীয়ের চিত্র বলে ধরা হয়েছে সেগুলি থাকলেও, এথেন্সের শিল্পকে যেমন গ্রীসীয়, ইতালীর শিল্পকে ইতালীয় ও অক্সফোর্ডের
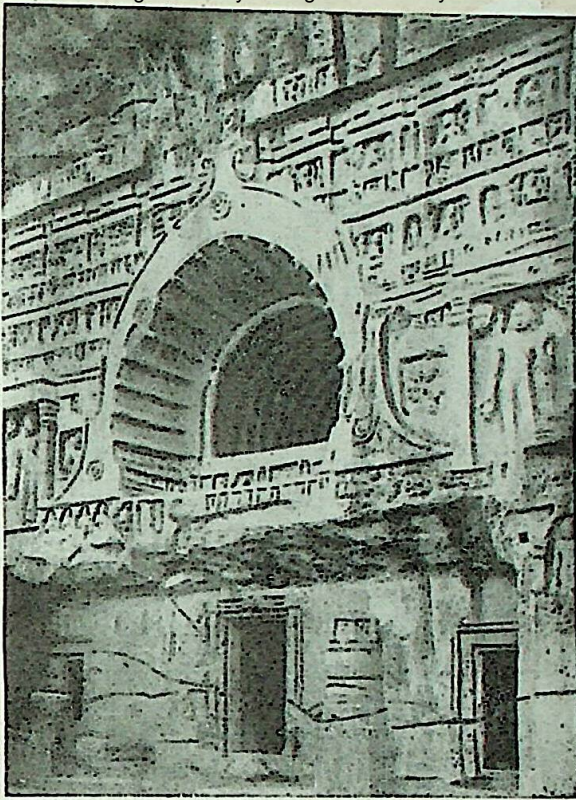
বামে ঃ (উপরে) ২৬ নং চৈত্যগুহার সম্মুখ-দৃশ্য, (নীচে) উৎসবমত্তা বংশীবাদিকার চিত্র ;
দক্ষিণে ঃ (উপরে) রাজরমণীর প্রসাধন ও (নীচে) চামরহস্তে পরিচারিকা

উপরে : জলমধ্যে সঞ্চরণশীল নাগ ও নাগিনী ;
নীচে : (বামে) ২৭ নং গুহার বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের দৃশ্যাবলীতে একটি নারী, এবং (ডানদিকে) বুদ্ধসকাশে অর্ঘ্যবাহিকা

শিল্পকে ইংলণ্ডীয় বলা হয়ে থাকে, তেমনই অজন্টার শিল্প সম্পূর্ণ ভারতীয়। অজন্টা-চিত্রে ভারতীয় জীবনের এমন সজীবতা ফুটে উঠেছে যে, তাতে বিদেশীয় প্রভাবের চিহ্নমাত্র থাকতে পারে না। যে ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব এতে পড়েছে তা ভারতীয়; তাকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত ভেবে গ্রীক ও রোমীয় শিল্পের কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা করলে যথেষ্ট ভুল হবে। সামান্য যেটুকু গ্রীক বা রোমীয় শিল্প ভারতে এসেছিল তার অধিকাংশই রাজনীতি ও ব্যবসায়-সম্পৃক্ত ব্যাপারে এসেছিল। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন—যে পম্পীর চিত্রকলাকে প্রকৃত গ্রেকো-রোমান আদর্শে গঠিত বলে ধরা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে অজন্টার চিত্রগুলিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে, উভয়ের মধ্যে কোন সাধারণ নীতি বা আদর্শের প্রশ্ন আসতে পারে না, এবং এমন কোন শিল্পী নেই যিনি সত্য-প্রমাণের দ্বারা তার সন্ধান দিতে পারেন। অজন্টার চিত্রগুলিতে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার প্রকৃত অভিব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, অপরপক্ষে গ্রেকো-রোমান চিত্রে পম্পীর জীবন ও চিন্তা-ধারার আদর্শ নিহিত। উভয়ের মধ্যে কোনও সৌসাদৃশ্য নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিপ্রেক্ষণের অনুপ্রাণনায় ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় ও ভারতীয় শিল্পনীতির বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ দিয়ে এই গ্রেকো-রোমান প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন— গ্রুনভেডেল ও ভিন্সেন্ট স্মিথের দাবীর অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন (Footfalls of Indian History, 81-121)। হ্যাভেলের মতে (Indian Sculpture and Painting, 169)—যদিও কোন শিল্পকলা ইউরোপ হতে ভারতে এসে থাকে, তাতেও ইউরোপের নিজস্ব বলবার দাবী কিছুই নেই, কারণ, একসময় প্রাচ্যের শিল্প নিয়ে ইউরোপ আপনার শিল্পকে সম্পদশালী করেছিল। সেই শিল্পই আবার পরিবর্তিত আকারে ভারতে এসেছে। ভারতের শিল্পই প্রাচ্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই ভারত-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই অজন্টায় সংরক্ষিত আছে। এতে ইতালী, গ্রীস ও পারস্য—কারও প্রভাবের প্রশ্ন আসতে পারে না। শিল্পচেতনায় ভারতশিল্প পৃথিবীর মানব-সমাজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতালাভের যোগ্য।

যুয়ন্ চোয়ঙ্ তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন, রাজা কনিষ্ক (খ্রীস্টীয় ১ম শতক) নাকি বাক্‌ট্রিয়া হতে ভিত্তিচিত্র আঁকবার জন্য কয়েকজন শিল্পী এনেছিলেন। কিন্তু তখন যে নালন্দা, তক্ষশিলা, শ্রীধন্যকটক প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলিতে রীতিমত শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল—শিল্পীদের ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে ও শিল্পশাস্ত্রগুলির নির্দেশে শিল্পায়োজনের চিন্তা করতে শিক্ষা দেওা হতো, সে-চিন্তা বোধ হয় চীনা পরিব্রাজক করেননি। অজন্টা, বাঘ, সিত্তনবশল বা সিংহলের শিগিরিয়ায় যে বিরাট্ ও মহিমান্বিত শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পেরই আদর্শে ও সাধনায়।

শিল্পী অসিতকুমার হালদার-প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা অজন্টায় বাঙালী শিল্পীর হাত থাকা সম্ভব বলে মনে করেছেন (অজন্তা, ২৯-৩০)। তবে সমগ্রভাবে দেখতে গেলে

৬

অজন্টাকে দ্রবিড়-সংস্কৃতির নিদর্শন বলতে পারা যায়। আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রবিড়-সংস্কৃতি উভয়ে একই বৈদিক সংস্কৃতির শাখা এবং একই বৈদিক ধর্মের অনুগামী হলেও উভয়ের বেশভূষা, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্রাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ শিল্পী যে দেশীয় বা যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতির জীবনধারা ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতানুসারে তিনি শিল্পসৃষ্টি করেন। তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবজগতের বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি তাঁর শিল্পে প্রকাশ পায়। এই আদর্শ নিয়ে আর্য-শিল্পনিদর্শন সাঁচি ও ভারহুতের শিল্পকলা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অজন্টায় যে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত শিল্পীরা শিল্প-সংরক্ষণ করেছিলেন, সাঁচি ও ভারহুতে সেই জাতীয় শিল্পীরা কাজ করেননি। বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়ে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য আছে। অজন্টার নরনারীর ধুতি বা শাড়ী প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেচে, মূর্তিগুলিও বেশভূষা ও চালচলনে যথাসম্ভব আড়ম্বরহীন ও বাহুল্যবর্জিত। অপরপক্ষে সাঁচি ও ভারহুতের মূর্তিতে ধুতি ও শাড়ীর বাহুল্য যথেষ্টই আছে—প্রায়ই তা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছেচে। অজন্টার নরনারীর মাথায় প্রধানতঃই শিরোভূষণ নেই, বিশেষতঃ মুকুট দিয়ে তাদের মাথা শোভিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। বিদেশীয়ের মাথাতেই মাত্র পাগড়ী, টুপি প্রভৃতি ও পরিধানে দীর্ঘ পরিচ্ছদ দেখা যায়। সাঁচি-ভারহুতের পুরুষমূর্তির মাথায় সাধারণতঃ পাগড়ী ও মেয়েদের মাথায় বস্ত্রাঞ্চলের আবরণ আছে—মণিমুক্তা ও সূক্ষ্ম অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, মাথায় মণিমাণিক্যের মুকুটও নেই, মেয়েদের কেশরচনায় অভিনবত্ব নেই। অজন্টার অনেক স্থানে নারীকে অলঙ্কারাদি দিয়েই ভূষিত করা হয়েছে, তাদের পরিধেয় বাস দেওয়া হয়নি। সাঁচি-ভারহুতে এই নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়তঃই কণ্ঠ, কর্ণ, বাহু ও মণিবন্ধের অলঙ্কারে বিভিন্নতা আছে— নীবি-বন্ধনেও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত। সাঁচিতে যেমন মেয়েদের হাতে ও পায়ে বলয় ও মলের প্রাচুর্য, অজন্টায় তা নেই—হাতের মনিবন্ধে দু-একটী মাত্র মণিমুক্তার বলয়, পায়ে নূপুর বা হার, গলায় তদনুরূপ সুদৃশ্য মণিহার। অজন্টার অনুরূপ কলাশিল্পের নিদর্শন বাঘ ও সিত্তনবশলেও দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি সিংহলের শিগিরিতেও সেই রীতি অনুসৃত হয়েছে। সূক্ষ্মশিল্পের আভ্যাসিকে দ্রবিড়- শিল্প যে অনন্যসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও নেই।

ভাব-পরিকল্পনায় অজন্টা শিল্প-জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। চিত্রবস্তুর বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাষা ফুটিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য। মাত্র কোন-কিছুর চিত্র আঁকা সে-যুগের নীতি ছিল না। এই ভাবপ্রকাশের জন্য অজন্টা-শিল্পীদের এমন-কিছু দক্ষতা দেখাতে হয়েছে যা এ-যুগের শিল্পীদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও কোনও একটি চিত্রের প্রতিকৃতি নিতে গিয়ে সহজসাধ্য চেষ্টায় তা পারেননি। এই ভাব-পরিকল্পনার আদর্শই সে-যুগের চিত্রে এক আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাব এনেছিল। তাই অজন্টার সমস্ত চিত্রেই সুকোমল সংবেদনা ও ধর্মীয় সারল্যের ভাব প্রকাশ পেয়েছে,—এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃশ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রজ্ঞা ও চিন্তা দিয়ে অজন্টার বিচার করেছিলেন, তারই পরিজ্ঞান-সাপেক্ষে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন (Footfalls of Indian History, pp 122-23) : "......it is difficult to imagine that in any country the splendours of Ajanta could seem ordinary. Those wonderful arches and long colonades stretching along the hillside, with the blue caves of slate-coloured rock overhanging them, and the knowledge of glowing beauty covering every inch of the walls behind them—no array of colleges or cathedrals in the whole world could make such a thing seem ordinery. For it was doubtless as colleges that the great task was carried out in them, and we can see that it took centuries. That is to say, for some hundreds of years Ajanta was thought of in India as one of the great opportunities of the artist".

ভারতীয়েরা সে-যুগে শিল্পকে শুধু শিল্পের অনুপ্রেরণা নিয়ে ভালবাসেননি—পবিত্র ও আন্তরিক অনুরাগের সঙ্গেই ভালবেসেছিলেন। সাধকসুলভ মনোবৃত্তি তাঁদের আন্তরিকতার খোরাক যোগাতো। পবিত্রতা ও অপবিত্রতায় কোন পার্থক্য দেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিল্পপ্রকৃতির ছন্দে ও লালিত্যে পরমসুন্দরের আবির্ভাব হয়। তাই সুন্দরের সাধনাই শিল্পকুশল মনের আন্তরিকতা। স্বামিজীর বাণীতে "এ বিশ্বজগৎ নিরন্তর প্রার্থনা"। এই প্রার্থনাতেই ভাবের অতীন্দ্রিয় বস্তুটি নিহিত থাকে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : "তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে ··সে পুণ্য নির্ঝর-স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান"। শিল্পের মর্ম তাই বিশ্বমানবের সার্বজনীন ভাষা। অণু হতে বিরাটের ধ্যানধারণায় শিল্পরসের সমবধারণা আসে। সে-যুগের শিল্পীরা এই শিল্পরসেরই অধ্যাস করেছিলেন। সে-যুগে কোন সামাজিক সংহতি যেমন সর্বসাধারণের সর্বপ্রধান সুখের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, তেমনই ব্যক্তিগত সুখের লালসায় বা জ্ঞানতঃ তথাকথিত শিল্পিগণ সুন্দরের সাধনায় প্রবৃত্ত হতেন বললে ভুল হবে। শিল্পের চরম পরিণতি ছিল জীবন ও মৃত্যুর কয়েকটি সত্যের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি। তাই শিল্পী চেয়েছিলেন সাম্য ও মৈত্রীর পথে অগ্রসর হয়ে শান্তির সুদৃঢ় বন্ধন ; অপরূপকে রূপায়ত্ত করবার জন্য শিল্পীরা যুগে যুগে সাধনা করে এসেছেন। যুগে যুগে শিল্পীরা এই রূপমাধুর্যে বিভোর হয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুগামী হয়েছেন। এই সত্যানুভূতি ও রসবোধ অজন্টার শিল্পীরা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মানবমনে সৌন্দর্যের যতটুকু ধারণা এবং হৃদয়াবেগজনিত আনন্দরসের যতটুকু অনুভূতি, তাইই নানা ভাবে ও নানা সৌকর্যে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে প্রকটিত হয়েছে।
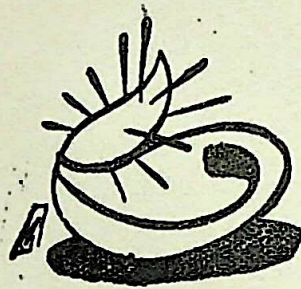
॥ সপ্তম অবদান ॥

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

তব জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে, শতবর্ষ পরে আজি,
উষার উদয়াচলে নবযুগ শঙ্খ ওঠে বাজি ;
পল্লবে পল্লবে কচি কিশলয়ে কিংশুকে পলাশে
হিন্দোলের দোলা লাগে। দিক্‌বধূ আসে অধিবাসে
বরণের পাত্র লয়ে ভক্তিনম্রশিরে। দেশে দেশে
ভজনসঙ্গীত-স্রোত বয়ে যায় তোমারি উদ্দেশে।
যুগযাত্রী করে প্রদক্ষিণ মহাশক্তি পীঠে তব,
প্রাণের প্রণাম লয়ে। অর্ঘ্য উপহার সাথে নব
জনারণ্য বন্দনামুখর ; নভো চুম্বী বনস্পতি।
অদ্বৈতে অমৃতে প্রেমে সংসারের ফিরায়েছ গতি।
গৈরিক পতাকা তব গাঁথিয়াছে মানবজাতিরে,
একসূত্রে। বিশ্বে আজ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যটিরে
প্রত্যক্ষ করেছি তাই, তব মানবতা-বাণী বয়ে
চলে যাত্রী একমনে একপ্রাণে পরম নির্ভয়ে।
দুঃখ-তপস্যার স্তরে স্তরে বিরাট চিত্তের মনে,
বিশ্বজনচিত্ত করি সুসংবদ্ধ প্রমার স্পন্দনে
কীর্তির হিমাদ্রি রচি ধরণীতে নিঃশ্রেয়স বাণী
শুনায়েছ অহরহ।

অবিদ্যার শিরে খড়্গ হানি,
জড়বাদবিড়ম্বিত যন্ত্র-ক্রূর স্বৈর সভ্যতার
পশ্বাচার করে গেছ দূর দৈব-দত্ত কর্মভার
করিয়া গ্রহণ। এসেছিলে সপ্তর্ষি মণ্ডল হোতে
বিরোধ বিক্ষুব্ধ বিশ্বে, মানবেরে সত্যের আলোতে
নিয়ে যেতে চিদানন্দলোকে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম

মূর্তিমান বৈদিক ভারত তুমি : তব সর্বোত্তম
সাধনার রুদ্র সঙ্গীতের তালে আত্মার প্রকাশ
অনন্ত আনন্দময়। তোমারই অশ্রান্ত প্রয়াস
রচিয়াছে রূপতন্ত্র গুরুদত্ত একান্ত দুর্লভ
মন্ত্রবলে,—যত কিছু অসত্যের হয়েছে উদ্ভব,
করে গেছ দূর। এলো যবে মহা অবতারীরূপে
ভগবান নিরক্ষর ব্রাহ্মণের বেশে, তব চিত্তধূপে
আর হৃদয় প্রদীপে অর্ঘ্য তারে দিলে নিরন্তর
ভূমি ও ভূমার মাঝে উৎসারিত আলোক নির্ঝর।
শক্তিরূপা সারদার স্নেহের দুলাল! দেবতার
লীলা-সহচর! রামকৃষ্ণপাদপদ্মে উপচার
দিলে আপনারে তুমি। সর্বধর্মসমন্বয় তরে
নানাধর্মসাধনায় ভগবান নিত্যলীলা ভরে
দেখায়েছে যবে যত মত তত পথ, পরিচয়
তুমি দিলে শিকাগোতে তার, দিকে দিকে তব জয়
উঠিল ধ্বনিয়া। বিশ্বধর্মসম্মেলনে অসহায়,
নিঃসঙ্গ, একক, দীন, বিত্তহীন, তোমারি পূজায়
সমগ্র পাশ্চাত্য জাতি করেছে যে সর্বস্ব অর্পণ ;
রাজরাজেশ্বর করি সর্বলোকালয়ে সর্বজন
এসেছে ছুটিয়া তব বন্দনার গীতিগুচ্ছ লয়ে ;
এসেছে নাস্তিক যারা ছিল সদা সন্দেহ সংশয়ে
যারা ছিল ভ্রান্তধারণায় কুসংস্কার কদর্যতা
চিত্তে লয়ে, ধর্মযাজকের শুনি বিদ্বেষের কথা
পরধর্মবাদে। দুঃখের দুর্গম পথ দিয়া তুমি,
নির্ভীক পরাণে করে গেলে মধুময় বিশ্বভূমি,
সত্যেরে জাগ্রত করি।

আত্মঘাতী তমোহত জাতি
এই মহাভারতের, ভাবেনিক বিধাতার সাথী
তুমি তরুণ তাপস! বহুরূপে সম্মুখে ঈশ্বর
কহিলে প্রথম। সত্যধন দিয়ে গেলে যোগিবর!
মূর্তমহেশ্বর! জ্ঞানকর্মভক্তিযোগ দিলে শিক্ষা,
আপনারে জানিবার তরে জনে জনে মন্ত্র দীক্ষা
দিয়ে গেলে চৈতন্যের করি উদ্বোধন। শিবজ্ঞানে
জীবগণে করিবারে সেবা প্রতিদিন মনে প্রাণে

অভ্যাসের যোগে ; শিখায়েছ তুমি, বিন্দুতে সিন্ধুরে
দেখায়েছ, আলো ঝরে ধরণীর সিঁথির সিন্দূরে
দাক্ষিণ্যে তোমার।

নবযুগ মহাজীবনের বেদ
করেছ প্রচার দূর করি উচ্চনীচ ভেদাভেদ
মানবসমাজে। বৈরাগ্যের আভিজাত্য যজ্ঞশিখা
ছিলে তুমি, ভারতের দিলে ভালে গৌরবের টীকা,
ত্যাগমন্ত্রে, আত্মা আর অধ্যাত্মের মর্মকথা কহি
স্বদেশের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিলে প্রেমবার্তা বহি।
তুমি দিলে খণ্ড হোতে অখণ্ডের পরিপূর্ণ বোধ,
দ্বৈত হোতে অদ্বৈতের মাঝে লুপ্ত মনন-বিরোধ।
সহস্রকণ্ঠের উর্ধ্বে তব কণ্ঠ করে কথকতা,
দীনের প্রণাম লহ, হে স্বামিজী! আরাধ্য দেবতা।

●

।। অষ্টম অবদান ।।

।। বিবেকানন্দ বন্দনা ।।

পৌরুষে পুরুষ সিংহ বিবেকে আনন্দ যার সদা
স্বদেশের সর্বদুঃখে ভারাতুর হৃদয় সর্বদা,
কায়মনোবাক্যে যার পরাধীনতার আত্মগ্লানি
অভিভূত করি তারে রাত্রিতে করিত নিদ্রা হানি।
দেশমুক্তি সাধনার বিপ্লবে যে বিপ্লবীরো গুরু
সন্ন্যাসে ও কর্মযোগে নব রাজযোগ করে সুরু,
গুরু যার রামকৃষ্ণ, সর্বধর্মসমন্বয়-ঋষি
বৃক্ষতলে সিংহাসন, ব্রহ্মবিদ্যা তাহার মহিষী।
জগতের ধর্মসভা সম্বোধিল সন্ন্যাসী নবীন
গণ্য হল সে-সভায় বাগ্মিতায় সমকক্ষহীন।
সর্বজীবে শিবজ্ঞান, শিব যার জীব গুহাশায়ী,
আদর্শে আকাশস্পর্ধা হেরি হিমাদ্রির উচ্চতা-ই।

আজিও ধ্বনিত হয় স্বামিজীর মেঘ-মন্দ্র-স্বর
ভারতের সার্বভৌম বেদান্তের ব্রহ্ম একেশ্বর।
নেতাজিরো নেতা যিনি, গান্ধীজিরো নবদৃষ্টিদাতা
দেশভক্তি ঋণ দানে যে খুলিল তেজারতি খাতা,
যে মহাজনের মন্ত্রে জনশক্তি উঠে মাথা তুলি,
এই দেশ স্বর্গ মোর স্বর্ণ মোর এ-স্বর্গের ধূলি।
বক্ষে জ্বলে দাবানল চক্ষে জ্বলে মুমুক্ষার তৃষা
আসমুদ্র-হিমাচল প্রদক্ষিণ করে সর্বদিশা।
শিখিপুচ্ছধারী যত দাঁড়কাক হিংসা করে যার
পৃথ্বীর প্রতীচ্য প্রাচ্য নীরাজনা করিল তাহার।
অগ্নিগর্ভ বাণী শুনি, মাতৃনামে দত্ত আত্মবলি,
সহস্র শহীদ তারে নত শীর্ষে মানে গুরু বলি।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মূর্খ মুচি ও মেথরে ভেদ নাশি
যে বলিল জাগো ভাই এক গোত্র সবে দেশবাসী।
এ-সমাজ শিশুশয্যা, যৌবনে আমার উপবন,
বার্ধক্যের বারাণসী, সাধকের সাধনার ধন।
গৌরীনাথ-জগদম্বে! দাও শক্তি ভক্তি ভারতের
পূর্ণ কর মুক্তি সাধ দূর কর ক্লৈব্য আমাদের।
মানুষে মানুষ কর, নারী হোক আদর্শ জননী,
পুরুষ পৌরুষ লভি হয় যেন বীর শিরোমণি।
সে জীবন্ত প্রার্থনায় জীবন্মৃত লভিল জীবন
অর্জিল জাতির মুক্তি মুক্তিযুদ্ধে যুঝি প্রাণপণ।
স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্ম-শতবর্ষে তাঁরে স্মরি
আপামর-সাধারণে শতবার হর্ষে নতি করি।

।। নবম অবদান ।।

।। হে সন্ন্যাসী দিব্যকান্তি ।।

তোমার ও মূর্তিপানে চেয়ে চেয়ে জাগে কী বিস্ময় !
ওই জ্যোতির্ময়
মূর্তিখানি দূর করে সর্ব দীনতার
হীনতার গ্লানি ; যত পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার
নিমেষে নিঃশেষ করে আনে এক দিব্য দ্যুতিময়
ভাস্বর আলোক রশ্মি আর বরাভয় ।
সে আলোর দীপ্তশিখা এধারে ওধারে চারিধারে
ছড়ালে প্রসন্ন চিত্তে ; গর্বোদ্ধত জগতের দ্বারে
নিয়ে এলো ওই দীপ্তি পরম বিস্ময় ;
শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে মেনে নিল পরাজয়
চিরন্তন ভারতের কাছে ওই জড়বাদি উদ্ধত পশ্চিম ;
অনশ্বর অনন্ত অসীম
ঐশ্বর্যের উৎসভূমি এ ভারত—জানালে আবার ;
হে সন্ন্যাসী দিব্যকান্তি, তোমারে প্রণাম বারংবার ।

।। দশম অবদান ।।

।। স্বামিজী বিবেকানন্দ ।।

নমামি তোমারে বীর সন্ন্যাসী
স্বামিজী বিবেকানন্দ !
নমামি তোমার চরণ-পদ্ম দু'টি,
মানস-ভ্রমর পড়িছে সেথায় লুটি',
অযুত প্রাণের চিরপ্রণম্য
পুরুষ পরমানন্দ !

ভাব-বিনিময়ে বিশ্ববিজয়ী
প্রাচী ও প্রতীচী ধন্য,
জগজ্জনের হিত-আকাঙ্ক্ষী ঋষি !
জ্ঞানের আলোকে ভাতিলে নূতন দিশি !
ভক্তিভাবের বন্যা বহালে
ধ্বনিয়া পাঞ্চজন্য ।

জ্ঞান-গরিমায় চির-মহীয়ান্,
ললাটে প্রতিভা-দীপ্ত,
যুগের শঙ্খে দিয়েছ নূতন ডাক,
মানুষের মনে কোথায় রয়েছে পাঁক,
সেই ক্লেদভার দূরিতে তোমার
জীবন করেছ লিপ্ত !

নর-নারায়ণ সেবার মন্ত্রে
মানুষে দিয়েছ দীক্ষা।
মনের মণিতে কোথায় আঁধার ঢাকা,
সে মণি কেমনে যায় যে জ্বালিয়া রাখা,
তোমার মর্ম-মণির পরশে
দিয়েছ তাহার শিক্ষা।

দীন-দরিদ্র মূর্খ-আতুর
পঙ্গু সমাজ-ছিন্ন,
লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা-ভরা দুখে,
যে মানুষগুলি ছিল নিরন্নমুখে,
বক্ষ পাতিয়া নিয়েছ তাদের
নহে যে তাহারা ভিন্ন।

ভারত-বাণীর নব প্রবক্তা
সাম্য চেতন-মন্ত্রে,
প্রতীচী কর্ণে শুনালে অভেদ-বাণী
ভারত-মর্মে কোথায় ছিল না জানি,
সঙ্গীতে সুরে সে কথা ধ্বনিল
সকল জীবন-যন্ত্রে।

এই ভারতের উপনিষদের
বেদান্ত-সুধা মন্থি',
তথ্য নিঙাড়ি' নূতন বিশ্লেষণে,
জড়বাদীদের জীবন-উজ্জীবনে,
জ্ঞান-পুষ্পের অযুত মাল্য
দিয়েছ আপনি গ্রন্থি'।

যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ
পরম ভক্ত-শিষ্য
ভাবের ভিখারী সংশয় ভরা মনে,
পরম-তীর্থে ভাবের অন্বেষণে,
চরম জ্ঞানের ভাণ্ডার পেলে
বিজয় করিতে বিশ্ব !

সারদা মাতার হে বরপুত্র
নমি নরেন্দ্র সূর্য !
ভারত-পথিক পাথেয় পূর্ণ পথে
তুমি যে গিয়েছ সপ্ত অশ্বরথে,
যুগ-তমিস্রা দহনে তোমার
পৃথিবী আলোক-পূর্ণ ।

॥ একাদশ অবদান ॥

॥ সেদিন—এ'দিন ॥

সেওতো—শীতের দিন !
যেদিন এখনও আসে
কালের গভীর অন্ধকারে
নবজন্ম নিয়ে,
তেমনি সেদিনও এসেছিল,
এনেছিল সাথে
কুয়াশার জাল ছেঁড়া
আর এক উজ্জ্বল সকাল ।
যে সকালে হাতে নিয়ে সূর্যের প্রদীপ
মাটিমা দেখেছে মুখ মানবী মায়ের ;
যে মায়ের স্নেহধারা বুকের সুধায়
ক্ষীরধারা হয়ে ঝরে

নব-জাতকের
তৃষ্ণার্ত জিহ্বায়।
শুভ কামনায়
এঁকে দেয় আশীর্বাদ
সন্তানের ভালে।

আর এক দিনের ইতিহাস
লিখে গেছে নাম
আর এক মানব শিশুর।
সে-ও এসেছিল
মানবী-মায়ের কোল জুড়ে,
এ মাটিরই আর এক ঘরে।
সেদিনও সকালে সূর্য
হয়তো বা উঠেছিল হেসে,
শুভ শঙ্খধ্বনি দিয়ে পুরনারী করেছিল
সংবাদ ঘোষণা নদীয়া নগরে।

তারপরও এল কত দিন,
চলে গেল রাত,
মুছে গেল কত পদ-রেখা,
কত যুগ চলে গেল এসে।
তবু—বয় সেদিনের হাওয়া,
বয়ে যায় এ গঙ্গার স্রোত।

আবার সকাল এল,
আর এক সূতিকাগার দ্বারে
এ সকালও দিতে এল বহুদিনকার
জমাট যন্ত্রণা,—আর অনেক রাতের
ব্যর্থ কান্না,—অঞ্জলিতে ভরে।
দুয়ারে দুয়ারে
নীরবে দাঁড়াল এসে
অশরীরী আত্মা যত—পিপাসা-কাতর,
শান্তি-জল চেয়ে।

তখনও মানবী মাতা মাটির প্রদীপে
কল্যাণের আলো জ্বেলে
শিশুর কপালে আঁকে
স্নেহ-আশীর্বাদ।

সেই তুমি এসেছিলে!
যেমন এসেছ বারবার
অন্ধকার হতে উঠে।
যুগান্তের বন্ধদ্বার খুলে
সুদৃঢ় সবল হাতে;
তেমনি আবার এস ফিরে
আর কোন শুভলগ্নে
এ মাটির ধূলোয়-কাদায়
গড়া—-মানবীর
মৃত্যুঘেরা ঘরে
মৃত্যুঞ্জয় দানে॥
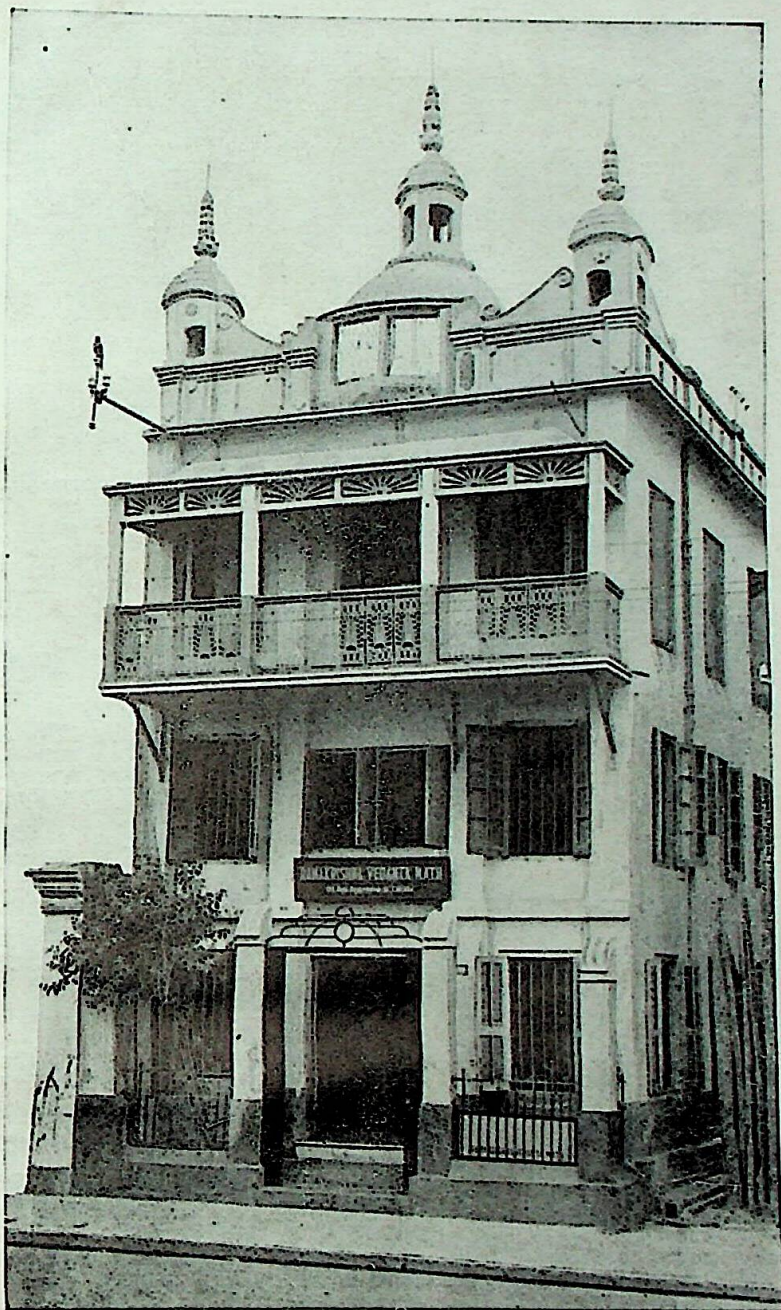
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা
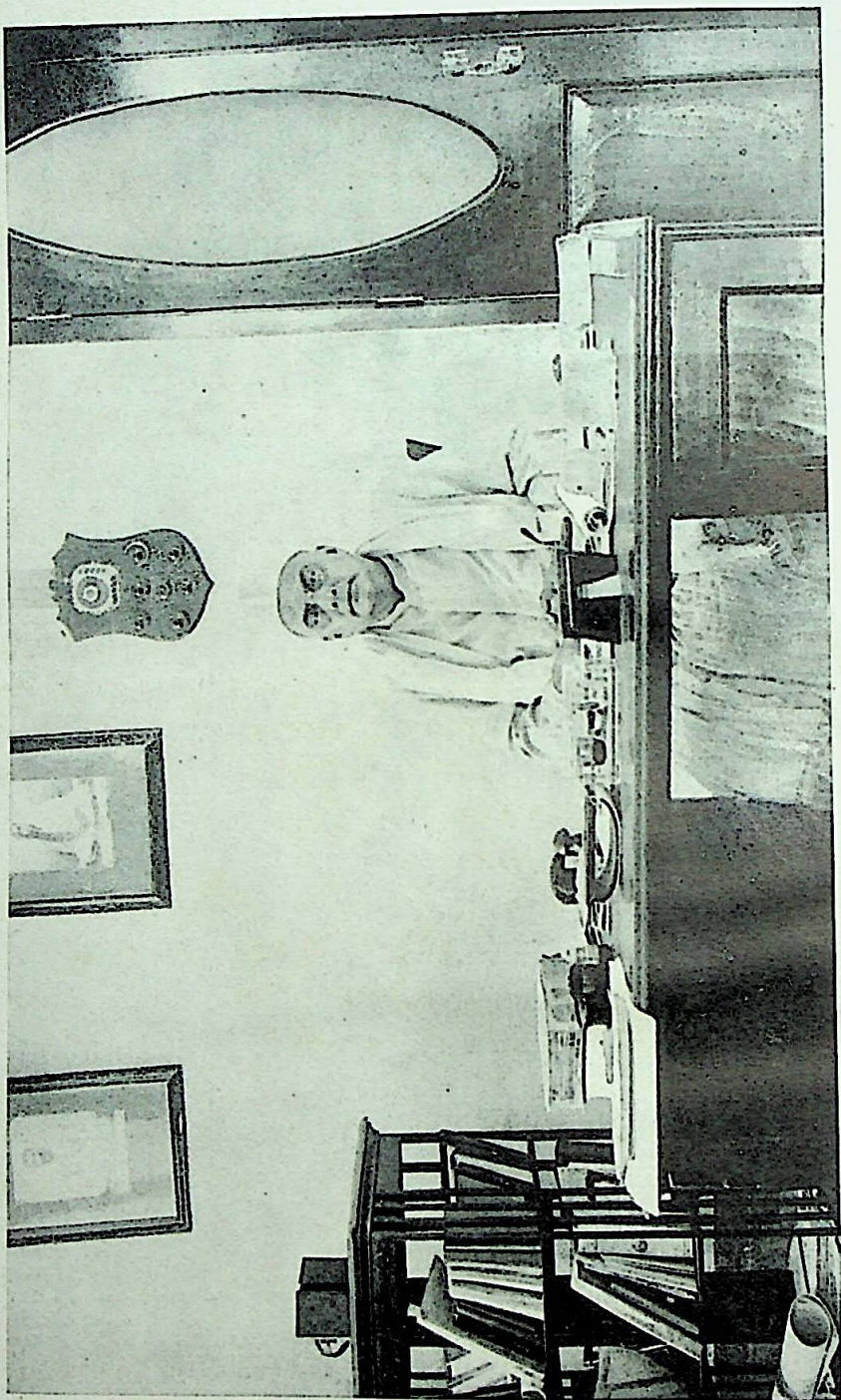
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠাতা : শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

।। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-বিবরণী ।।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার দেবগুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বজনীন ধর্মের বাণী প্রচারকল্পে পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করিয়া ও অগণিত ধর্মপিপাসু নরনারীর চিত্তে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হইতেই তিনি তাঁহার প্রভুর (শ্রীরামকৃষ্ণের) জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে ও তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনার মূলকর্মস্থল এই মহানগরীর বুকে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ বক্তৃতা-গৃহ উৎসর্গ করিতে উৎসুক ছিলেন।

অতএব স্বামী অভেদানন্দ এই রাজধানীতেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' নামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রথমে ইহা ৪১।এ, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। পরে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের বিপরীত দিকে ১:নং ইডেন হস্পিটাল রোড ও তথা হইতে স্কটিশচার্চ কলেজের পার্শ্বে ৪০নং বিডন ষ্ট্রীটে ও তারপর ১৩বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যতদিন না ১৯নং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের জমিটি শোভাবাজারের রাজ-পরিবারের কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেবের নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল ততদিন স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত সমিতিটি (পরবর্তীকালে মঠ) অনেকগুলি ভাড়া বাড়ীতেই অবস্থিত ছিল। এইস্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি নাট-মন্দির ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের বাসস্থানের নিমিত্ত একটি দ্বিতল (বর্তমানে ত্রিতল) গৃহ নির্মিত হয়। স্বামিজী মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্রটি বেদীতে স্থাপন করিতেছিলেন তখন এই প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন: "হে ঠাকুর! যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর তুমি এখানে প্রতিষ্ঠিত থাক"। কিছুকাল পরে এখানেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সাধারণ-পাঠাগারসহ একটি বক্তৃতা-গৃহ নির্মিত হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য-অধিবাসীদের কল্যাণকল্পে স্বামিজী দার্জিলিঙে বেদান্ত আশ্রম নামে একটি কেন্দ্র স্থাপনও করিয়াছিলেন।

তাঁহার পার্থিব জীবনের দিনগুলি শেষ হইয়া আসিতেছে জানিতে পারিয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সম্পত্তি ন্যাস-সম্পত্তিরূপে (Trust property) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উৎসর্গ করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' এই নব নামকরণ করেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কয়েকজন গৃহী শিষ্যকে লইয়া গঠিত একটি অছি পরিষদের দ্বারা পরিচালিত স্বামিজীর ত্যাগী শিষ্যগণ, ইহারই

বলে, ধর্ম, সংস্কৃতি শিক্ষাবিষয়ক ও সকল প্রকার জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ও সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী অভেদানন্দ মানব-চরিত্র সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশের অভাব-অভিযোগ ও দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিলেন। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি বর্তমানের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং বৃত্তি ও কায়িক পরিশ্রমমূলক শিক্ষা ব্যবহার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বজনীন ধর্মের উদার ভাবধারার বিস্তার এবং সত্যদ্রষ্টা ও অন্যান্য দেশের ধর্ম নেতাগণের শিক্ষণীয় মূল নীতিগুলির প্রচার ও তাহার বাস্তব প্রয়োগরীতি দ্বারা মানবজাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও পার্থিব অভাব যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করাও তাঁহার কাম্য ছিল।

তৃতীয়তঃ সেই সঙ্গে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং চতুর্থতঃ অস্পৃশ্যতা ও সামজিক কুসংস্কারগুলি দূরীভূত করিয়া সকলের মধ্যে সৌভ্রাত্রবোধ জাগরিত করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রুগ্ন, দুঃস্থ ও দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং বিশেষতঃ দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঐজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা বিষয়েও তিনি আগ্রহশীল ছিলেন।

মোটকথা, সেবা এবং ত্যাগাদর্শের মাধ্যমে জাতির প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করাই ছিল স্বামী অভেদানন্দের উদ্দেশ্য। তিনি জাতির ভাগ্যবিপর্যয় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং অজ্ঞতা ও দ্রারিদ্র্যই যে যুবভারতের দৃষ্টি আচ্ছন্নের কারণ এবং নিরাশা ও হতাশাই তাহাদের জীবনে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে একথাও তিনি জানিতেন। কিন্তু ঘনকৃষ্ণ মেঘ ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া ভারতের ভাগ্যাকাশে নবীন উষার আলো দেখা দিবে ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভারতের পুণর্গঠনের নিমিত্ত তিনি সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতা সংহত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, আমূল-সংস্কারের মাধ্যমেই ভারতের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, ও অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট রূপান্তর ঘটিবে এবং দেশ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবে।

মঠের বিস্তৃত কর্মপন্থার দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে ইহার প্রতিষ্ঠাতা কতখানি উদ্দেশ্য-সচেতন ছিলেন।

॥ শিক্ষা-বিষয়ক ॥

১॥ বিদ্যালয়॥ "সভ্যতার আদর্শের উপরই একটি জাতির শিক্ষাধারা নির্ভর করে। মানুষের মধ্যে সুপ্ত যে পূর্ণতা তাহার বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য"। —স্বামী অভেদানন্দ মঠের বিবিধ কার্য্যবলীর মধ্যে শিক্ষানুক্রমই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কিছুসংখ্যক বালকদের শারীরিক মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক

এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মঠে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে তখন হইতেই সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রগণকে এই বিদ্যালয়ে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ইহার ছাত্র সংখ্যা আড়াই শতেরও অধিক। পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক। সমবেত প্রার্থনার পর প্রত্যহ এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সুরু হয় এবং সপ্তাহে একবার করিয়া শিক্ষকগণ মহৎ ব্যক্তিগণের জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া থাকেন।

২॥ অবৈতনিক পাঠাগার ও গ্রন্থাগার॥ মানুষের চরিত্র ও মানসিক গঠনের জন্য গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়া আসিতেছে এবং ক্রমেই ইহা বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহাতে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থই নাই, অধিকন্তু সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় রচিত অতি-আধুনিক ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকাদিও যথেষ্ট রহিয়াছে। গ্রন্থাগার এবং পাঠাগারটি বহু সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পুস্তকগুলি ব্যতীত প্রয়োজনীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকাও রহিয়াছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারটির বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ছয় হাজারেরও অধিক। ইহা মঠের একটি সম্পত্তি বিশেষ। ইহার সদস্য সংখ্যা দেড় শতেরও অধিক। পাঠাগারটি দৈনিক পাঠক সংখ্যা ৩০-৪০ জন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান প্রত্যেকে বাৎসরিক ২০০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

সমাজসেবামূলক কার্যের জন্যও মঠ বাৎসরিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে এক শত টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে।

৩॥ প্রকাশনা বিভাগ॥ কৃষ্টি ও শিক্ষার জন্য পুস্তকের প্রয়োজন। গ্রন্থই মনীষীদের রচনাও বাণীর অবিস্মরণীয় নিদর্শন। জ্ঞানগরিমা ও মানসিক বিকাশের জন্য পুস্তকপাঠের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। স্বামী অভেদানন্দের তিরোধানের পূর্ব হইতেই তাঁহার অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও অভিভাষণগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে True Psychology, Yogo Psychology, Great Saviours of the world, Life Beyond Death, India and Her People, Path of Realization, Reincarnation, Self-Knowledge, Spiritual Unpoldment এবং Mystery of Death প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নূতন পুস্তকগুলি ব্যতীত তাঁহার নূতন ও পুরাতন কয়েকখানি বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তকের বাংলা অনুবাদও বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার সমুদয় ইংরাজী পুস্তকগুলিই বাংলাভাষায় প্রকাশকরার ইচ্ছাও মঠ কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে। কাগজ ও মুদ্রণের এই দুর্মূল্যতার দিনেও মঠের প্রকাশনা-বিভাগ দৃঢ়-নিশ্চয়তার সহিত পুস্তকগুলি প্রকাশের গুরু দায়িত্ব

বহন করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তৃতি বিষয়ক প্রখ্যাত পুস্তকসমূহ ইংরাজী ও বাংলাভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। 'বিশ্ববাণী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা মঠ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। স্বামী-অভেদানন্দই এই পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক স্বর্গত ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কিছুকাল উহা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। বর্তমানকালের বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের চিন্তাশীল রচনা সম্ভারে ইহা এক্ষণে সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রকাশনা বিভাগ হইতে প্রকাশিত এই সকল গ্রন্থাদির বিদেশে যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে।

৪॥ ধর্ম ও সংস্কৃতি॥ মঠের বক্তৃতা-গৃহে উপনিষৎ, ভাগবত, গীতা, কথকতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনাদিও নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে এবং জনসাধারণও যে ইহার প্রতি আগ্রহশীল তাহা তাঁহাদের উপস্থিতির সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হইতেই প্রমাণিত হয়। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, লোক-সাহিত্য, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় খ্যাতনামা অধ্যাপক ও সাহিত্যিকগণের পাক্ষিক আলোচনাই প্রতিষ্ঠানটির সাংস্কৃতিক রূপের পরিচায়ক।

৫॥ পূজা ও উৎসব॥ মন্দিরে প্রাত্যহিক পূজা, ভোগ, আরাত্রিক ও আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণের ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত সমবেত ধর্মীয় প্রার্থনা, কীর্তন ও ভজনগান প্রভৃতি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্যগণের জন্মতিথি-উৎসব ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জন্মোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে বিশেষ সভাদির আয়োজন করা হয় এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই সভাদি অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ধর্মগুরুদের জীবন ও বাণী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী-পূজাও মঠে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক অনুষ্ঠানরূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

৬॥ শাখাকেন্দ্রসমূহ॥ মঠের দুটি শাখাকেন্দ্র আছে, একটি দার্জিলিঙে ও অপরটি বিহারের মজাফরপুরে। শেষোক্ত শাখা-কেন্দ্রটিতে আধুনিক-যন্ত্র-পাতি দ্বারা সজ্জিত একটি হাঁসপাতাল আছে। এই সকল শাখা-কেন্দ্রগুলি স্থানীয়ভাবে স্ব স্ব প্রধান হইলেও তাহাদের প্রত্যেকটিই মূল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত অভিন্ন। ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, দার্জিলিঙ শাখাকেন্দ্রটির কাজ-কর্ম উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। সেখানে একখানি দ্বিতল গৃহে বর্তমানে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ রোগীদের জন্য একটি শুশ্রূষা-কেন্দ্র রহিয়াছে। স্বামী অভেদানন্দের জীবদ্দশায় যে নিবেদিতা স্মৃতিভবনটি নির্মিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা চতুর্থতলবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তিনটি বিদ্যালয় অবস্থিত—একটি পার্বত্য বালকদের জন্য, একটি পার্বত্য বালিকাদের জন্য ও অপরটি বাঙালী বালকবালিকাদের জন্য। ইহা ব্যতীত, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও আশ্রম কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ছাত্রাবাসসহ একটি B. T. College, একটি L. T. College ও
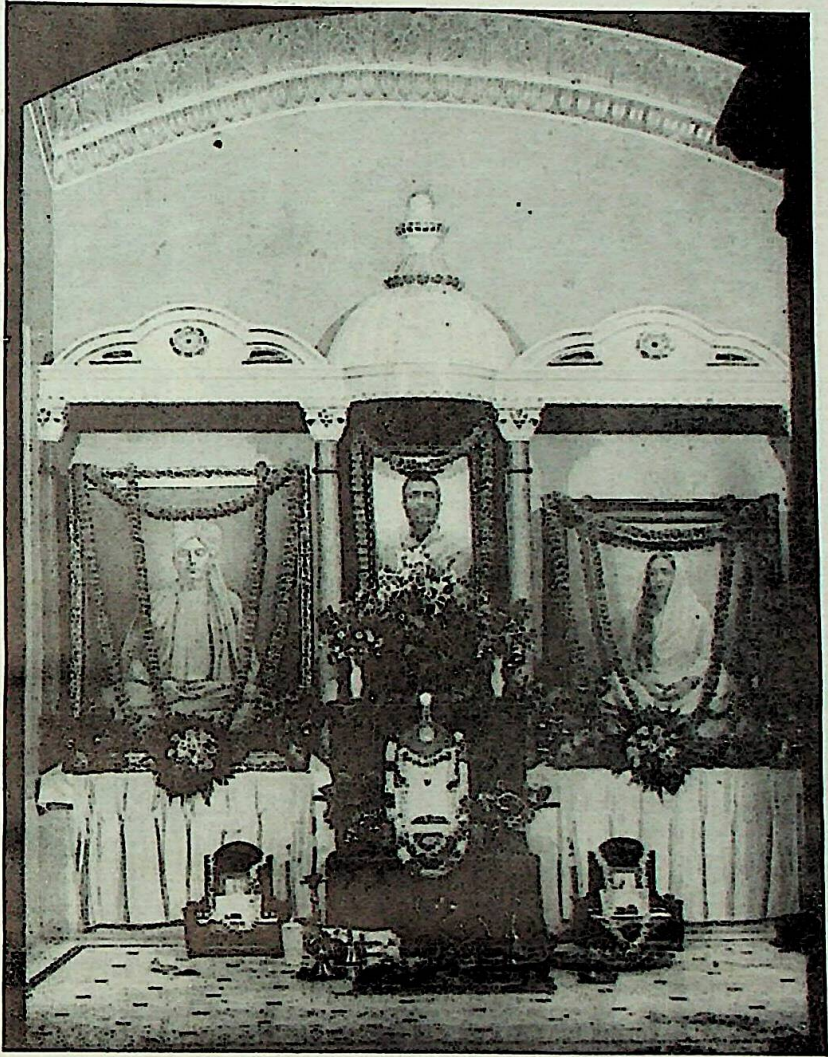
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের ঠাকুরঘর
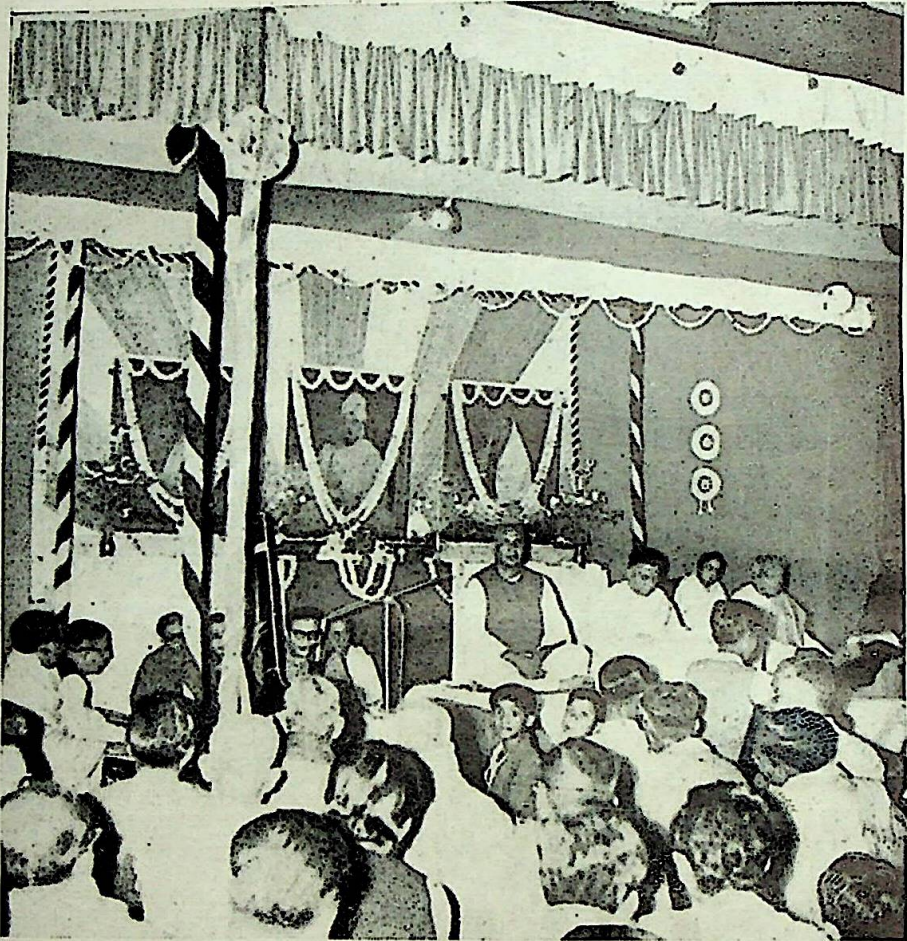
স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রথম দিবসে আলোচনা-সভার অধিবেশন। সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি—ডঃ শ্রীকালিদাস নাগ, উদ্বোধক—ডঃ শ্রীহীরালাল চোপরা ও বক্তা—ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
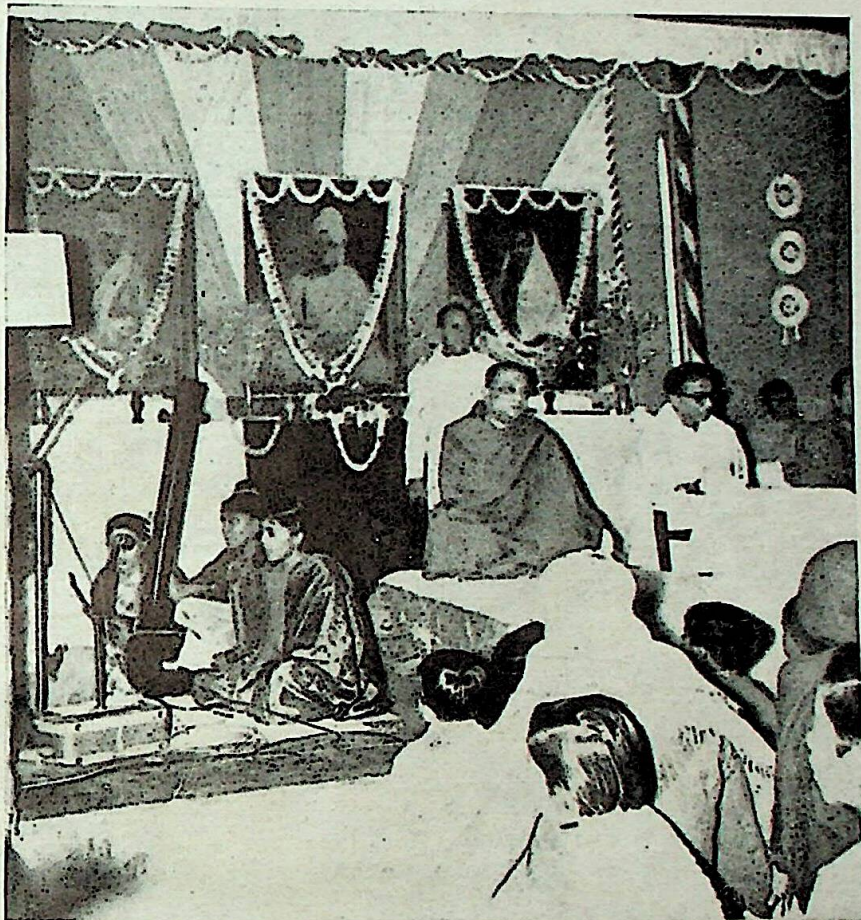
স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে দ্বিতীয় দিবসে আলোচনা-সভার অধিবেশন। সভাপতি—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রধান অতিথি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।
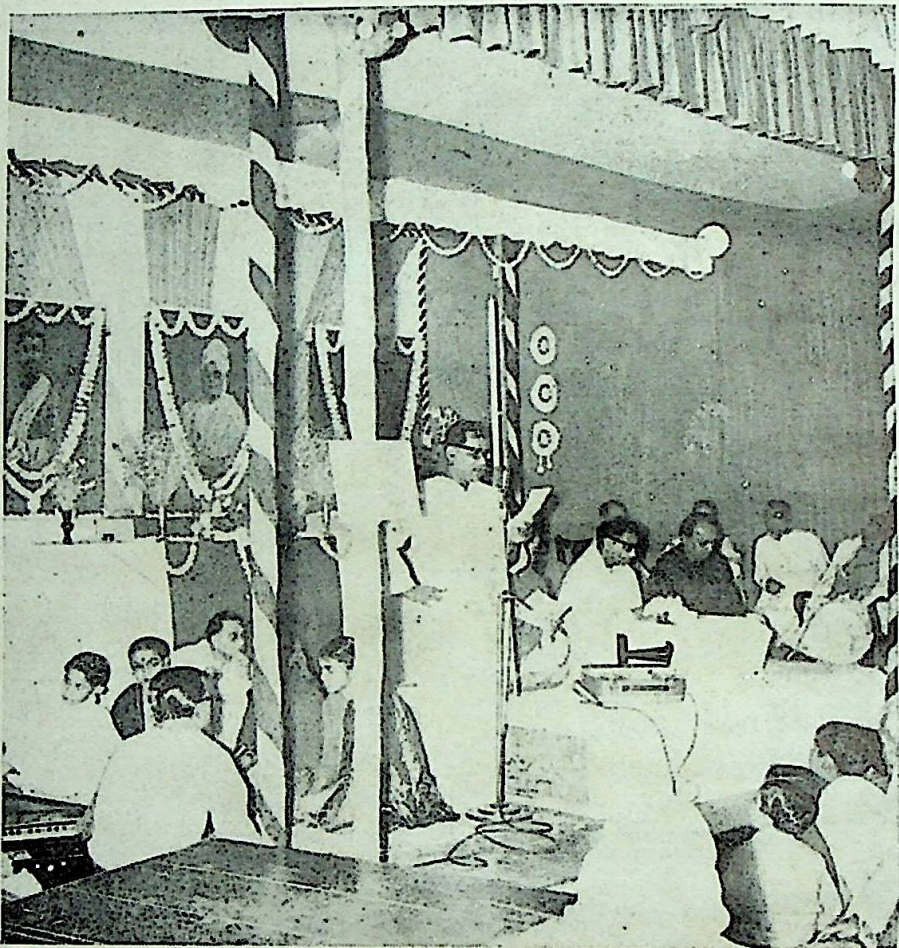
স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে দ্বিতীয় দিবসে আলোচনা-সভার অধিবেশন। সভাপতি—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বক্তা, ডঃ শ্রীঅজিত ঘোষ ও দণ্ডায়মান উদ্বোধক—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ।

একটি বুনিয়াদিশিক্ষা বিদ্যালয় রহিয়াছে। এগুলি স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিত। এই আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগারও রহিয়াছে এবং ধর্ম, সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থাদি ও দৈনিক সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রিকাদিও রহিয়াছে।

৭॥ উপসংহার॥ জনসাধারণের সম্মুখে এই বিবরণীটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে, মঠের কল্যাণ সাধনে যাঁহারা তাঁহাদের উদার ও অকৃপণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের মঠটিকে কর মুক্ত (Tax-free) করিয়া দেওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানকেও আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে মঠে ১৭ই জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারী যে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয় তাহার দুইদিনের আলোচনা-সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল :

প্রথম দিনের (১৭ই জানুয়ারী আলোচনা-সভার সভাপতি ছিলেন মাননীয় বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি, বক্তা ও উদ্বোধকরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ হীরালাল চোপরা মহোদয়। উদ্বোধক হিসাবে ডঃ চোপরা স্বভাবসুলভ বাগ্মিতাদ্বারা তাঁর ইংরাজী ভাষণে বলেন যে, তিনি এমন একজন মহামানবের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছেন যিনি একশত বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং যিনি পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ ব'লে পরিগণিত, যিনি একাধারে ধর্ম ও কর্মশক্তির মূর্ত প্রতীক।

প্রধান বক্তা হিসাবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে, স্বামিজী সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, তবে একান্তভাবে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী নন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : 'ধর্ম মিথ্যাপথে চললেই তার ত্রুটি'। দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণের সেবাকেই তিনি প্রচলিত করে গেছেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ধর্মজীবনকে। বিবেকানন্দ ছিলেন আত্মিক শক্তির চিরপূজারী এবং চারিত্রিক শক্তির উপর যথেষ্ট জোর দিতে বলেছিলেন। এ' দু'টিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তীর্থের নামে ভারত পর্যটন ক'রে তিনি অনুভব করলেন ভারতবর্ষের একটি বাস্তব রূপ। পরবর্তীকালে বিদেশীর কাছে এই ভারতেরই সজীব চিত্র তুলে ধরে বলেছিলেন : 'ভারতে আধ্যাত্মিকতার অভাব নাই—অভাব শুধু অন্নের। এ'টুকুর সমাধানকল্পেই তিনি এ' দেশে এসেছেন'। মানুষের মধ্যে যে শক্তি স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে তাকেই স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের শাশ্বত আত্মার সন্ধান করেছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ কালিদাস নাগ বলেন : স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের একটি নিবিড় যোগ ছিল আজকের শতবার্ষিকী উৎসবে সেটিও স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসবে যে Parliament of Religions (ধর্মমহাসভা) বসেছিল (১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে) স্বামী অভেদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই দুইদিনের সভায় সভাপতি ছিলেন। তাঁদের দু'টিই ভাষণ

সকলের পাঠ করা উচিৎ। মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—যাঁকে বলা হত "চলমান বিশ্বকোষ", তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। দেশে নারীশক্তির জাগরণের জন্য একটি মহীয়সী মহিলাকে তিনি ভারতে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন Miss Margaret Noble—যাঁর নাম দিয়েছিলেন 'নিবেদিতা'—অর্থাৎ ভারতের কাজেই তাঁকে নিবেদন করা হয়েছিল। আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্বেও তিনি একজন নারীর আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীসারদা দেবী। তাঁর শক্তিতেই তিনি 'বীর' হয়ে উঠেছিলেন। কারণ মাতৃশক্তিই মানুষকে বীর করে তোলে।

সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সারগর্ভ ভাষণে বলেন : স্বামিজী আমাদের দেখিয়ে দিলেন আসল ধর্ম কি ? আসল ধর্ম হল মানুষের আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষের আদর্শ কি? আদর্শ হলেন ভোলানাথ শঙ্কর। স্বামিজী বলেছিলেন : "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃকস্য স্বিদ্ধনম্"। আজকের দিনে যে নানা বিভেদ দেখতে পাচ্ছি সেই বিভেদকে স্বামিজীর দান বলে একেবারেই মনে করি না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক একতা সম্বন্ধে এবং বলেছিলেন ভারত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই সব কিছু গ্রহণ করুক। স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত প্রচার করে গেছেন তা শুধু কথায় নয়, মানসিক বিকাশেও নয়, পরন্তু জীবনযাত্রার মাধ্যমেই তা ব্যাখ্যা করে গেছেন। অনেকে তাঁকে আজকের দিনে বিপ্লবী হিসাবে দাঁড় করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি সংরক্ষণশীল ছিলেন, সেটিই হচ্ছে শক্তি। আজকের দিনে তাঁর সেই মহান্ অবদানটিও যেন আমরা উপেক্ষা না করি।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-সভার সভাপতি ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। উদ্বোধক, প্রধান অতিথি ও বক্তাহিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণের পর প্রধান বক্তা ডঃ অজিত কুমার ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন : প্রথমেই প্রণাম জানাই ভারতের মুক্তিমন্ত্রদাতা স্বামী বিবেকানন্দকে। আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতের Renaissance বা 'নবজন্ম' ঘটেছিল। সেই সময়েই আমরা জানলাম পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে ; আমাদের জীবনের মধ্যে পেলাম নূতন রস, নূতন বৈচিত্র্য। উনবিংশ শতকেই আমাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, সেইসঙ্গে আমাদের চিত্তে জাগরিত হয়েছে একটি মুক্তিচেতনা। এই সময়ই আমরা সার্বজনীন চিন্তা, কর্ম ও সাধনার মধ্যে রাজা রামমোহন হ'তে সুরু ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীদের মধ্যে যা পেয়েছি তা আংশিকভাবে বুদ্ধিবাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলন ছিল মূল আদর্শ হতে বিচ্ছিন্ন। এমন সময় আমরা স্বামিজীর মধ্যে কি পেলাম ? পেলাম সমন্বয়, পেলাম সামঞ্জস্য, পেলাম—কেমন করে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিকে জীবনে অনুভব ক'রে সমাজ-সাধনার সঙ্গে যুক্ত করা

যায়, অর্থাৎ ধর্ম-সাধনা যুক্ত হ'ল সমাজ-সাধনার সঙ্গে। ঘটল জাতীয়তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। বোঝালেন জাতীয়তা একটি "ইজম্" বা তত্ত্বমাত্র নয়। স্বামিজীর এটি একটি মহোত্তম দান। আর কি পেলাম? পেলাম মানবের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মাধ্যমেও শুনেছি এই মানুষের মাঝে দেবতার জয়গানের কথা কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বল্লেন, এই দেবতাকে জীবনে উপলব্ধি করা যাবে সেবা-ধর্মের মধ্যে জীবকে শিবরূপে সেবার মাধ্যমে। বিশ্ব সভ্যতায় স্বামিজীর এটি একটি অভূতপূর্ব দান।

প্রধান অতিথি বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন: পাশ্চাত্য দর্শন মানব-সমাজকে যা-কিছু দান করেছে স্বামী বিবেকানন্দ General Assembly-তে পাঠকালে তা আয়ত্ত করেছিলেন কিন্তু তাতে তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি, এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও তাঁর জ্ঞান-পিপাসায় তৃপ্তিদান করতে পারেননি। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে গিয়ে স্বামিজী ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেছেন, আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই বীর সন্ন্যাসী ক্ষাত্রশক্তি ও বীর্যশক্তির মূর্ত প্রতীক। ব্রহ্মজ্ঞানী চিরমুক্ত সন্ন্যাসী বলছেন, বহুজনের জন্য তিনি বার বার জন্মগ্রহণ করতেও প্রস্তুত। যে সেবাধর্ম তিনি প্রবর্তিত করে গেছেন তা হল নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সেবাধর্ম। প্রতিদানের বিনিময় ব্যতীত যে সেবাধর্ম তাই হল স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম। আর অস্পৃশ্যতা-বর্জনের যে আন্দোলন তিনি প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনেতা গান্ধিজী সর্বতোভাবে সেটিই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের জনক—সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদেরও। স্বামী বিবেকানন্দই পরানুকরণ মোহাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃত ভারতীয় জাতিকে অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'!—এই বলে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদি আমরা বিবেকানন্দ প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আস্থাবান্ না হই তবে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ-রচনা সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা ও রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের ভাষায় এই অপূর্ব শ্রদ্ধাঞ্জলিটুকু নিবেদন করে স্বামিজীর অদৃশ্য হস্তের প্রসন্ন আশীর্বাদ প্রার্থনা করি:

"I must tell you that I had the honour of living with this great Swami in India, in England, and in this country (America). I lived and travelled with this great spiritual brother of mine, saw him day after day and night after night, and watched his character for nearly twenty years, and I stand here to assure you that I have not found another like him in these continents, and that no one can take the place of this wonderful personage. As a man, his character was pure and spotless ; as a philosopher, he was the greatest of all Eastern and Western philosophers. In him I found the ideal of Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga and Jnana Yoga ; he was like the living example of Vedanta in all its different branches."

সভাপতির ভাষণে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন : আজকের দিনে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এইটুকু প্রার্থনা করি যেন কথায় ও কাজে সত্য হতে পারি। যতই দিন যাচ্ছে স্বামিজীর জীবনের এক একটি দিক প্রকাশিত হচ্ছে। নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর জীবনের গভীর সত্ত্ব, তাঁর সীমাহীন ভালবাসা, সহৃদয়তা ও কল্পনার বহু কিছুই প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও তাঁর যে রূপটি অজ্ঞাত ছিল, সেটি প্রকাশিত হচ্ছে। যেটি জানতাম সে-রূপটিও সমগ্র নয়। যতই দিন যাচ্ছে মানুষ ততই তাঁর সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হচ্ছে। সাধারণতঃ অনেক মানুষের মূর্তিই জনসাধারণের কাছে স্থির হয়ে যায়, সীমাবদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু এমন মানুষও আছেন যাঁদের চরিত্র মানব-মনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করে চলে, প্রসারতা লাভ করে যতই দিন যায়, স্বামিজী হচ্ছেন এ-জাতীয় মানুষ। আজকে অনেকে যে অভীঃমন্ত্রের কথা বলছেন আমরা যৌবনে বাঙালী-জীবনের মধ্যে সে-মন্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আমাদের নাড়ীর স্পন্দনে, রক্তের মধ্যে, অনুভব করেছি সেই মন্ত্রের ক্রিয়া। সুভাষচন্দ্রকে না দেখলে স্বামিজীর উক্ত রূপ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠত না। যে অভীঃমন্ত্র, যে বীর্যের কথা বলছেন জাতির জীবনে কখন কখন তার আবির্ভাব ঘটে,—জাতির মধ্যে চকিতে হয় এ-শক্তির আবির্ভাব। ২৩ হতে ৩৯ এই সতেরো বৎসরের জীবন যে আদর্শের জন্য বিবেকানন্দ যাপন করেছিলেন, তা সার্থক হয়েছে। আমাদের জীবনের মধ্যে যার চিন্তার যে পরিমাণে বিস্তৃতি ঘটে তিনি সেই পরিমাণেই স্মরণীয়। মানুষের কাজ কিছু থাকে কালগত ও কিছু দেশগত, সব কিছুই যে কালের গণ্ডী অতিক্রম করে তা নয় কিন্তু মহাপুরুষ তাঁরাই যাঁদের অধিকাংশ বাণীই দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে। স্বামিজী এই শেষোক্ত পর্যায়ের মানুষ অর্থাৎ মহাপুরুষ। মাঝে মাঝে মানবসমাজ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় তখনই বিশেষ মানুষের মাধ্যমেই এই বাণী আসে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' সমাজ ও জাতির জাগরণের জন্য। এমনি এক সংকটমুহূর্তেই এসেছিলেন স্বামিজী মানবসমাজকে শোনাতে জাগরণের বাণী। আজকের দিনেও তাই যখন স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করি, নিজের রক্তসঞ্চারের মধ্যে, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে তখন চোখে স্বপ্ন জাগে, চিত্তে সাহস আসে।

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থ

মরণের পরে: লোকান্তরে সূক্ষ্মশরীরের আত্মার অস্তিত্ব থাকে—ইহাই স্বামিজীর প্রতিপাদ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে। বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য: ৫৲।

পুনর্জন্মবাদ: বৈজ্ঞানিকের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসা এবং যোগীর উপলব্ধি এই উভয় দিক হইতে বিচার করিয়া তত্ত্বদর্শী স্বামিজী আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য: ২৲।

যোগশিক্ষা: যোগ কি, হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং বিশেষ করিয়া প্রাণায়াম প্রণালী বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। মূল্য: ২·৫০।

আত্মজ্ঞান: অমরত্ব ও আত্ম—প্রাণ, প্রজ্ঞা, জড়, ও চৈতন্য—উপনিষদের যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য ইন্দ্র ও বিরোচন—আত্মতত্ত্ব বিচার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ—আধ্যাত্মিক ও সর্বোপরি আত্মানুভূতির স্বরূপ কি?—এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মূল্য: ২৲।

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম: শিক্ষার যথার্থ রূপ ও রহস্য, সমাজ কিভাবে চলিলে দেশ, দশ ও জাতির কল্যাণ হইবে এবং 'ধর্ম' বলিতে প্রকৃত কি বুঝায় তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মূল্য: ৪৲।

আত্মবিকাশ: সরল ও সাবলীল ভাষায় আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য: ২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ: স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবদীপ্ত ও বিস্ময়কর কর্মময় জীবনের প্রাণস্পর্শী বর্ণনা। মূল্য: ৫০ নঃ পঃ।

ভারতীয় সংস্কৃতি: ভারতবর্ষের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, সকল কিছুর খুঁটিনাটির বিবরণ। তৃতীয় নূতন সংস্করণ। মূল্য: ৬৲।

মনের বিচিত্র রূপ: মনের সকল গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া শান্তি লাভের সন্ধান আছে গ্রন্থটিতে। মূল্য: ৩৲

স্তোত্ররত্নাকর: শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদা-দেবীর উদ্দেশে রচিত সংস্কৃত স্তোত্র ও পদ্যে তাদের বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রসঙ্গত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শ্রীমা ও শ্রীগুরু দৈনিক ও বিশেষ পূজা পদ্ধতি এবং হোম সহ মূল্য: ২৲।

হিন্দুনারী: শিক্ষা—ধর্মে ও বেদে নারী-জাতির অধিকার—নারীজাতির উপনয়ন—নারী জাতির প্রব্রজ্যা ও ধর্মপ্রচার হিন্দুসমাজে বিবাহবিধি রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর অধিকার—সাহিত্যে ও সমাজে অবদান—নারী জাতির প্রতি সমাজ ও শাস্ত্রের শ্রদ্ধা—সতী-দাহ বৈদিক কিনা, প্রভৃতি বিষয় এবং বর্তমান যুগে নারীশিক্ষা কি প্রকার হওয়া উচিত স্বামিজী তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণ।

মূল্য: ৩·৫০।

কালী তপস্বী

প্রামাণ্য এই জীবনটি আমরা প্রতিটি ভক্ত ও জ্ঞানলিপ্সুকে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

মূল্য: দেড় টাকা মাত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

॥ বিজ্ঞাপন ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

॥ তীর্থরেণু ॥

"তীর্থরেণু" গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইডেন হস্‌পিটাল রোডে যখন বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন অগ্নিময়ী ভাষায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ গীতা, উপনিষৎ ও পাতঞ্জল-যোগদর্শন সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'তীর্থরেণু' তাহাদের সংকলন। ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষণে সহজ সরল ভাষায় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ। স্বামিজীর ব্যাখ্যার উপর আলোকপাত করিয়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ইহার সঙ্গে সুদীর্ঘ একটি পরিশিষ্ট যোজন করিয়াছেন। ধর্মরহস্যের দুরূহ বিষয় এবং অভেদানন্দ মহারাজের বক্তব্য ইহাতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থটি প্রত্যেক ধর্মজিজ্ঞাসুর নিত্যসহচররূপে কার্য করিবে। দ্বিতীয় সংস্করণের কাগজ ও ছাপা আরও উন্নত ধরনের এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অনেকগুলি ছবিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ডিমাই ৮ পেজী। (নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ৬·০০ টাকা

'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহকদের জন্য ৫·২৫ নঃ পঃ।

॥ মন ও মানুষ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দজীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট ছিল আজীবন জ্ঞানচর্চা। তাঁর সারাজীবনের অধ্যয়ন ও মননের পটভূমিতে প্রাচী ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার আদান-প্রদানের ইতিহাস শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের একটি প্রধান দিক। এ'গ্রন্থে সেই ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ রয়েছে। তাছাড়া আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে স্বামী অভেদানন্দের জীবনের নানা ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচর স্বামী অভেদানন্দকে (কালী-তপস্বী) জানতে চান, অথবা যাঁরা উনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণের এক ভারতীয় মনের অনুভবসিদ্ধ আধ্যাত্ম-আলোচনায় উৎসাহী—তাঁরা সকলেই এ'গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন। কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ-রকের প্রচ্ছদপট ও ছবিসম্বলিত ডিমাই-সাইজের ৪৫০ পৃষ্ঠা। **মূল্য : সাত টাকা**

রাগ ও রূপ—প্রথম ভাগ পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রাগরাগিণীদের প্রাচীন ও বর্তমান রূপের বিস্তৃত পরিচয়। ধ্যান ও রাগমালাচিত্র সম্বলিত। মূল্য : ১২৲

দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে—রাগরূপের অর্থ—উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির কতক-গুলি রাগের পরিচয়—কর্ণাটকী সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গোবিন্দাচার্য ও বেঙ্কটমখী প্রদর্শিত ৭২ থাটের রাগ-পরিচয় প্রভৃতি। রয়েল সাইজ, মূল্য : ১০৲।

॥ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ॥ —(সঙ্গীত ও সংস্কৃতি)

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য : ১০৲

॥ অভেদানন্দ-দর্শন ॥

মূল্য : ৮·০

॥ শ্রীদুর্গা ॥

মূল্য : ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

"To lift up the best and most gifted"

"I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India, and the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels. I recall these ideas in connection with my scheme of a research institute of science for India... It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordinary decency, and devote their lives to the cultivation of sciences—natural and humanistic."

Jamsetji Tata in a letter to Swami Vivekananda, dated Bombay, 23rd November 1898

Jamsetji Nusserwanji Tata
3rd March 1839 — 19th May 1904
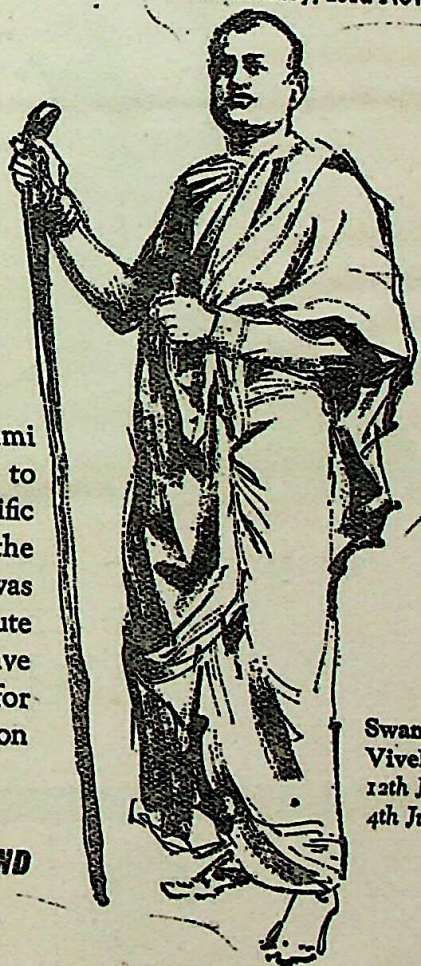
Swami Vivekananda
12th January 1863
4th July 1902

In this year of the birth centenary of Swami Vivekananda, we recall Jamsetji Tata's letter to Swamiji about the scheme for promoting scientific research which led to the founding of the Institute of Science in Bangalore in 1909. It was only fitting that the man who founded the Institute to "lift up the best and most gifted" should have turned to the great patriot-saint who stood for "that education...by which one can stand on one's feet."

GIVE FREELY TO THE NATIONAL DEFENCE FUND

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWT

KEROSENE

INDIAN RAILWAYS

HERE

THERE

EVERYWHERE

Whatever the occasion, going to meet friends, driving the children to school, going to the cinema or club or even journeying by road to a shikar !

... Dunlop Gold Seal Car Tyres are always the best for high mileage, reliability and top road safety.

Gold Seal CAR TYRES

DC-571A

India's Three Dominant...
ANANDA BAZAR PATRIKA
PRE-EMINENT AMONG LANGUAGE (BENGALI) DAILIES IN INDIA
HINDUSTHAN STANDARD
ENGLISH DAILY, POPULAR PROGRESSIVE, DEPENDABLE
EXCELLENT MEDIA TO SELL QUALITY GOODS
DESH
LEADING BENGALI WEEKLY A FAMILY FAVOURITE
ANANDA BAZAR PATRIKA
Private Ltd.
6, SOOTERKIN STREET,
CALCUTTA-1.
Phone : 23:2283
Gram: ANANDABAZAR
(7 lines)
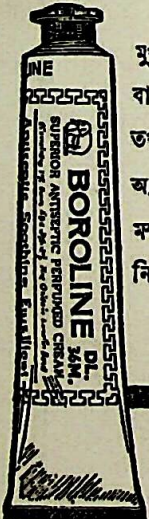
শ্রীতামসরঞ্জন রায়ের

যুগাচার্য বিবেকানন্দ

শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ হিসাবে এ পুস্তকখানি ইতিমধ্যেই বিদগ্ধ সমাজের বিশেষ প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছে। বহু সমালোচকই মন্তব্য করেছেন যে, গ্রন্থখানি পড়তে আরম্ভ ক'রলে শেষ না ক'রে ছাড়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর সুনিপুণ সঙ্কলনে এবং তাঁদের বলিষ্ঠ প্রকাশ কৌশলে পাঠকের মনে একটি স্থায়ী রেখাপাত ক'রে গ্রন্থখানি নিজ সার্থকতাই যে শুধু সপ্রমাণ করে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর জীবনী ও বাণীও যেন সজীব হ'য়ে ওঠে, ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে।

সচিত্র: দাম -৪·০০

জাগোরে ধীরে

(ছায়ানাট্য)

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিচিত্র ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের অতুল্য অবদানের আখ্যায়িকা নিয়ে এই ছায়ানাট্যখানি রচিত হয়েছে। এর দৃষ্টিভঙ্গী নূতন, প্রকাশভঙ্গী গতিশীল, আবেদন মর্মস্পর্শী। স্বামিজীর শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থমালায় এ একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সংযোজন।

দাম —১·০০

কলিকাতা পুস্তকালয়

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ 'সুতপা'র বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অর্ঘ্য ॥

জীবনী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক
মণি বাগচি প্রণীত

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী

দাম: তিন টাকা

অধুনা প্রকাশিত স্বামিজী সম্পর্কিত অন্যান্য বইগুলির মধ্যে এই গ্রন্থখানি স্বকীয়তার দাবী রাখে। দুই রঙের চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদ ও চারখানি হাফটোন চিত্র।

লোকমাতা নিবেদিতা

বিবেকানন্দের মানসকন্যার চিত্তাকর্ষক আলেখ্য।

দাম: দুই টাকা পঞ্চাশ ন· প·

একমাত্র পরিবেশক : **শিক্ষা ভারতী**

৯৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

চালাকির দ্বারা ব্যবসায়ে উন্নতি করাও সম্ভব নয়। চাই সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা এবং যে কোন শিল্পের মাধ্যমে নিজের ও দেশের উন্নতি করবার আগ্রহ—

অল্প পুঁজিতে মেসিনের সাহায্যে নিম্নলিখিত যে কোন জিনিস তৈরী করে সুপ্রতিষ্ঠিত হোন।

বিস্কুট, লজেন্স, সাবান বোতাম, চিরুনী, কাঠের খেলনা, কৌটা, বালতী, টালী, মোমবাতী, চিনামাটির বাসন, ঔষধ-পত্রাদি, কাগজের বাক্স, খাম, ন্যাফথলিন বল, কর্পূরের ট্যাবলেট, রং, কালি ইত্যাদি।

উপরোক্ত জিনিসগুলি তৈরী করবার মেসিন আমরাই বিক্রয় করি।

ওরিয়েণ্ট্যাল মেসিনারী সাপ্লাইং এজেন্সী লিমিটেড

পি ১২ মিশন রো এক্সটেনসন।
কলিকাতা।
(ফোন নং ২৩-৪৮৪০

Space Kindly Donated by :

INDUSTRIAL IMPORTERS PRIVATE LIMITED

34, STEPHEN HOUSE
CALCUTTA-1

See India by Ambassador !

Our country abounds in natural riches which invite appreciation and exploration. The Ambassador provides easy access to ideal spots for holidaying, picnicking, camping, hiking, and every avenue leading to closer contact with nature. Designed as a family car, it carries upto six adults in relaxed comfort, plus ample luggage in its spacious boot. O.H.V. engine power, combined with a sturdy build, ensures fast and dependable performance at a modest fuel consumption. It is the ideal vehicle for enriching the experience and expanding the horizon of you and your family!

HINDUSTHAN Ambassador

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA-1

Authorised Dealers :

INDIA AUTOMOBILES (1960) LTD., 12, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) * HINDUSTAN AUTO DISTRIBUTORS, 17, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) * WALFORD TRANSFORT LTD., 71, Park Street, Calcutta (for other Districts of West Bengal)

Courtesy

Speed

Efficiency
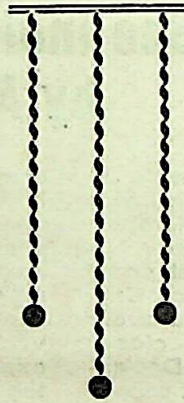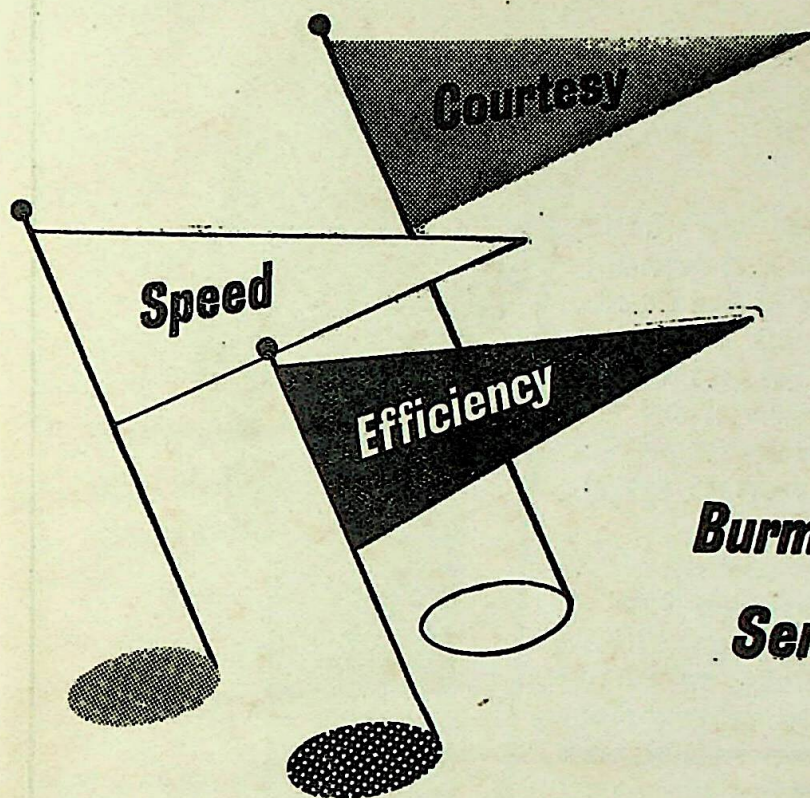
that's
Burmah-Shell
Service!

নির্ভীক প্রগতিশীল ও সুস্পষ্ট জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ বাঙলা ও বাঙ্গালীর কল্যাণ পথের মুখপত্র এবং সংবাদ ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়

দেশের ও দশের উন্নতি বিধানে
আপনার নিত্য সহচর

২নং আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

Give up jealousy and conceit.
Learn to work unitedly for others.
This is great need of our country.

VIVEKANANDA

D. H. KESH & CO., PRIVATE LTD.

Suppliers of QUALITY PRINTING AND STATIONERY

68, DHARAMTALA STREET,
CALCUTTA-13.
PHONE : 24-1218

With best Compliments of :

Telephone : { 33—6080, 33—6485

JASODALAL GHOSAL (Private) LIMITED

CONTROLLED STOCKISTS OF IRON & STEEL

20, Maharshi Debendra Road, Calcutta-7

With best Compliments of :

THE CALCUTTA ORIENTAL PRESS
(PRIVATE) LIMITED.

Specialists in high class Printings of books with diacritical marks, Chinese and Tibetan characters.

9, PANCHANAN GHOSH LANE,
CALCUTTA-9.
PHONE : 35-1918
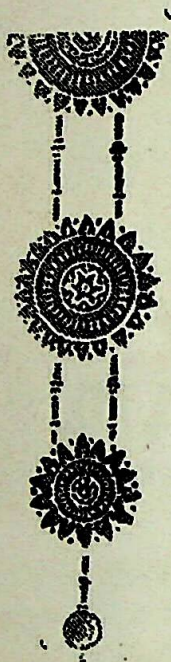
"ওঠো, জাগো, সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সামনে যে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক ডুবিতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার কর।"

হাওড়া মোটর কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ পূর্তী উপলক্ষে

তাঁর প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

কিং এণ্ড কোং

(স্থাপিত—১৮৯৪ খৃঃ)

হোমিও কেমিষ্ট

৯০/৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

শাখা :—২৯, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

১২, রয়েড ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

Let us all work hard, my brethren, this is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She is there ready waiting. She is only sleeping. Arise and awake and see her seated here, on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was—this motherland of ours.

VIVEKANANDA